ভ্রমণ ও সাধুসঙ্গ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শিবশংকর ভারতী

।। ভাস্বতী ।।
১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা- ৭০০ ০০৯

আমার গর্ভধারিণী মা—শত দুঃখ, চরম দুঃসময়েও
বুক ছাড়া করেনি—তাঁরই পাদপদ্মে
অর্পণ করলাম।

—**শিবশংকর**

যেটুকু না বললেই নয়

যখন লেখা শুরু করি—তখন অত কিছু ভাবিনি। লেখা যখন এগিয়ে গেছে এবং শেষ হলো—তখন মনে হলো, সাধুদের জীবন সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়নি—বাদ চলে গেছে অনেক কথা। সে-গুলি বলার জন্যই দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা। অবশ্য এটা শেষ করেও দেখলাম—শেষ হয়নি অনেক কথা। সুতরাং পরবর্তী খণ্ডও বেরোবে। এই খণ্ডের মতো তাতেও থাকবে সাধুদের জীবন সম্পর্কে আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা—যা পাঠকের কাছে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত মনের তৃপ্তি হবে না।

পথে নেমে আমাকে কখনও সাধু খুঁজতে হয়নি। যখনই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি—কোন না কোন ভাবে—কোথাও না কোথাও তাঁদের দেখা পেয়েছি। অনেকেই কথা বলেছেন প্রাণ উজাড় করে—প্রশ্নও করেছি একের পর এক। কখনও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি তাঁদের জীবনের বিচিত্র ঘটনার কথা শুনে। কখনও মন খারাপ হয়েছে তাঁদের অতীত দুঃখময় জীবনের কথায়। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি সবক্ষেত্রেই—আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন অকপটে—কোন সত্যকে গোপন করে নয়। যেখানে পারেননি—আন্তরিকভাবে জানিয়েছেন নিজের অক্ষমতার কথা।

প্রথম খণ্ডে পথ-চলতি সাধুদের সঙ্গে মূলতঃ পাঠকের একটা পরিচয় হয়েছে—তাঁদের থাকা-খাওয়া, জীবন ধারণের গতি-প্রকৃতি, চিন্তা-ভাবনা—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। বর্তমান খণ্ডে আছে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আলোচনার বিষয়বস্তুও এগিয়েছে ভিন্ন গতিতে। আমরা ভাবি, সাধুরা বোধ হয় মনুষ্যবৃত্তের বাইরে—কিন্তু তা নয়। তাঁদেরও মনুষ্য-সুলভ মানসিক বৃত্তিবোধ—ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা, অতৃপ্তি আর আনন্দ—সবই আছে। সে-বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে এই খণ্ডে। সাধুদের জীবন যাত্রার কোনদিকটাই বাদ দিইনি—এমনকি যৌনচিন্তা ও চেতনার দিকটাও। কারণ এটাও জীবনে সত্য। সাধুদের যে-ভাবে দেখেছি—যে কথা শুনেছি—সেইভাবেই, কোন পরিবর্তন না করে আমার দেখাটাই পাঠকদের দেখাতে চেয়েছি।

আমাদের বেরোনো—ফিরে আসার জন্য। সাধুরা বেরোন—না ফেরার জন্য। কিন্তু আমরা যে জিজ্ঞাসা খুঁজি—সাধুরাও খোঁজেন সেই একই জিজ্ঞাসা। একটা বিশেষ মুহূর্তের মানসিক চঞ্চলতায় তাঁরা হয়তো বেরিয়ে পড়েন। পরে মন ধীরে ধীরে হয় অচঞ্চল। খোঁজেন জিজ্ঞাসার উত্তর। পরিশেষে এসে পৌঁছান একটা জায়গায়। আমি তাঁদের সেই জায়গার সন্ধান পেতেই বেরিয়ে পড়ি—সঙ্গ করি। তাঁদের অনেকের জীবন যাত্রায়, আচার-আচরণে, দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখেছি সত্যের রূপ আংশিক ব্যক্ত হতে। মিলিয়ে নিতে চেয়েছি নিজের মনের জিজ্ঞাসা আর

ভাবনার সঙ্গে। কোথাও মিলেছে—কোথাও হয়তো বা মেলেনি। আবারও বেরোবো—মেলানোর প্রয়াসে।

আমরা প্রত্যেকেই সত্যকে খুঁজছি—সাধুরাও। সত্যকে খোঁজাই তো জীবনের সাধনা। কিন্তু পথটা আলাদা। একটা সংসারে থেকে—আর একটা সংসার গণ্ডীর বাইরে—অনির্দিষ্ট জীবনের পথে। সাধুদের সেই সংসারহীন জীবন-পথের যে অভিজ্ঞতা—সেটাই তাঁদের জীবন-দর্শন। তাঁদের সেই জীবন এবং দর্শনের সঙ্গে আমাদের কোন অন্তরঙ্গতা নেই। তাঁরই খোঁজে বেরিয়ে দেখেছি, পথ-চলতি যেসব সাধু—তাঁদের জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কেও যে তাঁরা সচেতন—একথা আমরা একবারও ভাবি না—বহিরঙ্গ রূপে চটক থাকে না বলে। আমি তাঁদেরই অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন-দর্শনের সঙ্গে পাঠকদের এখানে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছি।

আগে এবং এখানে যে-সব সাধুদের কথা বলেছি—পাঠক যেন না ভাবেন, কোন ব্যক্তি বিশেষের কথা বলেছি। আমি সমষ্টিগতভাবে আশ্রয়হীন পথ-চলতি 'সাধু-জীবন' কথাই বলতে চেয়েছি।

এবার আসি ভ্রমণ প্রসঙ্গে। যেসব জায়গাগুলোতে ঘুরেছি—নানা প্রেক্ষিতে তৃপ্ত করেছে আমাকে। কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য (setting), কোথাও তার ঐতিহাসিকতা, কোথাও তার পৌরাণিক ভিত্তি—যা আজও ফেরে মানুষের মুখে মুখে। ভ্রমণ-জীবনে আমার তৃপ্তির অংশটুকু এখানে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি পাঠকদের পরিবেশন করতে।

এই ভ্রমণ-আলেখ্যর উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন—সাহিত্যিক শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সাহিত্য-প্রেমী শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য। গ্রন্থ রচনাকালে মানসিক সঙ্গী ছিলেন সর্বশ্রী পার্থ সরকার, অমিতাভ দেব এবং কালীপদ দাস। কৃতজ্ঞতা কখনও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—প্রণামেও নয়। কৃতজ্ঞতা—অন্তরের এক আনন্দময় অনুভূতি যে।

কলকাতা-১১ **—শিবশংকর ভারতী**

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই সংস্করণে তেমন কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়নি। নতুন তথ্য পেলে নিশ্চয়ই সংযোজন করবো। পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

—লেখক

কিছু কথা

লেখক পরিবেশন করেন—পাঠক তা গ্রহণ করেন। কিন্তু লেখকের অমানুষিক পরিশ্রমের কথা ভাবার অবকাশ প্রায় পাঠকেরই হয় না। পাঠক পেয়েই তৃপ্ত।
এই গ্রন্থের লেখকের কথাই বলি। পথ-চলতি আশ্রয়হীন সাধুদের বৈচিত্র্যময় জীবন সম্পর্কে কি অসাধারণ অভিজ্ঞতালাভ করেছেন—তা পাঠক মহল কিছুটা আঁচ করতে পেরেছেন প্রথম খণ্ডে। অনেকের হয়তো ধারণা হবে—লেখক টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পৌঁছে গেলেন কোন তীর্থে। পেয়ে গেলেন কোন সাধুবাবাকে—বসে গেলেন ডায়েরী নিয়ে—প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে নিয়ে সোজা ফিরে এলেন ঘরে। এটা যে কোন ভাবেই সম্ভব নয়—তা পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন।
লেখক কখনও কোন তীর্থে, কখনও পথে প্রান্তরে—দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে—কখনও রাত জেগে, কখনও রোদে পুড়ে—সাধুদের ভিক্ষালব্ধ রুটি খেয়ে—অকথ্য ভাষায় গালাগাল উপেক্ষা করে—অপরিসীম ধৈর্য ও আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে তাঁদের পিছনে পড়ে থেকে—সাধুদের জীবন ও মনের যে সব গোপন কথা জেনেছেন—তা সাধারণ মানুষের কল্পনাতেও আসবে না। সাধুদের সেই অজ্ঞাত আলাদা জীবন-কথা—যা লেখক সংগ্রহ করেছেন—তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে নিজেরই একটা তৃপ্তি হচ্ছে। আধ্যাত্মিক ভ্রমণসাহিত্যে এমনটা এর আগে কেউ দিতে পেরেছেন বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই।
ভারতের অসংখ্য সাধকের জীবনী পাওয়া যায়—পাওয়া যায় না সমাজের উপেক্ষিত একশ্রেণীর পথ-চলতি আশ্রয়হীন সাধুদের অন্তরঙ্গ জীবনকথা। লেখক এই গ্রন্থে পরিবেশন করেছেন তাঁদেরই কথা—যার থেকে আমাদের অনেক কিছুই জানার আছে—আছে শেখারও।
নতুন করে বলার কিছু নেই। প্রথম খণ্ডের মতো এই খণ্ডেও আছে—পথ-চলতি সাধুদের জীবন-প্রসঙ্গ, কাম-প্রেম এবং যৌন-চিন্তা ভাবনার উপর অসংখ্য দুঃসাহসিক কৌতূহলী প্রশ্ন, বিভিন্ন তীর্থ-ভ্রমণ ও স্থান মাহাত্ম্য, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পশ্চাদপট, ভ্রমণ পথের বিবরণ এবং বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।
সাধুদের জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী এবং ভ্রমণ-মনা পাঠকের মনের চাহিদা কিছুটা মিটলে—লেখকের অমানুষিক পরিশ্রমের মতো আমার উপস্থাপনার প্রয়াসও সার্থক হবে মনে করি।

—**প্রকাশক**

কোন পাতায় কি আছে

১১০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা অনন্ত বর্মণ কর্তৃক স্থাপিত এবং চৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ-মন্দির। সিংহদ্বার সংলগ্ন স্তম্ভটি—অরুণ স্তম্ভ।

ফটো—লেখক।
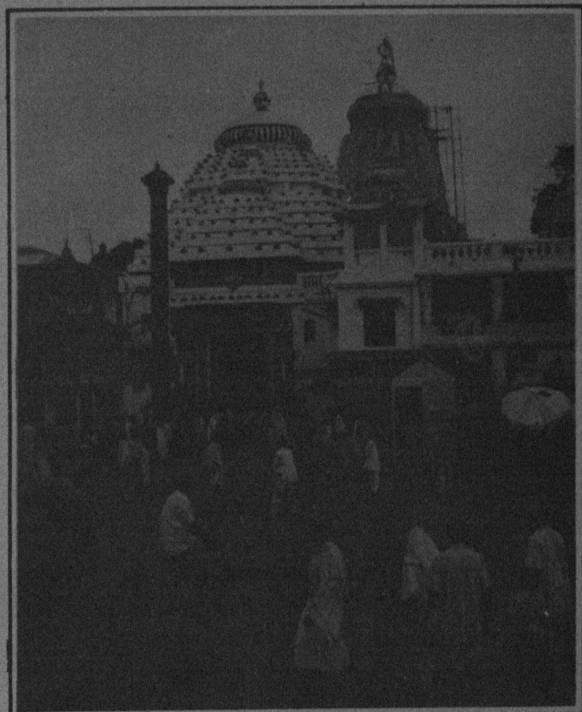
প্রাচীনকালের মৈত্রেয় বন। আজকের কোণারক সমুদ্র-সৈকতের অন্তর্গত অর্কক্ষেত্রে—১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম নরসিংহ দেব কর্তৃক স্থাপিত সূর্য-মন্দির।

ফটো—লেখক।
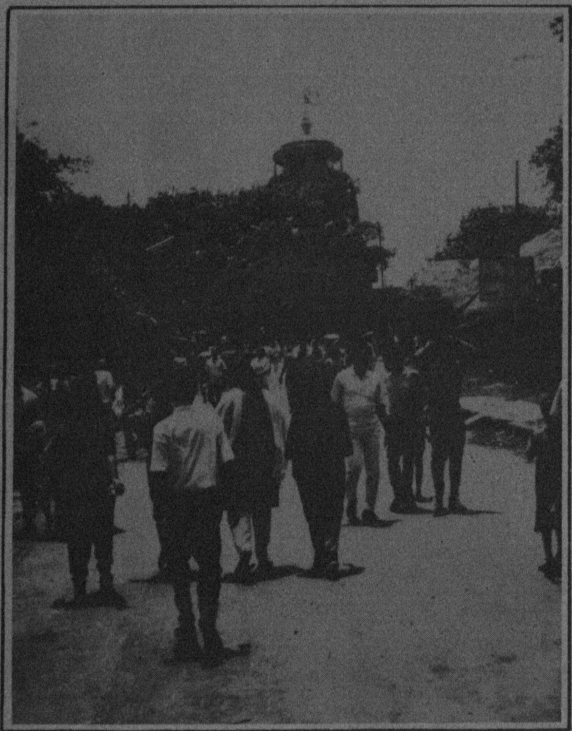
প্রাচীনকালের একাম্র-কানন—আজকের ভুবনেশ্বর। লিঙ্গরাজ মন্দিরের পথে চলেছেন তীর্থযাত্রী—দর্শনার্থীরা।
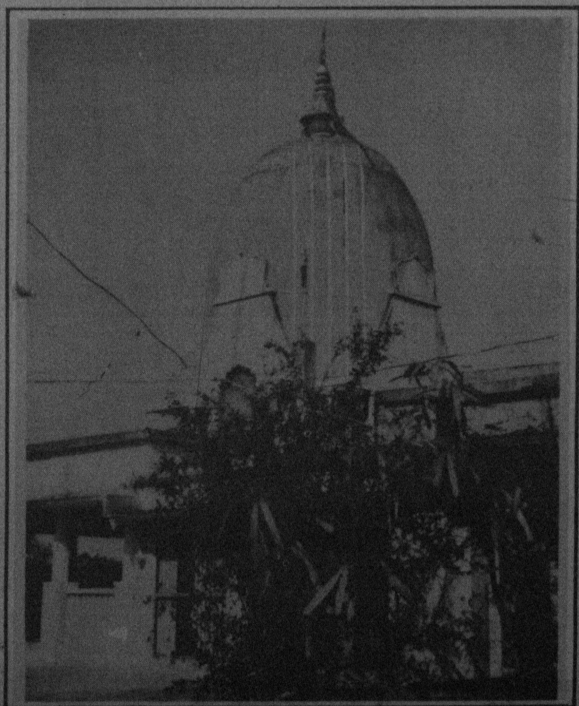
ফটো—লেখক।

পুরীর উপকণ্ঠে গির্ণারী-বস্তে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম। এই আশ্রম-প্রাঙ্গণেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নাঙ্গাবাবার সমাধি-মন্দির।

ফটো—লেখক।

কেশরী বংশের রাজাদের কীর্তি বহন করে চলেছে মুক্তেশ্বর মন্দির—নবম শতাব্দী থেকে। এই মন্দিরটি 'উড়িষ্যার শিল্প-রত্ন' শব্দে ভূষিত করেন শিল্প-প্রেমিক সাহেব ফার্গুসন।

ফটো—লেখক।

উদয়গিরি পাহাড় থেকে দেখা খণ্ডগিরির জৈন-মন্দির। মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত-আছে জৈন তীর্থংকরের মূর্ত্তি।

ফটো—লেখক।
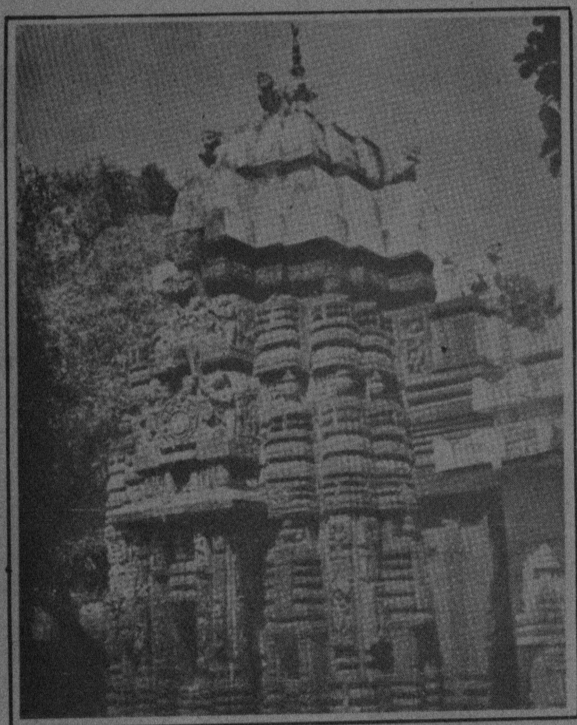
সপ্তম শতাব্দীতে মহারাণী গৌরীদেবী কর্তৃক স্থাপিত— গৌরীমন্দির।
ফটো—BHUBANESWAR BY DEBALA MITRA গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
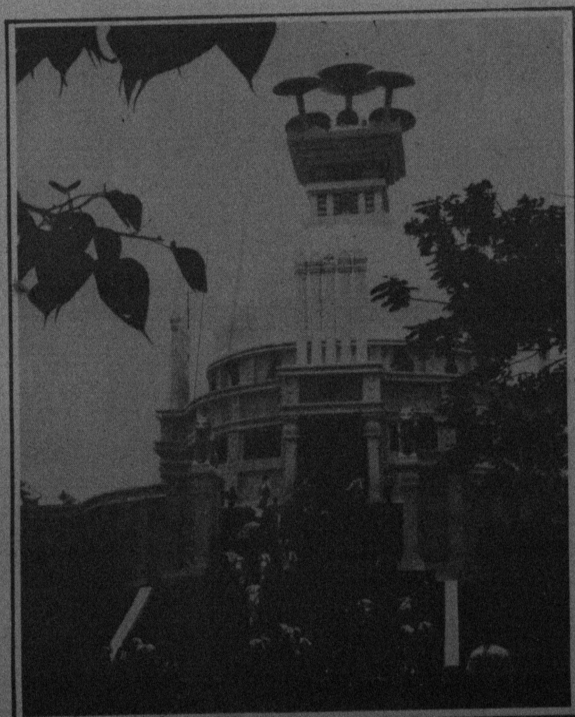
ধৌলী গিরিতে 'বিশ্ব কলিঙ্গ শান্তি স্তূপ'—বুদ্ধ মন্দির। খ্রীষ্ট-পূর্ব আনুমানিক ২৫০ বছর আগে এই পাহাড়েই সম্রাট অশোক দীক্ষিত হন বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্তের কাছে।
ফটো—প্রদীপ দাশ।

৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত পার্বতী মন্দির—যার গঠনশৈলীর সঙ্গে প্রচলিত উৎকলীয় মন্দির নির্মাণ শিল্পের কোন মিল নেই।
ফটো—BHUBANESWAR

BY DEBALA MITRA গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
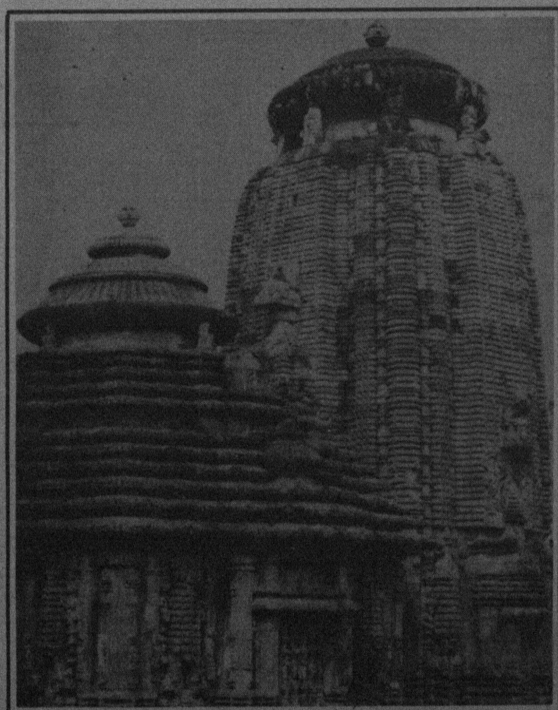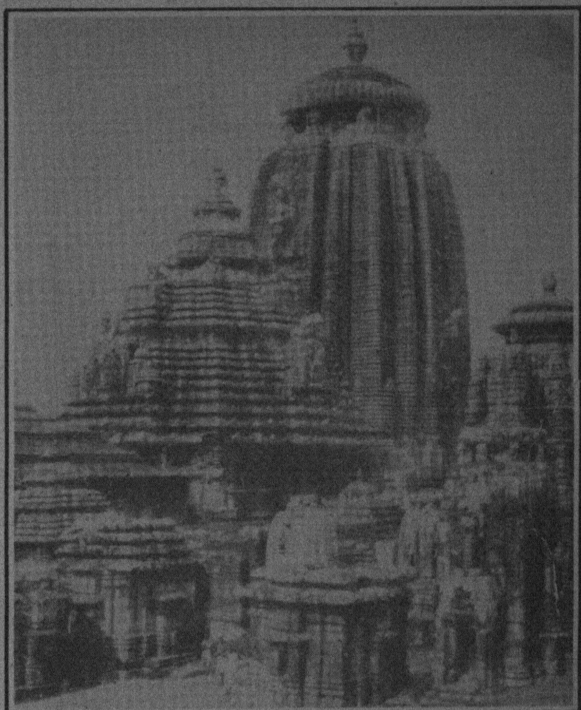
প্রাচীনকালের একাম্র-কানন—আজকের ভুবনেশ্বরে ৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যযাতিকেশরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গরাজ মন্দির।
ফটো—BHUBANESWAR
BY DEBALA MITRA গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
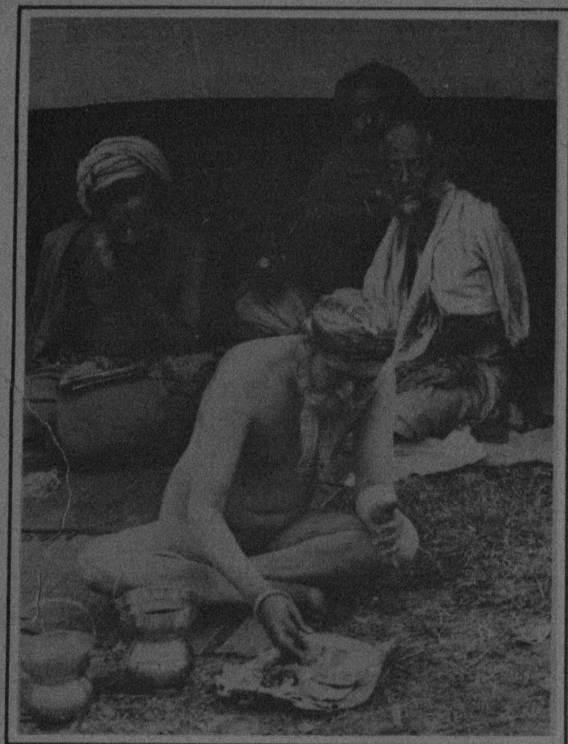
অযত্নে লালিত এমন সুন্দর সুঠাম নিরোগ দেহ কোন সুখাদ্য ভোজনেও কি সম্ভব? রাম-তীর্থ চিত্রকূটে এক সাধুভাণ্ডারায় ভোজনরত নির্বিকার দিগম্বর সাধু।

ফটো—বরুণকুমার হাজরা।
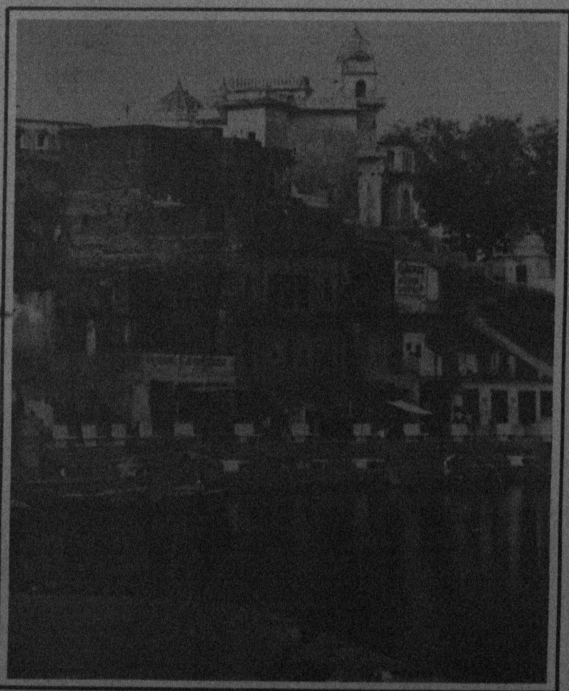
আনুমানিক ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে—মন্দাকিনী গঙ্গা-তীরের এই রামঘাটে প্রেমিক-কবি তুলসীদাস পেয়েছিলেন প্রভু রামের দর্শন।

ফটো—বরুণকুমার হাজরা।

কথিত আছে, হনুমানের অনুরোধে রাম সরস্বতী গঙ্গাকে আনেন হনুমানধারা পাহাড়ে। সেই ধারা সংলগ্ন হনুমান-মন্দিরে যাওয়ার সিঁড়ি।

ফটো—বরুণকুমার হাজরা।
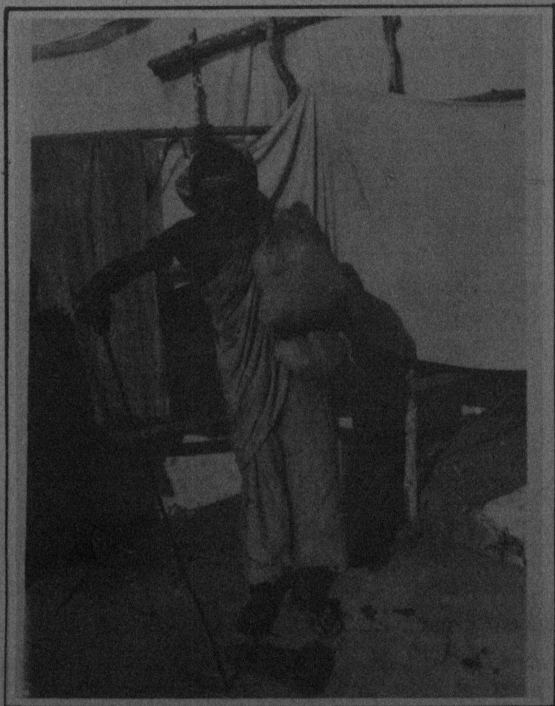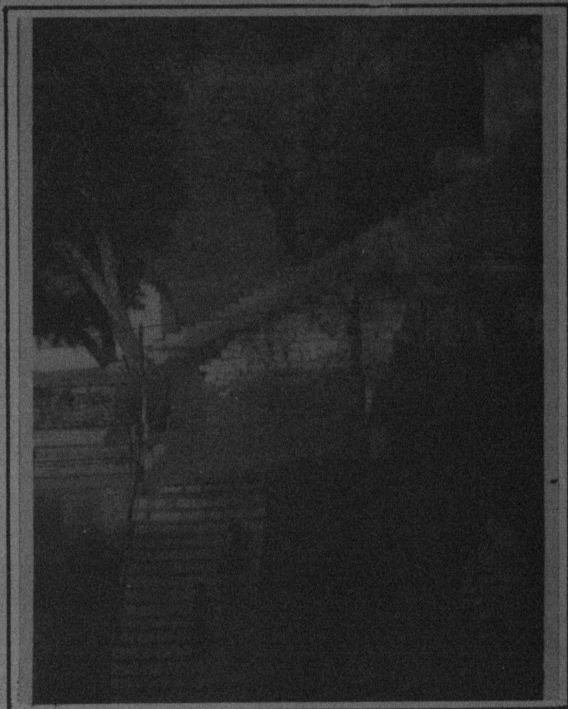
রামের লীলাক্ষেত্র চিত্রকূট দর্শনে এসেছেন এক আশ্রয়হীন পথ-চলতি সাধু।

ফটো—লেখক।
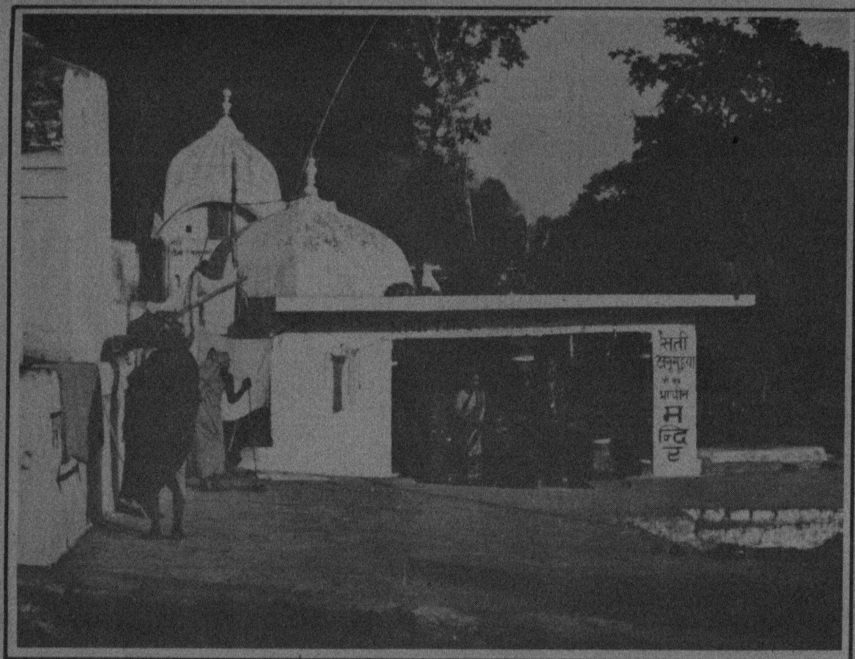
অত্রির তপোবনে সতী অনসূয়ার প্রাচীন মন্দির—যেখানে একদা বৃদ্ধা অনসূয়া উপদেশ দিয়েছিলেন জনক-কন্যা জানকীকে।
ফটো—লেখক।
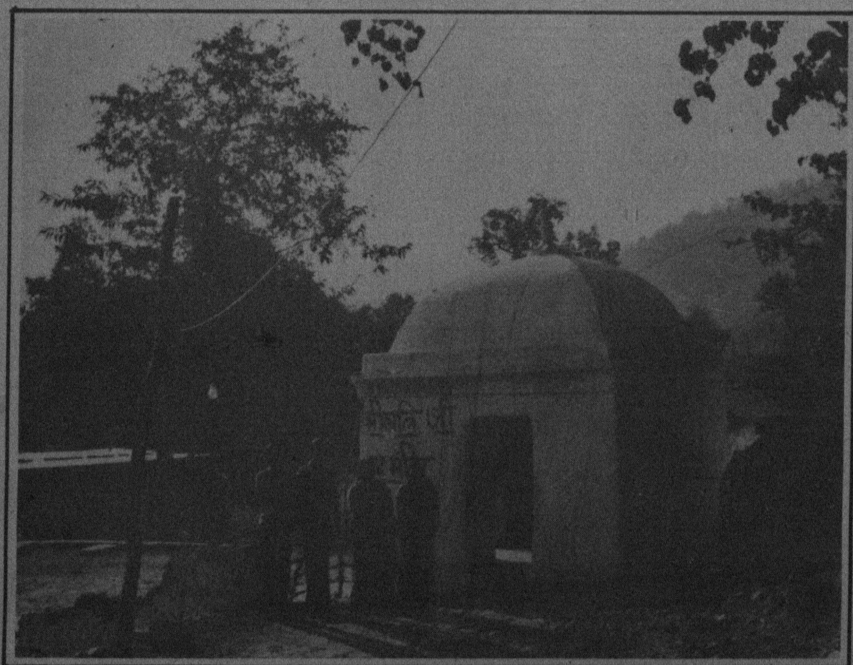
মর্যাদা পুরুষ রামের পাদ-স্পর্শে পবিত্র ক্রেতাযুগ থেকে আজও—চিত্রকূটের তপোবনে প্রাচীন অত্রি-আশ্রম।
ফটো—লেখক।

চিত্রকূটের উপবনে স্ফটিকশিলা—পিছনে মন্দাকিনী। একদা যেখানে সীতার সঙ্গে বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন করতেন স্বয়ং রামচন্দ্র—এখন বিশ্রাম করেন তীর্থযাত্রীরা। ফটো—লেখক।
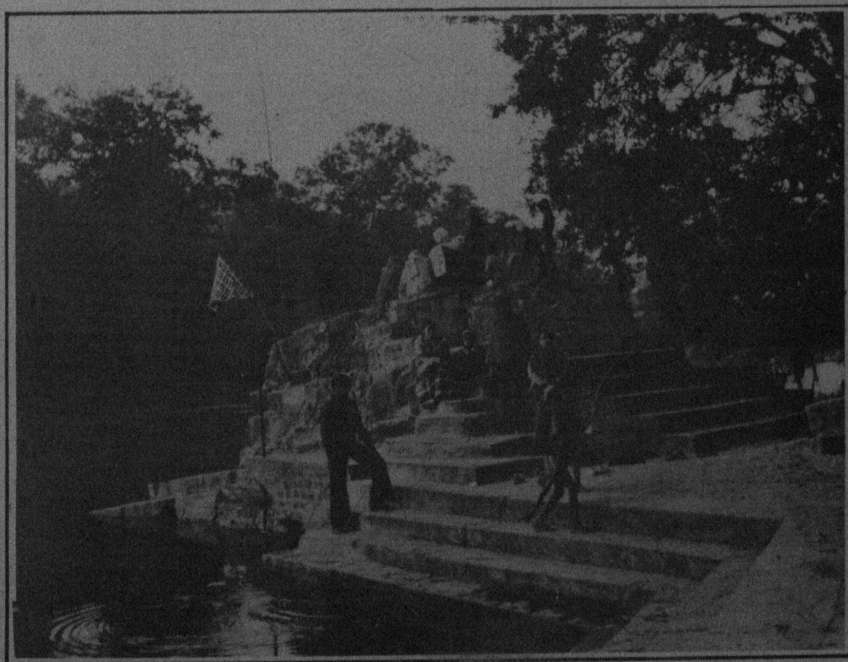
মন্দাকিনীর ওপারে বনভূমি, এপারে স্ফটিক শিলার পাশেই উঁচু টিলা—যেখানে রয়েছে লক্ষ্মণের পদচিহ্ন। ফটো—লেখক।
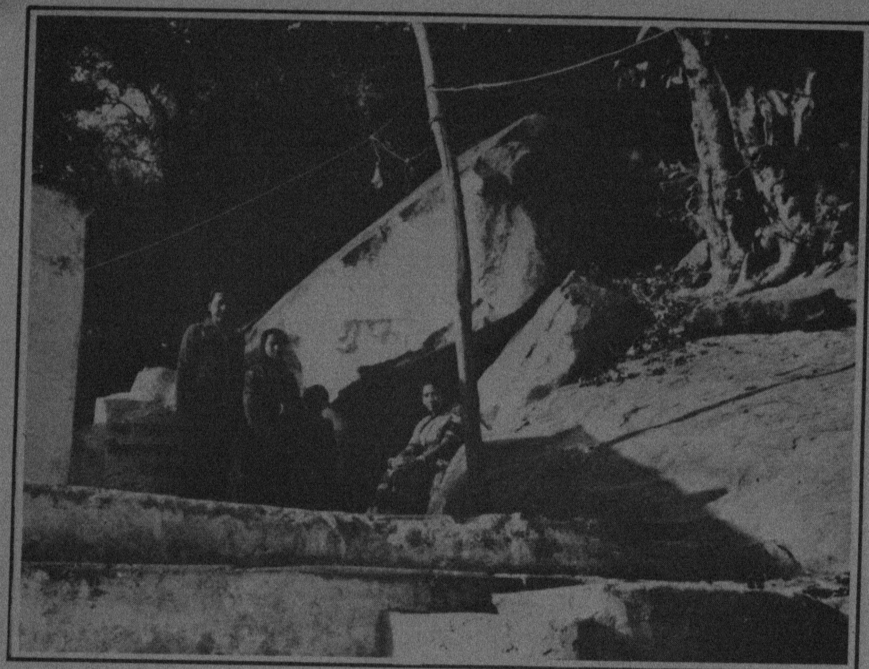
কথিত আছে, অত্রি-আশ্রমের এই গুহায় ছদ্মবেশী তিনজন দেবতাকে সতী অনসূয়া মাতৃ-ভাবে স্তন্যপান করান।

ফটো—লেখক।
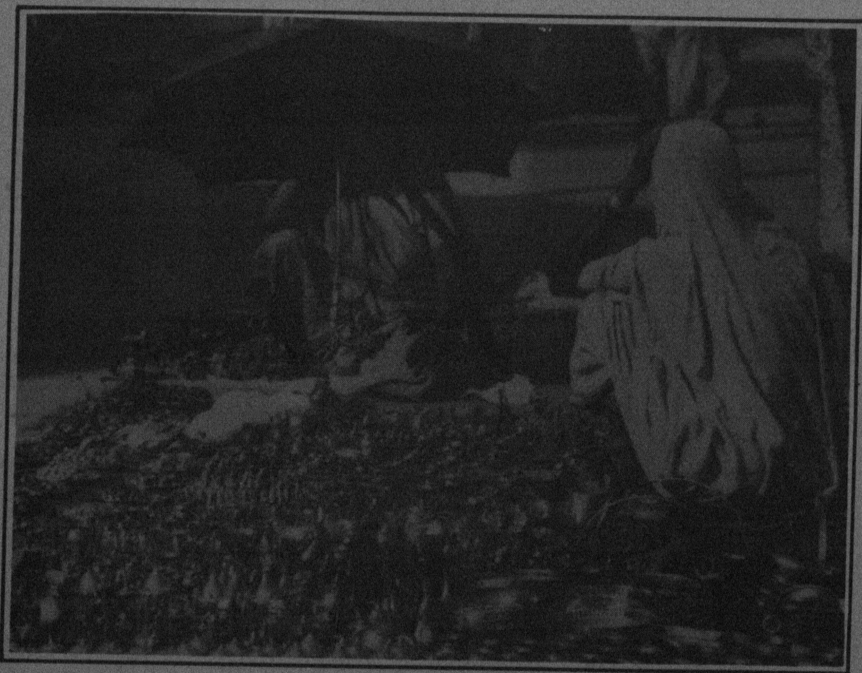
চিত্রকূটের রামঘাটে পসরা সাজিয়ে বসে আছে দোকানী—ক্রেতার আশায়।

ফটো—বরুণকুমার হাজরা।

সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ্ এসেছিলেন কামাখ্যা দর্শনে। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে রাজা বিশ্বসিংহ কর্তৃক স্থাপিত নীলাচল পর্বতে—মোক্ষদাদেবী কামাখ্যা মন্দির। *ফটো—লেখক।*
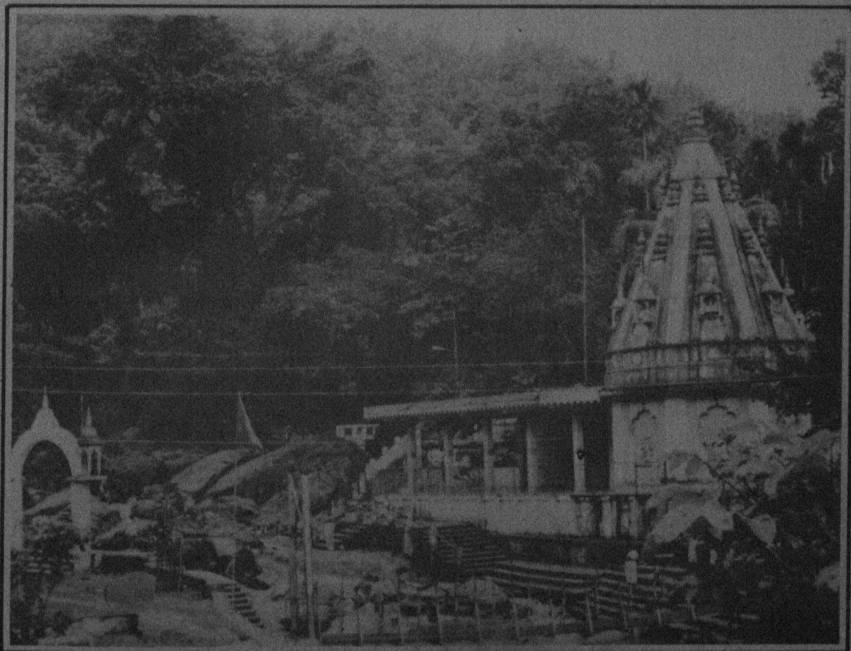
পৌরাণিক সন্ধ্যাচল পর্বতের পাদদেশে বশিষ্ঠ গঙ্গা-তীরে মহামুনি বশিষ্টদেবের আশ্রম। মন্দির-মধ্যে রয়েছে বশিষ্টের আসন। *ফটো—লেখক।*
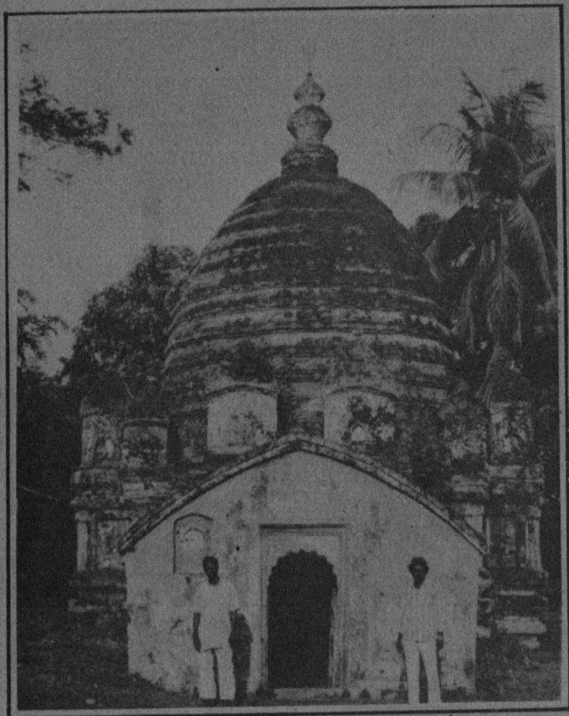
দেবী ছিন্নমস্তার প্রাচীন মন্দির—কামাখ্যা মন্দিরের অদূরেই।
ফটো—লেখক।
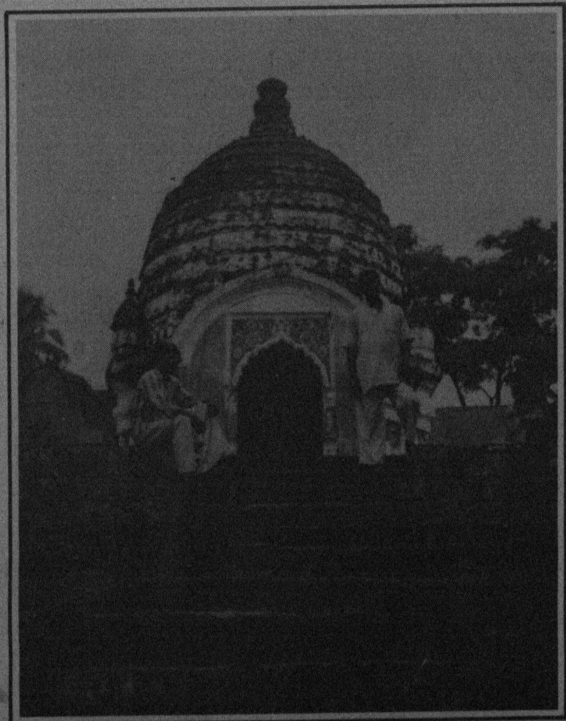
কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় কামাখ্যা-মন্দির সংলগ্ন এই তারামন্দিরে।
ফটো—লেখক।

কালিকা পুরাণ মতে, নীলাচল পর্বতের তিনটি শৃঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ—ব্রহ্মপর্বতে দেবী ভুবনেশ্বরী মন্দির।

ফটো—লেখক।
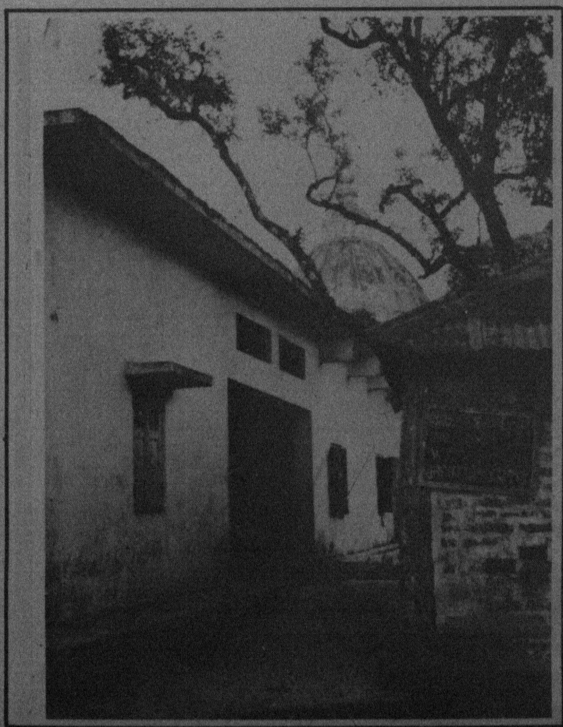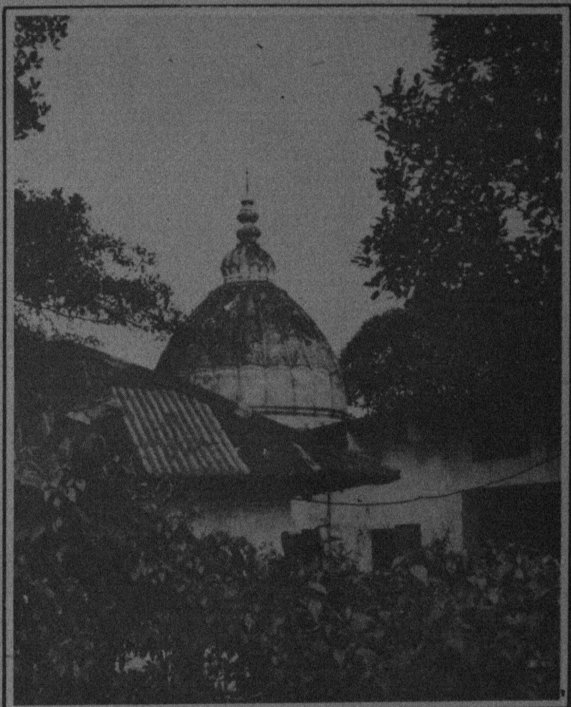
দেবী ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সামনেই রয়েছে দুটি বেলগাছ। জনশ্রুতি আছে, একদা এই গাছের গোড়ায় আসন পেতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী।

ফটো—লেখক।

যত্ন ও সংরক্ষণের অভাবে একটি প্রাচীন কালী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ—কামাখ্যা মন্দির প্রাঙ্গণে।
ফটো—লেখক।

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পিছনে আছে একটি বড় পাথরের খণ্ড—যেখানে বসে তীর্থযাত্রীরা বিশ্রাম করেন। সেখান থেকে দেখা ব্রহ্মপুত্র এবং গৌহাটি শহর।
ফটো—লেখক।
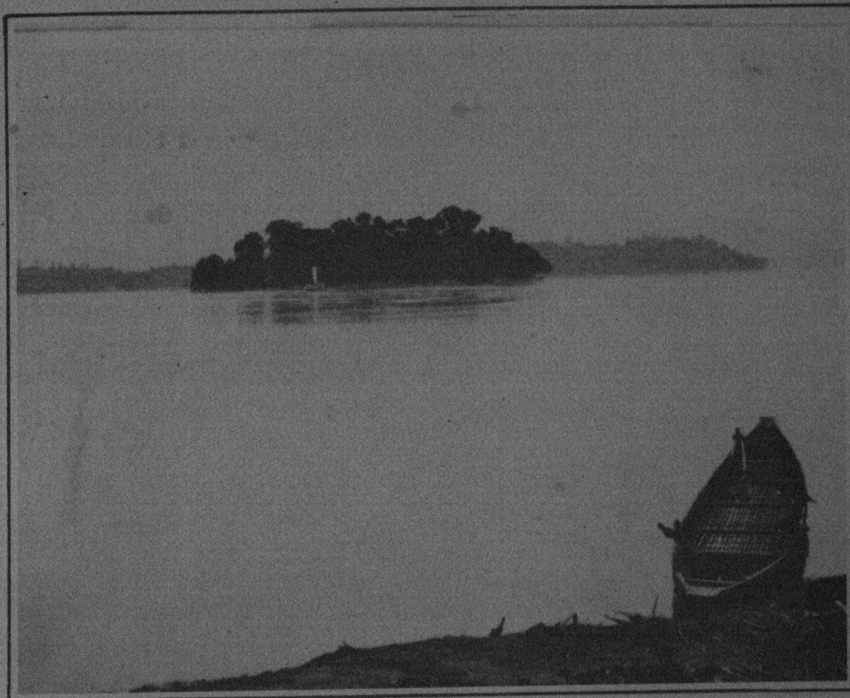
মানস সরোবর থেকে বয়ে আসা ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে ছোট্ট একটি দ্বীপ—আজকের পীকক আইল্যান্ড। পৌরাণিক নাম ভস্মাচল। এখানে দেবী কামাখ্যার ভৈরব—উমানন্দ মন্দির। ফটো—লেখক।
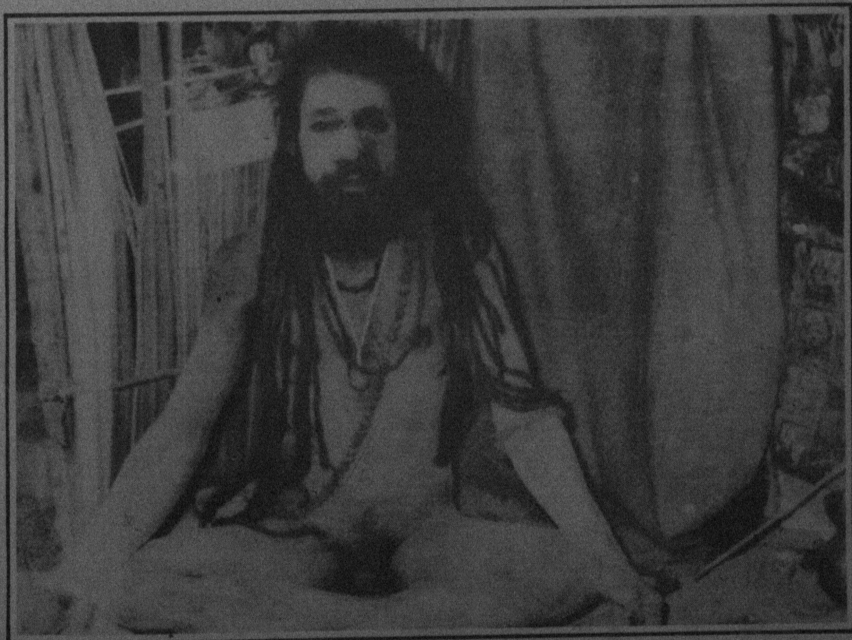
বশিষ্ঠ আশ্রম প্রাঙ্গণে অস্থায়ী ডেরা করে বসে আছেন গিরি সম্প্রদায়ের এক সাধুবাবা। ফটো—লেখক।
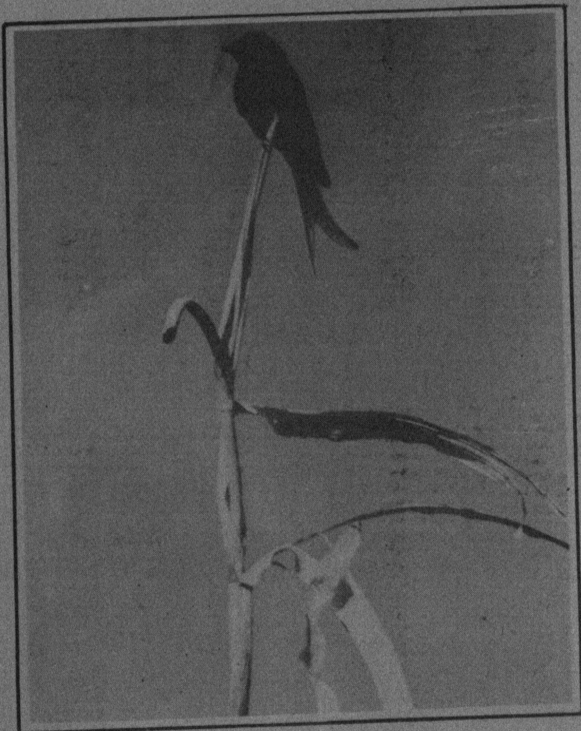
চিত্রকূটের তপোবন অত্রি-আশ্রমের একটি দৃশ্য—এক নজরে।
ফটো—বরুণকুমার হাজরা।
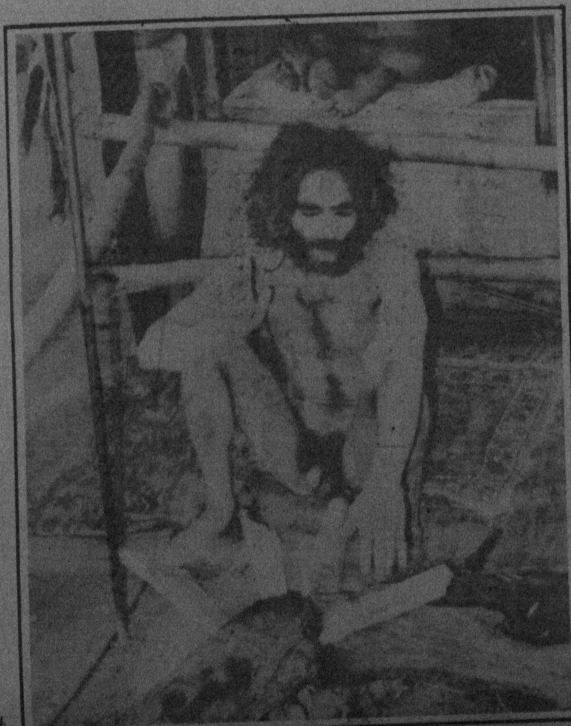
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের আগমন ঘটে কামাখ্যায়— অম্বুবাচী উৎসবে। জনৈক নাগাসাধুও এসেছেন উৎসবে—প্রকাশ্যে বসে আছেন ধুনী জ্বালিয়ে—নির্বিকার চিত্তে।
ফটো—লেখক।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র—পুরী

পুরী এক্সপ্রেস। ছাড়ে হাওড়া থেকে। রাত দশটায়। আগে ছাড়তো আরও আগে। জগন্নাথ এক্সপ্রেসও যায়। তবে পুরী এক্সপ্রেসের আগে ছেড়ে—আগে পেঁৗছায়। ধরবো পুরী এক্সপ্রেস। বার্থ সংরক্ষণ করেই রেখেছি। তাই আর চিন্তা নেই।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে কখন যে হাওড়ায় পেঁৗছাবো—তার ঠিক নেই। তাই অনেক আগে বেরিয়ে—অনেক আগেই এসে পেঁৗচেছি হাওড়ায়। এখন অবস্থাটা দেশ-ওয়ালীদের মতো। বসে আছি প্ল্যাটফরমে। কখনও মাথায়—কখনও গালে হাত দিয়ে। ভাবছি চৌদ্দপুরুষের কথা। কি করেছিলেন তাঁরা—এখন প্ল্যাটফরমে বসে আমি কি করছি। সময় কাটাতে এ-ছাড়া উপায় কি!

এ-তো গেল আমার কথা। এবার বলি রেলের কথা। প্রশাসনিক অপদার্থতা আর কাকে বলে! ভদ্রতা করে খালি ট্রেনটা যখন প্ল্যাটফরমে দিল—তখন রাত পোনে এগারোটা। ছাড়বে কখন—জানি না। শুরু হলো হুড়োহুড়ি। যেমন হয়। সময়ের কাজ সময়ে না হলে এমনটাই হয়। একের অপদার্থতায় ভোগে পাঁচজন। আমার মতো আর সকলের একই দশা। শনিতে পেয়েছে।

সঙ্গে যাদের বাচ্চা আছে—তাদের দশা আরও করুণ। লটবহর আর বাচ্চা—দুই-ই আছে। ওটার জন্য তো লকার নেই। নেংটি পরা সন্ন্যাসীও কেউ নয়। শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে কারও বোচকা—কারও বাক্সের ওপর। শিশু যে! রাত তো কম হলো না। মা ঠেলে উঠিয়ে দেয়। গাড়ী এসেছে—ওঠ্ ওঠ্, যাবি না? গাড়ী আসেনি—ঘাটে যাওয়ার ব্যবস্থা এসেছে। টানতে টানতে নিয়ে চলে—যেন সকালে কে. জি. স্কুলে নিয়ে চলেছে মা।

কোচ নং-এস ফাইভ। এক দুই করে এগিয়ে চলা। তিনের জায়গায় চার। পাঁচের জায়গায় সাত। বাদ বাকি হাওয়া। অন্য নম্বর জুড়ে বসেছে। এবার পাওয়া গেল পাঁচ। চারের পরে পেলাম না। যারা ছয়ে আছো—খুঁজে মরো।

এতেই গেল মিনিট সাতেক। সকলের ওই একই অবস্থা। যাত্রাপথ এক—পৃথক ফল হয় কি করে? বাচ্চা নেই তাই বাঁচোয়া।

বার্থে ব্যাগ রেখে 'সুইচ অন' করলাম। আলো জ্বললো না—পাখাও চললো না। নামলাম। ধরপাকড় করে আনলাম কোচের কন্ডাকটারকে। মৌখিক অভিযোগ জানালাম। নবাবী কায়দায় বললেন, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এটা কোন ব্যাপারই না। ট্রেন চললে আলো জ্বলবে—পাখাও ঘুরবে। ব্যাটারীতে তখন চার্জ হবে। কত জন্মের সুকৃতি থাকলে তবেই মানুষ এমন একটা চাকরী পায়!

রাত এগারোটা কুড়ি। ট্রেন ছাড়লো। চললো ধীরে ধীরে। গতি আরও বাড়লো। আলো জ্বলেছিল—পাখাও হয়তো চলেছিল—আমার বার্থের নয়, কণ্ডাকটারের বাড়ীতে—শোয়ার ঘরে। কোন পার্থক্যই খুঁজে পেলাম না ঠুঁটো জগন্নাথ আর রেল প্রশাসনে।

ট্রেন দেরীতে ছেড়ে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাবে—এমন আশা গবেট মাথাও করে না। আমিও করলাম না। শুধু বলতে ইচ্ছে করে—আস্তাকুঁড়ে যাক্ রেলের প্রচার বিভাগের 'সুরক্ষা নিরাপত্তা আর সময়ানুবর্তিতার' মূল্যহীন সাইনবোর্ডগুলো।

এই নিয়ে ন-বার এলাম পুরীতে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ। হাওড়া থেকে ৪৯৯ কি. মি.। সারাদিন নয়—মাত্র একটা রাত্রি লাগে। কটক থেকে পুরীর দূরত্ব ৯০ কি. মি.—ভুবনেশ্বর থেকে ৫৮ কি. মি.।

স্টেশন থেকে বেরোলেই রিক্সা—পাওয়া যায় অটো। ভাড়ার ব্যাপারে দুটাকা এদিক আর ওদিক। সব তীর্থে যেমন হয়। যার কাছ থেকে যা নিতে পারে। স্টেশন থেকে চওড়া রাস্তা—চলে গেছে রাজভবনের পাশ দিয়ে—সমুদ্রকে বাঁয়ে রেখে—সোজা স্বর্গদ্বার।

উঠলাম হলিডে হোমে। খাটবিছানা থেকে রান্নার যাবতীয় জিনিসপত্র—সবই থাকে, সব হলিডে হোমে। বাজার করো আর রান্না করে খাও। পয়সা বাঁচাও।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হলিডে হোম আছে এখানে। সরকারী, বেসরকারী। আগের থেকে বুকিং করেই আসতে হয়। এসে ভাড়া করতে চাইলে পাওয়া যায় না। তাছাড়া হোটেল, ধর্মশালার ছড়াছড়ি। পাওয়া যায় ঘরভাড়া। থাকার জায়গার অভাব নেই। পুরী কেন—ভারতের কোন তীর্থে থাকার ব্যবস্থা হয়নি—ছেলেপুলে বউ নিয়ে ফুটপাথে পড়েছিল কেউ—আমার নজরে এমন কেউ পড়েনি কখনও। আশ্রয় একটা মিলবেই। তবে ভালো আর মন্দ। খরচা কম বা বেশী—পার্থক্য এই যা।

ভক্ত, ভক্তি আর ভাস্কর্য—এই তিন নিয়েই উড়িষ্যা। প্রাচীন নাম উৎকল—কলিঙ্গ-দেশ। পুরী জেলা শহর। জগন্নাথদেবের মন্দির আর সমুদ্র—এ-দুই-ই পুরীর প্রধান আকর্ষণ। তাছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তীর্থে তীর্থময় হয়ে উঠেছে পুরী—উড়িষ্যার বিভিন্নক্ষেত্র। এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এখানে পাহাড়, নদী, সমুদ্র আর প্রাচীন ভাস্কর্যের।

পুরী একাধারে বৈষ্ণব এবং শাক্তদের তীর্থ ভূমি। জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরকে বেষ্টন করেই অসংখ্য মন্দির—ছোট বড় তীর্থ। আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তীর্থযাত্রী আর পর্যটক—এদের নিয়েই প্রাণের স্পন্দন শহর-তীর্থ—পুরীতে। বেড়াতে আসা বিদেশী পর্যটক—তাদের সংখ্যাও কম নয়। ভগবানের টানে নয়—তারা আসে ভাস্কর্যের টানে। হিন্দুমন্দিরের কোনটাতেই প্রবেশাধিকার নেই তাদের। দূর থেকে দেখতে হয় মন্দির—প্রাচীন ভাস্কর্যের কারুশিল্প।

অনেকের মুখেই শুনেছি, তিন চারদিনই যথেষ্ট। তার বেশী ভালো লাগে না পুরীতে। কথাটা আমারও ভালো লাগে না। ভালোভাবে দেখতে হলে—আন্তরিকভাবে জানতে হলে, পুরীতে থাকতে হবে আরও কয়েকটা দিন। ভালো লাগবে। গেলাম আর হোটেল, হলিডে হোমে উঠলাম—স্বর্গদ্বারে সমুদ্র সৈকতে সকাল সন্ধ্যেয় বসলাম—নমো নমো করে একদিন জগন্নাথ দর্শন—বাড়ীর জন্যে কিছু খাজা, মহাপ্রসাদ কিনে ফিরলে—পুরী সত্যিই ভালো লাগবে না—এ-কথা সত্য।

হাতে সময় নিয়েই এসেছি। তাই তাড়া নেই। তাড়ায় মন ভরে না। মেয়ের বিয়ের দিন ঠিক। ফিরে গিয়েই দিতে হবে—এমন যাদের ভাব—তাদের নামেই দেখা—নামেই ঘোরা। তারপর পাড়ায় গিয়ে—পুরী ঘুরে এলুম। দারুণ লাগলো।

তীর্থযাত্রী কিংবা ভ্রমণপিয়াসী—প্রায় সকলেই এসে ওঠেন স্বর্গদ্বারে। সমুদ্রের ধারে। এখানেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ। পাশ দিয়েই চলে গেছে একটা সোজা রাস্তা। হেঁটে গেলে জগন্নাথদেবের মন্দির মিনিট দশেকের পথ। হেঁটে যাওয়াই ভালো। রিক্সা ভাড়া বেশী। হাঁটলে পয়সা বাঁচে। দেখা হয়—বেড়ানোও হয়। বেড়ানোর জন্যই তো যাওয়া।

আজকের পুরীতে পাওয়া যায় সবকিছুই—অনায়াসে। অভাব নেই কোন কিছুরই। অসংখ্য দোকানপাট। সাজানো ঝকঝকে। হরেক রকমের শিল্পদ্রব্যের ছড়াছড়ি—ঝিনুক আর পাথরের। সবই ঘর সাজানোর জিনিষ। প্রধান আকর্ষণ কটকী শাড়ি। এর বাহারও বেশ দেখনাই।

বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এই তীর্থ। একই তীর্থের অনেক নাম। আদুরে নাতির যেমন হয়। শ্রীক্ষেত্র, শ্রীজগন্নাথধাম, শঙ্খক্ষেত্র, উচ্ছিষ্টক্ষেত্র, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র, উড্ডীয়ান পীঠ, জর্মানিক তীর্থ, কুশস্থলী, পুরী, মর্ত্যবৈকুণ্ঠ, নীলাদ্রী বা নীলাচল। এত নাম অন্য তীর্থে দেখিনি। বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলেই অবস্থিত প্রাচীন তীর্থ—পুরী।

হাঁটতে হাঁটতেই এলাম মন্দিরের সামনে। জগন্নাথ-মন্দিরে ঢোকার মুখেই স্থাপিত আছে পাথরের একটি স্তম্ভ—অরুণ স্তম্ভ। এটির একেবারে উপরে রয়েছে সূর্যদেবের ছোট্ট একটি মূর্তি। পূর্বে স্তম্ভটি ছিল কোনারকের সূর্যমন্দিরের সামনে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্তম্ভটি স্থাপন করা হয় এখানে। করেছিলেন মারাঠীরা। কালো পাথরের ৪০ ফুট উচ্চতার এই স্তম্ভটি একটা পাথর কেটেই তৈরী। প্রথমেই এটি স্পর্শ করেন তীর্থযাত্রীরা। তারপর এগিয়ে চলেন জগন্নাথ-দর্শনে।

এবার মন্দির চত্বরে ঢোকার মুখেই প্রধান ফটক। তারই কোণে রয়েছে জগন্নাথদেবের বড় একটি মূর্তি। ডান পাশে। শুধু জগন্নাথই। বলভদ্র এবং সুভদ্রার কোন মূর্তি নেই এখানে। জগন্নাথদেবের এই মূর্তিটি 'পতিতপাবন' নামেই খ্যাত। মন্দিরে বিধর্মীদের প্রবেশের কোন অধিকার নেই। তাদের উদ্দেশ্যেই পতিতপাবন

জগন্নাথের এখানে অধিষ্ঠান। মন্দিরে ঢুকতে হয় না। সিংহদ্বারের বাইরে থেকেই দর্শন করা যায় এই মূর্তি।
এখানে জগন্নাথদেবের অবস্থান সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তৎকালীন উড়িষ্যার রাজা ছিলেন দ্বিতীয় রামচন্দ্র দেব। তখন ভারতবর্ষব্যাপী ছিল মুসলমান শাসকদের প্রচণ্ড প্রভাব। একদা কতিপয় শাসক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন রাজাকে। হিন্দুরাজা রামচন্দ্র দেব ছিলেন জগন্নাথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত। ধর্মান্তরিত রাজা হারালেন মন্দিরে প্রবেশাধিকার। বন্ধ হলো জগন্নাথ দর্শন। ভক্তের আকুল আর্তি শুনলেন ভগবান। আদেশ হলো জগন্নাথদেবের। সিংহদ্বারের মুখেই প্রতিষ্ঠিত হলো পতিতপাবন জগন্নাথ। প্রতিদিন আসতেন রামচন্দ্র দেব। বাইরের থেকে দর্শন করে চলে যেতেন। ভক্ত রাজার দর্শন-বাসনা এইভাবেই পূরণ করলেন প্রভু জগন্নাথ।
পতিতপাবন দর্শন করে কয়েক পা এগোলেই পড়বে সিঁড়ি। তার বাঁপাশেই বিশ্বনাথ মন্দির। প্রথমে বিশ্বনাথ দর্শন করে পরে জগন্নাথ দর্শন করাই এখানকার বিধি। কথিত আছে, কাশীর বিশ্বনাথ অধিষ্ঠান করছেন এই মন্দিরে।
সিংহদ্বার পেরোলেই জগন্নাথদেবের বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ। এটি ২২ ফুট উঁচু এবং ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি চওড়া একটি প্রাচীরে ঘেরা। শব্দ প্রতিরোধক প্রাচীর। 'মেঘনাদ' নামে এটি প্রসিদ্ধ।
শ্রীক্ষেত্রে এই প্রাচীর সম্পর্কেও আছে বহুকালের একটি প্রবাদ। একদা মহালক্ষ্মীর সঙ্গে কোন কারণবশত কলহ হয় জগন্নাথদেবের। আর পাঁচটা সংসারে যেমন হয়ে থাকে। ভগবানের সংসারেও রেহাই নেই। বউকে জব্দ করতে হলে স্বামীর একমাত্র ওষুধ তার বাপের বাড়ী তুলে কথা বলা। জগন্নাথদেবও জানতেন। করলেনও তাই। কলহে কথাচ্ছলে বললেন, সাগর গর্জনকারী—তাঁরই কন্যা মহালক্ষ্মী। যেমন বাপ তেমন তাঁর মেয়ে। কথাটা গায়ে মেখে নিলেন মহালক্ষ্মী। গর্জন শব্দে কলহপ্রিয়া। তার উপর আবার বাপ তুলে কথা! আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো দেবীর। তখন তাঁরই আদেশে নির্মিত হলো মেঘনাদ প্রাচীর। বন্ধ হলো মন্দিরে আসা সমুদ্র-গর্জনের শব্দ।
প্রবাদ যাই হোক না কেন, পুরীর এই মন্দির নির্মাণকালে তৎকালীন ইঞ্জিনিয়াররা এক চমকপ্রদ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই মেঘনাদ প্রাচীর। মন্দিরে প্রবেশের পর বাইরের কোলাহল আর একটানা সমুদ্র-গর্জনের শব্দ কানে এলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হবে তীর্থযাত্রীর—দর্শনার্থীদের। এ-কথা ভেবেই তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন শব্দ প্রতিরোধক গুণবিশিষ্ট এই পাথরগুলি। উচ্চতা আর পাথর—এ-দুয়ের সমন্বয়ে এমন এক কারিগরী কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরী প্রাচীর যে, বাইরের কোন কোলাহল আর সমুদ্র-গর্জনের শব্দ প্রবেশ করতে পারে না মন্দিরে—মন্দির-প্রাঙ্গণে। তখনকার ইঞ্জিনিয়ারদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির কথা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী আর

কোন তীর্থেই এমনটি নেই। যেমন নেই সোমনাথ, দ্বারকায়।

মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে মোট সিঁড়ি আছে বাইশটা। অতিক্রম করলেই মন্দির চত্বর। উড়িয়া ভাষায় বলে 'বাইশ পাহাচ'। পাহাচ শব্দের অর্থ সিঁড়ি।

লোক-বিশ্বাস, মানুষের মুক্তিলাভের অন্তরায় হলো বাইশ প্রকার দোষ এবং দুর্বলতা। তাই জগন্নাথকে স্মরণ করে ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই সিঁড়িগুলি অতিক্রম করলে সমস্ত পাপ ও দোষ দূর হয়। এখানকার সিঁড়িতে বসে পিণ্ডদানেরও প্রথা আছে। পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি হয়।

এখানে শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেই মন্দিরের ভিতরের পথনির্দেশক দ্বার। ভিতরের আকৃতি অনেকটা কুমীরের মতো। তাই নাম হয়েছে এর কূর্মবেড়া। তবে এটি প্রবেশ পথ নয়। বিশাল দুটি প্রবেশদ্বার রয়েছে মন্দিরের দুপাশে। বাঁপাশেরটি দিয়েই মন্দিরে ঢোকার বিধি। জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্যদেবতা আগ্নেয়েশ্বর। ইনি কূর্মবেড়ার প্রতিপালক।

মন্দির চত্বরের পূর্বদিকে—একটু এগোলেই ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ-মন্দির। জনশ্রুতি আছে, তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম। খ্যাতি ছিল তাঁর দেশজোড়া। প্রেমময় পুরুষ চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি যে কৃষ্ণের অবতার—এ-কথায় বিশ্বাস করতেন না তিনি। একদিন হঠাৎ মহাপ্রভু ধারণ করলেন ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্তি। সংশয় নিরসন হলো সার্বভৌমের। স্বীকার করলেন মহাপ্রভুকে অবতার পুরুষ বলে। তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষার্থে লীলাপ্রকটের স্থানটিতেই পরবর্তীকালে স্থাপিত হয় গৌরাঙ্গ-মন্দির। প্রতিষ্ঠিত হলো মন্দিরে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্তখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে—

> "শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
> আত্মভাবে হইলা ষড়ভুজ অবতার॥"

> "অপূর্ব ষড়ভুজ মূর্তি—কোটি সূর্যসম।
> দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥"

গৌরাঙ্গ মূর্তির একপাশে কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস বাবাজী, অপর পাশে প্রতিষ্ঠিত আছে শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের মূর্তি।

পুরীর মন্দির নির্মাণ শেষ হলে জগন্নাথ প্রতিষ্ঠার আগেই পূজা করা হয়েছিল গণেশের। মন্দির চত্বরেই রয়েছে কল্পগণেশ মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে তিনটি গণেশ—কল্পগণেশ, সিদ্ধগণেশ আর চিন্তামণি গণেশ। জনশ্রুতি আছে, চিন্তামণি গণেশের কাছে কোন দীক্ষিত ব্যক্তি গণেশের বীজমন্ত্র ১০৮ বার জপ করলে তার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হয়।

এবার প্রবেশ করলাম মন্দিরে। জগন্নাথ মন্দির যেন পুরনো এক স্মৃতি-মন্দির। এ-মন্দির বহন করে চলেছে প্রাচীন ভারতের দর্শন, ধর্ম আর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—শত শত বছর ধরে। এ-দেশে প্রাচীন মন্দির রয়েছে অসংখ্য। তার মধ্যে জগন্নাথ-

দেবের মন্দির অন্যতম—মাহাত্ম্যপূর্ণ।

কিংবদন্তী আছে, পাণ্ডুবংশের রাজা ছিলেন উদয়ন। তাঁর পুত্র রাজা ইন্দ্রবল—যিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে। খ্রীষ্টজন্মের ৪৮৪ বৎসর আগে—তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করেছিলেন জগন্নাথদেবের। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজত্বকালে জগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্রে পূজিত হতেন নীলমাধব নামে। একই সঙ্গে চারিদিকে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল নীলমাধবের।

বহু বছর কেটে গেল এইভাবে। তখন মগধের রাজা ছিলেন মহাপদ্মনন্দ। শ্রীক্ষেত্রের খ্যাতি আর নীলমাধবের মাহাত্ম্য-কথা পেঁছালো মগধরাজের কাছে। আকৃষ্ট হলেন তিনি। একদা গোপনে এলেন শ্রীক্ষেত্রে। সকলের অগোচরে নিয়ে গেলেন নীলমাধব জগন্নাথদেবকে। প্রতিষ্ঠা করলেন মগধে।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কথা। কলিঙ্গের তৎকালীন সম্রাট খারবেল। একদা আক্রমণ করলেন মগধ রাজ্য। জয়ী হলেন যুদ্ধে। তিনিই শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে এলেন নীলমাধবকে। করলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। চলতে লাগলো নিয়মিত পূজা, ভোগরাগ।

৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ—তখন উড়িষ্যার রাজা ছিলেন যযাতিকেশরী। তিনি নির্মাণ করলেন একটি মন্দির। জগন্নাথ নীলমাধবকে প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন মন্দিরে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। পাশেই সমুদ্র। অবিরাম বয়ে চলেছে নোনা হাওয়া। ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল মন্দিরটি। চিরতরে লুপ্ত হলো যযাতিকেশরীর স্মৃতি।

গঙ্গরাজ রাঘবদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে, গঙ্গবংশের খ্যাতিমান রাজা ছিলেন চোড়গঙ্গ—যিনি চুড়ঙ্গদেব নামেও প্রসিদ্ধ। ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার নতুন করে নির্মাণ করলেন জগন্নাথ মন্দির। কালের প্রভাবে সে মন্দিরও গেল কালের কবলে।

এরপর ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। আজকের মন্দিরটি—যেটি আমরা দেখি—সেটির নির্মাণকার্য শুরু করলেন গঙ্গবংশের রাজা অনন্ত বর্মণ। শেষ করতে পারলেন না। দেহরক্ষা করলেন তিনি। এবার কাজে হাত দিলেন তাঁরই প্রপৌত্র অনঙ্গ ভীমদেব। অসমাপ্ত কাজ শুরু করলেন ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। শেষ হলো ১২২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

মন্দির নির্মাণের সময়কাল নিয়ে দ্বিমত আছে। অনেকের মতে, আজকের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। জানা যায়, তৎকালীন উড়িষ্যার বারো বছরের আয়ের অর্থ ব্যয় হয়েছিল এই মন্দির নির্মাণে। সেই মন্দিরটি আজও স্বকীয় মহিমায় বিরাজিত।

জগন্নাথদেবের মন্দিরকে কেন্দ্র করে মন্দির-চত্বরে আছে আরও দেবদেবীর মন্দির। অধিকাংশই অনঙ্গ ভীমদেবের কীর্তি।

অনঙ্গ ভীমদেবের দেহরক্ষার পরের কথা। জগন্নাথ-মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ করেন তাঁরই বংশধর রাজারা। এই বংশের সাতাশতম রাজা ছিলেন

পুরুষোত্তম দেব। তাঁর পুত্র রাজা প্রতাপরুদ্র দেব। ১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় জগন্নাথদেবের ভোগমণ্ডপ। ১৪৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে—রন্ধনশালা। এ-গুলি পুরুষোত্তম দেবেরই মহান কীর্তি। বর্তমানের নাট্যমন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজা প্রতাপরুদ্র দেব। ১৪৯৭—১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। অনেকের মতে, নাটমন্দিরের নির্মাতা রাজা গোবিন্দ বিদ্যাধর দেব।

বিশাল এই মন্দির-চত্বরে প্রবেশের জন্য চারদিকে রয়েছে চারটি বিশাল দরজা। পূর্বদিকে অর্থাৎ বড় রাস্তার উপরে অরুণ স্তম্ভের সামনেরটি—সিংহদ্বার। পশ্চিমে ব্যাঘ্রদ্বার এবং উত্তরে হস্তিদ্বার। দক্ষিণের দ্বারটির নাম অশ্বদ্বার। প্রতিটি দ্বারই তোরণ বিশিষ্ট। তাতে খোদিত আছে নানা দেবদেবীর মূর্তি। জগন্নাথ মন্দিরের উচ্চতা—২০৫ ফুট। চূড়াটি বিষ্ণুচক্র এবং ধ্বজাদ্বারা শোভিত।

সুবিশাল এই মন্দিরটি চারটি ভাগে বিভক্ত। মূলমন্দির, নাটমন্দির বা জগমোহন, মুখশালা এবং ভোগমণ্ডপ।

ভোগের উপকরণাদি যেখানে সাজিয়ে রাখা হয় সেটিই ভোগমণ্ডপ। নাটমন্দির বা জগমোহন হলো ভোগমণ্ডপের পরেই—যেখানে গড়ুড় স্তম্ভটি স্থাপিত আছে।

নাটমন্দিরের পরেই মুখশালা—যেখানে দাঁড়িয়ে তীর্থযাত্রীরা দর্শন করে থাকেন জগন্নাথদেবকে।

এবার মূলমন্দির বা গর্ভমন্দির। ঠিক মুখশালার পরেই। গর্ভমন্দিরে আছে একটি রত্নবেদী। যার উপরে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা—এই বিগ্রহ তিনের অবস্থান। আসনটির নামই রত্নবেদী। কালো পাথরে বাঁধানো। লম্বা ষোল ফুট—তেরো ফুট চওড়া। উচ্চতা এর চার ফুট। তিনটি বিগ্রহ ছাড়াও রত্নবেদীতে আছে শালগ্রাম শিলা, সুদর্শন চক্র এবং আরও কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তি।

ভারতবর্ষে চারটি ধাম বিদ্যমান। কিংবদন্তী আছে, ধামগুলির মধ্যে জগন্নাথদেব নারায়ণরূপে স্নান করেন বদরীনারায়ণে। দ্বারকায় পরিধান করেন বস্ত্র। পুরীতে অন্নভোগ গ্রহণ করে নিদ্রা যান রামেশ্বরে। এই চারটি ধাম দর্শন করলে মানুষ মুক্তিলাভ করেন—পুনর্জন্ম হয় না।

মন্দিরের বিগ্রহ তিনটি সাধারণত প্রতি বারো বছর অন্তর নতুন করে তৈরী ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভক্তের ভাষায়—পুরনো আকার পরিত্যাগ করেন জগন্নাথ। প্রকটিত হন নতুন কলেবরে। এই কর্মানুষ্ঠানকে বলা হয় জগন্নাথদেবের নব-কলেবর। তবে বারো বছরের হিসাব থাকলেও প্রধানত তা হয় না। অনেক সময়েই আরও কয়েক বছর বেশী অপেক্ষা করতে হয়। কারণ, যে বছর আষাঢ় মাসে দুটি পূর্ণিমার যোগ পড়বে—সেই বছরের আষাঢ়েই শুরু হবে নব-কলেবর যুগ। বিগত ১৩৭ বছরের মধ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে—১৮৫৩, ১৮৭৭, ১৯০৪, ১৯৫০, এবং সর্বশেষ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

এই নব-কলেবর অনুষ্ঠানের পিছনে প্রতিপালিত হয় এক চমকপ্রদ নিয়ম—যা সাধারণ মানুষের কল্পনাতেও আসবে না। সংক্ষেপে বলি,

উড়িষ্যার কাকটপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা আছেন দেবী মঙ্গলা। এই দেবীর পুজাবিধি সমাপন করে প্রার্থনা, মার্জনা, এবং মহামায়ার কৃপা-ভিক্ষা লাভ করেন বিদ্যাপতি এবং বিশ্বাবসু-বংশীয় নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, রাজপুরোহিত এবং শিল্পে পারদর্শী বিশিষ্ট সূত্রধরগণ। তারপর চারটি দলে তারা বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েন দারু অর্থাৎ বিগ্রহ তৈরীর গাছের সন্ধানে।

যে গাছগুলি দিয়ে তিনটি বিগ্রহ তৈরী হবে—তার কিছু লক্ষণও আছে। প্রথমত গাছটি নিমগাছ হতে হবে। জগন্নাথদেবের দারু সামান্য কৃষ্ণবর্ণ, বলরামের শ্বেত এবং সুভদ্রার দারু অবশ্যই রক্তবর্ণ হওয়া চাই। শুধু তাই নয়, গাছগুলিতে থাকতে হবে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মচিহ্ন।

প্রত্যেকটি গাছেই থাকতে হবে তিন, পাঁচ অথবা সাতটি করে শাখা। গাছগুলির স্বাদ তিক্ত হবে না—অম্লমধুর থাকবে। বজ্রপাত হয়েছে অথবা পাখীর বাসা আছে এমন গাছও চলবে না। গাছের গোড়ায় অথবা কাছেই উই ঢিবির ভিতরে বাস করবে বিষধর সাপ। গাছগুলি হওয়া চাই সরল এবং আকর্ষণীয়। অবস্থিত হতে হবে তিনটি পর্বত অথবা নদী কিংবা তিনটি রাস্তার সংযোগস্থলে। কোন গাছে কীট-পতঙ্গের দংশন থাকলেও চলবে না।

গাছগুলির সন্ধান এবং বিষয়গুলি নির্ধারণের পর প্রত্যেকটি গাছের কাছে পুজা-যজ্ঞাদি করা হয় তিনদিন। তারপর সেই গাছগুলি কাটা হয় প্রথমে সোনার কুঠার, পরে লোহার কুঠার দিয়ে। সেগুলি মাটিতে পড়লে তার পাতা, শাখা-প্রশাখা কেটে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়। এবার গরুর গাড়ীতে মূল গাছগুলি নতুন বস্ত্রে ঢেকে ফুলমালা দিয়ে সাজিয়ে আনা হয় মন্দিরে।

যে গরুর গাড়ীতে আনা হয় সেটি চার চাকাবিশিষ্ট এবং নতুন। এটির চাকা তৈরী হয় বট ও কেন্দু, তেঁতুল বা বেল কাঠ দিয়ে। প্রথমে সুদর্শনের, পরে বলরাম, তারপর সুভদ্রা এবং শেষে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ তৈরীর গাছগুলি আনা হয় পুরীতে। তারপর বিভিন্ন নিয়ম এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নির্মিত হয় দারুব্রহ্ম জগন্নাথ-মূর্তি।

সর্বশেষ নব-কলেবর হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। যথাবিধি সমস্ত আচার ও নিয়ম মেনেই হয়েছে বলে জানা যায়। অনুষ্ঠিত নতুন কলেবর উৎসবে জগন্নাথদেবের দারু পাওয়া গেছে তাপাঙ্গ অঞ্চলের চম্পাঝর গ্রাম থেকে। পুরী থেকে স্থানটির দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল।

পুরী থেকে বত্রিশ মাইল দূরে বনমালীপুর। সেখানে বলরামের, কটক জেলার কানপুর গ্রামে সুভদ্রার, এবং সুদর্শনের দারুটি পাওয়া গেছে পুরী জেলার নয়াহাট গ্রাম থেকে। পুরী থেকে গ্রামটি চুয়াল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীক্ষেত্রের এই অধ্যাত্মমণ্ডিত নব-কলেবর অনুষ্ঠানটিকে নব-যৌবন বা নেত্রোৎসবও বলে।

দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের মূর্তি সম্পর্কে ব্রজবিদেহী মহন্ত সন্তদাস বাবাজী বলেছেন, "শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি অতি আনন্দময় এবং প্রেমে পূর্ণ। এই দৃশ্যমান মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এইরূপ ভাববে যে, ভগবান তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিবার নিমিত্ত দুইটি হস্তই প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন বদনে অবস্থিত আছেন। এইরূপ ভাব অনুভব করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেই নিজে আনন্দ অনুভব করিবে এবং তাঁহার আনন্দময়তা অনুভব করিতে পারিবে।"

মন্দিরের ভিতরে ভোগমণ্ডপের দরজা—তার কাছেই প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভটির নাম গড়ুড় স্তম্ভ। স্তম্ভের মাথার উপরেই রয়েছে একটি সুদর্শন গড়ুড় মূর্তি। গর্ভমন্দিরে রত্নবেদীর উচ্চতা এবং স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত গড়ুড়দেবের উচ্চতা—একেবারে সমান। জগন্নাথদেবের চরণ দুটিই যেন গড়ুড়দেবের লক্ষ্য। খেয়াল না করলে মনে হবে স্তম্ভটির চূড়া জগন্নাথ বিগ্রহের চেয়ে অনেক উঁচুতে রয়েছে। এদের অবস্থিতির সমতা বোঝা যায় গর্ভমন্দিরে রত্নবেদীর কাছে দাঁড়িয়ে স্তম্ভের দিকে তাকালে। তৎকালীন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের নিখুঁত নির্মাণ এবং অপূর্ব কারিগরী কৌশলেই সম্ভব হয়েছে এটা।

জনশ্রুতি আছে, একদা ভক্তিবিহ্বল চিত্তে প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উন্মাদের মতো ছুটে যান গর্ভমন্দিরে। প্রেমালিঙ্গন করেন বিগ্রহ জগন্নাথকে। এতে ক্ষুব্ধ হলেন মন্দিরের কিছু পাণ্ডা। তাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হলেন মহাপ্রভু। ভগবানের উপর অভিমান হলো ভক্তের। তারপর থেকে আর কাছে গিয়ে দর্শন করতেন না মহাপ্রভু। প্রতিদিন এসে দাঁড়াতেন গড়ুড় স্তম্ভের পিছনে। ভোগমণ্ডপের দরজার পাশের দেয়ালে হাত রাখতেন। জগন্নাথ দর্শন করতেন অপলক দৃষ্টিতে। মহাপ্রভুর প্রেমপরশে তিনটি আঙুলের ছাপ পড়লো পাথরের দেয়ালে। প্রায় পাঁচশো বছরের সেই স্মৃতি আজও বর্তমান। স্থানটিতে হাত রাখলে ভক্তমনে এখনও অনুভূত হয় মহাপ্রভুর হাতের স্পর্শ। এখানেই—মহাপ্রভুর চরণদুটি রাখা স্থানের পাথরও হলো বিগলিত। ধরে রাখলো তাঁর চরণচিহ্ন।

বরেণ্য-সাধক শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী মহারাজ। নীলাচলধামে অবস্থানকালে অসংখ্য মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে। প্রভাবও বেড়ে চলে কৃষ্ণপ্রেমের কাঙাল ভক্ত চরণদাসের। তিনি দেখলেন, মহাপ্রভুর পদচিহ্ন আঁকা শিলাখণ্ডটি। পড়ে আছে শত শত বছর ধরে। এটি শুধু বৈষ্ণব সমাজেরই নয়—অগণিত ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু। ঐতিহাসিক স্মারকও বটে।

বৈষ্ণব সাধক চরণদাস নিয়মিত আসেন মন্দিরে। চরণচিহ্নকে ঘিরে করেন নৃত্য ও কীর্ত্তন। অসংখ্য তীর্থযাত্রীরও সমাগম হয় প্রতিদিন। কিন্তু পদচিহ্নের কোন পবিত্রতাই রক্ষা হয় না। এটির উপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যান অনেকেই। দিনের পর দিন পদদলিত হতে থাকে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম। হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে চরণদাসের। শিলাটির মর্যাদা রক্ষার কথা অনুভব করলেন তিনি। সমস্ত বিষয়টি জানালেন পুরীর রাজাকে। অনুগ্রহ করলেন রাজা। পাদপদ্মচিহ্নিত

পাথরখানি তুলে সাড়ম্বরে স্থাপন করলেন ছোট্ট একটি মন্দিরে। জগন্নাথ মন্দির চত্বরের উত্তরদ্বারে। আজও সে মন্দিরটি 'মহাপ্রভুর পাদপদ্ম মন্দির' নামে প্রসিদ্ধ। অবাধে এটি দর্শন ও স্পর্শ করে থাকেন তীর্থযাত্রীরা। পাথরও ধন্য হয়েছে মহাপ্রভুর চরণচিহ্নকে বুকে ধরে রেখে।

অনেকগুলি সুদর্শন মূর্তি আছে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে। সবই ক্লোরাইট পাথরের। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে ভিত্তি করেই নির্মিত হয়েছে এগুলি। যেমন, গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের নৌকাবিহার, দোলপূর্ণিমা উৎসব, কৃষ্ণের বাঁশী শুনছে বাছুরেরা—এমন অনেক মূর্তি।

একটা নিজস্ব গঠন বৈচিত্র্য আছে উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে—যা অন্য কোথাও নেই। সর্বত্রই মন্দিরের ধাঁচ একই রকমের। যেমন, সম্পূর্ণ আলাদা গঠনশৈলী দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলির। নেপালে বুদ্ধ মন্দিরগুলি প্যাগোডা ধাঁচের।

জগন্নাথ মন্দিরটি আকাশচুম্বী। এর চক্রশোভিত চূড়াটি দেখা যায় বহুদূর থেকে। শত শত বছর ধরে চূড়াটি যেন আহ্বান করে চলেছে সারা ভারতের তথা পৃথিবীর অগণিত তীর্থযাত্রী—পর্যটকদের।

এই মন্দিরের বাইরে—দেয়ালে খোদিত আছে অসংখ্য কারুকার্যখচিত দেবদেবী আর নরনারীর মৈথুনরত মূর্তি। জানা যায়, সমগ্র মন্দিরের ভিতর ও বাইরে এমন মূর্তি আছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার। প্রতিটির শিল্পকলার অনুপম মাধুর্যে মনের উত্তরণ ঘটে যায় সহজেই।

মন্দির চত্বরে সত্যনারায়ণ, কুতামচণ্ডী আর সর্বমঙ্গলার মন্দির তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয়। এই মন্দিরগুলি ছেড়ে একটু এগোলেই পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির। কথিত আছে, পঞ্চপাণ্ডব কখনও শ্রীক্ষেত্রে আসেননি। কিন্তু রাজ্য হারিয়ে নির্বাসনে থাকাকালীন তাঁরা স্তুতি করেন প্রভু জগন্নাথের। সমস্ত বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করাই ছিল উদ্দেশ্য; তাঁদের কল্পনা থেকে উদ্ভূত পাঁচটি শিবলিঙ্গ এখানে উপবিষ্ট হয়েছিল। সেইজন্য এটি 'পঞ্চপাণ্ডব বা পঞ্চলিঙ্গ' নামে খ্যাত।

পুরীর মন্দিরটি রক্ষা করেন ক্ষেত্রপাল শিব। শ্রীক্ষেত্রের রক্ষকও তিনি। মন্দিরে ক্ষেত্রপাল স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছেন শিবলিঙ্গরূপে। এই শিবলিঙ্গের আরও একটি নাম—ক্ষেত্রপাল ভৈরব।

এ-গুলি সব জগন্নাথ মন্দির চত্বরেই। ঘুরে ঘুরে দেখা যায়। দূরত্ব কোনটারই বেশী নয়। একটা মন্দির ছেড়ে আর একটা—মাত্র কয়েক পা এগোলেই। সবই প্রায় পাশাপাশি। মূল মন্দিরকে বেষ্টন করে আছে অন্য মন্দিরগুলি।

জগন্নাথ মন্দির চত্বর ধরে কিছুটা এগোলেই—রোহিণীকুণ্ড। মন্দিরের ঠিক পিছন দিকটায়। প্রাচীনকালের বিশাল কুণ্ডটি এখন আর নেই। কালক্রমে সেটি ভরাট হয়ে যায় বালিতে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্রে আসার অনেক আগেই। পরবর্তী-কালে জগন্নাথদেবের আদেশ পেলেন উড়িষ্যার রাজা। স্থান নির্ণয় করে স্থাপন করলেন কুণ্ড। পুরীতে পঞ্চতীর্থের মধ্যে রোহিণীকুণ্ড একটি।

বর্তমানের কুণ্ডটির আকৃতি একেবারেই ছোট। জলপূর্ণ কুণ্ডের ভিতরে পাথরের উপর খোদিত আছে একটি সুদর্শন চক্র আর ভূষণ্ডি কাকের মূর্তি।
কিংবদন্তী আছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর আনতে গেলেন ব্রহ্মাকে। ইতিমধ্যে গাল নামে এক রাজা দখল করলেন মন্দিরটি। নীলমাধবকে করলের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মাকে নিয়ে ফিরে এলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। গাল রাজার সঙ্গে বাধলো সংঘর্ষ। কাক এবং কচ্ছপ সাক্ষী দিলেন ব্রহ্মার কাছে—মন্দিরটি গাল নয়, প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই।
এই ঘটনার পর কচ্ছপ চলে যায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে। কাক মুক্তিলাভ করলো রোহিণী কুণ্ডের জল পান করে। এই কুণ্ডের জল দিয়েই প্রতিদিন পূজা করা হয় নীলমাধবের। এখানকার পবিত্র জল স্পর্শ এবং মাথায় দেন তীর্থযাত্রীরা।
পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার আদেশে প্রতিষ্ঠা করলেন জগন্নাথ-মন্দির। এই মন্দির নির্মাণের সমস্ত দায়িত্ব দিলেন গাল রাজার হাতে। একই সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরের পাশে প্রতিষ্ঠা করেন নীলমাধবকে। বর্তমানে গাল রাজার প্রতিষ্ঠিত মাধবই নিত্য পূজিত হয়।
রোহিণী কুণ্ড ছেড়ে একটু এগোলেই দেবী বিমলার মন্দির। পুরুষোত্তম জগন্নাথক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং বিমলা। পীঠ নির্ণয় গ্রন্থে আছে,

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরাজক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরব ॥"

জগন্নাথদেবের মন্দির চত্বরে এটি একটি পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত দক্ষরাজ কন্যা সতীর দেহের একান্নখণ্ডের একটি—নাভি পড়েছিল এখানে। তাই পুরী শক্তি-পীঠও বটে। সতী এখানে দেবী বিমলা এবং ভৈরব জগন্নাথ নামে প্রসিদ্ধ।
প্রবাদ আছে, জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের পর বহুকাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি জগন্নাথ বিগ্রহ। এই সময়ে দেবী এসে অবস্থান করেন মন্দিরে। পরে জগন্নাথদেব এসে দেখেন মহামায়া বিমলা অধিকার করে বসে আছেন মন্দির। কি আর করেন জগন্নাথ! অনুমতি চাইলেন মন্দিরে প্রবেশের। দেবী অনুমতি দিলেন একটি শর্তে। প্রত্যেকটি পূজার নৈবেদ্য বলভদ্র এবং জগন্নাথকে নিবেদন করার পর অর্পণ করতে হবে বিমলাকে। রাজী হলেন প্রভু জগন্নাথ। মন্দির ছাড়লেন দেবী। আজও নৈবেদ্য ওইভাবে নিবেদন করার পর দেবী বিমলাকে অর্পণ করা হয়ে থাকে।
এখানে দেবীর পূজা করা হয় তন্ত্রমতে। দেবী বিগ্রহের রূপ কালিকারই। নিকষ কালো পাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি। প্রতিবছর মহাষ্টমীতে পাঁঠা বলি দেয়া হয় এখানে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে জগন্নাথ মন্দির চত্বরে।
বিমলা মন্দিরের পাশেই মহালক্ষ্মীর মন্দির। এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন লক্ষ্মী-নরসিংহের বিগ্রহ। লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিটি বড় আকর্ষণীয়। অপূর্ব এক মাধুর্য ফুটে উঠেছে দেবীর মুখমণ্ডলে। এখানে বিগ্রহ দর্শনের পর একটু বসতে হয়

নাটমন্দিরে—ক্ষণিকের জন্য হলেও। এটাই এই মন্দিরের প্রথা। এতে লক্ষ্মীর কৃপালাভ হয়।

জনশ্রুতি আছে, একদা এই বিগ্রহটি পূজা করেছিলেন আচার্য শংকর। পুরীতে অবস্থানকালে আচার্য কিছুকাল তপস্যারত ছিলেন এখানে। মন্দিরে লক্ষ্মী বিগ্রহের নীচেই রয়েছে তাঁর প্রতিকৃতি।

মহালক্ষ্মীর মন্দিরটি নির্মাণ করেন চোড়গঙ্গদেব। এটি নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দী মতান্তরে দ্বাদশ শতাব্দীতে। অনেকের মতে, এটি জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের সময়েই নির্মিত হয়েছে। তখনও চোড়গঙ্গদেব সিংহাসনে আরোহণ করেননি। তাই জগন্নাথ এবং মহালক্ষ্মী মন্দির সম-সাময়িক বলে উভয় মন্দিরের কারুকার্য আর স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব সাদৃশ্য। আবার কারও মতে, অনঙ্গ ভীম দেবের সময়কালেই নির্মিত হয়েছে দেবী বিমলা এবং মহালক্ষ্মী মন্দির।

যজ্ঞনৃসিংহ মন্দির—কল্পবট আর বিমলা মন্দিরের মাঝামাঝি জায়গায়। জগন্নাথ-মন্দির নির্মাণের আগেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ কোন মন্দির স্থাপন বা বৃহৎ কর্মযজ্ঞাদি শুরু করার আগে যজ্ঞনৃসিংহের উপাসনা করাই বিধি।

এখান থেকে একটু এগোলেই যোগেশ্বর মন্দির। শৈব ও বৈষ্ণবের সমন্বয়েই এই মন্দির। যোগেশ্বর শিবের পূজা হয় এই মন্দিরে। পূজা পেয়ে থাকেন শ্রীকৃষ্ণ পরিবারের আর সকলে।

সাক্ষীগোপাল মন্দির এই জগন্নাথ-মন্দির প্রাঙ্গণেই। জনশ্রুতি আছে, উড়িষ্যার রাজা ছিলেন পুরুষোত্তম দেব। একদা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ হয় কাঞ্চীরাজের। জগন্নাথ-দেবের কৃপায় জয়লাভ করলেন রাজা পুরুষোত্তম। ফিরে এলেন বিজয়ী রাজা। সঙ্গে নিয়ে এলেন কাঞ্চী থেকে সাক্ষীগোপাল বিগ্রহ। স্থাপন করলেন এই মন্দিরে। পরবর্তীকালে স্থানান্তরিত করা হয় বিগ্রহটি। পুরী থেকে ১১ কি. মি. দূরে। দেবতার নামানুসারে স্থানেরও নাম হয়েছে সাক্ষীগোপাল। বর্তমান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে সাক্ষীগোপালের প্রতিনিধি মূর্তি।

রাজা পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চী থেকে শুধু গোপালকেই নয়—বলপূর্বক সঙ্গে এনেছিলেন কাঞ্চীর রাজকুমারী পদ্মাবতী এবং তাঁর ইষ্টদেব গণেশকে। জগন্নাথ মন্দিরের পিছন দিকে এই গণেশ আজও প্রতিষ্ঠিত আছে 'কাঞ্চীগণেশ' নামে। এর আরও একটি নাম—কামদ গণেশ। বিগ্রহটি দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যকলা অনুসারেই নির্মিত।

মন্দির চত্বরেই পরপর প্রতিষ্ঠিত আছে পঞ্চশক্তি মন্দির, যন্ত্রকালিকা মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, রামচন্দ্র মন্দির, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির, নবগ্রহ এবং সূর্যদেবের মন্দির। তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীদের কাছে ততবেশী আকর্ষণীয় নয় এই মন্দিরগুলি। তবুও একবার চোখের দেখা দেখে নেয়া যায়।

পাতালেশ্বর শিব মন্দিরটি অপূর্ব। অনঙ্গ ভীমদেবই এর প্রতিষ্ঠাতা। উড়িষ্যার অধিকাংশ রাজন্যবর্গের শিলালিপি আছে এখানে।

মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত—চৈতন্য মন্দির। সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে এসে যেখানে বসে প্রথম কীর্তন করেছিলেন মহাপ্রভু—সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মন্দিরটি। স্থানটি আজও তাঁর পুণ্য-স্মৃতি বহন করে চলেছে এই জগন্নাথ মন্দির চত্বরে। রাজা প্রতাপরুদ্রদেবও এখানে এসে সৎসঙ্গ করতেন প্রতিদিন।

ভোগমণ্ডপ মন্দির। দুর্গা আর মাধববিগ্রহ আছে মন্দিরে। এটি নির্মিত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। নির্মাণ করেন রাজা পুরুষোত্তম দেব। জনশ্রুতি আছে, এই ক্ষেত্রটিতে বসে জগন্নাথদেবের উপাসনা করতেন আচার্য শংকর।

শিখরনিশা মন্দির, মদনমোহন মন্দির, মাজ্জর্না মণ্ডপ, জয়বিজয়দ্বার, নাভিকাটা মণ্ডপ ছাড়াও আছে দেবসভা মণ্ডপ।

দেবসভা মণ্ডপটি নির্মিত হয়েছে এক অদ্ভুত কারণে। জগন্নাথদেবের কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তার সমাধান প্রয়োজন। দেবতা এবং ঋষিরা আসেন সেই উদ্দেশ্যে। সমবেত হয়ে বসেন এই মণ্ডপে। বিচার ও আলোচনা করে থাকেন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে। ভাবতে অবাক লাগে—ভক্ত কত বিচিত্র কল্পনা করে থাকে ভগবানকে নিয়ে।

মন্দির-অঙ্গনের মুখশালায় জগন্নাথদেবের রত্ন বস্ত্র ও পুষ্প ভাণ্ডার। এখানে অবস্থান করছেন লোকেশ্বর। জগন্নাথদেবের ভাণ্ডার রক্ষক তিনি।

পাশেই দেবী শীতলার মন্দির। এই দেবীর মন্দির ভারতের সর্বত্র—নেপালেও। একটি কূপ আছে মন্দিরের সামনে। এই কূপের জল পাহারা দেন স্বয়ং দেবী শীতলা। এখানকার জল দিয়েই স্নান করানো হয় জগন্নাথদেবকে—প্রতি বছরে একদিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। যেখানে স্নান করানো হয়, সেটির নাম দেবস্নান মণ্ডপ।

মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে রয়েছে মহাবীর—হনুমান মূর্তি। কানপাতা হনুমান নামে প্রসিদ্ধ। ঘাড় কাত করে কানে হাত দিয়ে দাঁড়ানো মূর্তি। সমুদ্র গর্জনের শব্দ আসছে কিনা—এমন একটা ভাব নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে হনুমান।

রোহিণী কুণ্ডের বিপরীতে—জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের গায়ে রয়েছে খুব ছোট্ট একটি মন্দির। এটি দেবী একাদশীর মন্দির। জগন্নাথদেবের প্রসাদের মাহাত্ম্য এত বেশী যে, শ্রীক্ষেত্রে একাদশী পালন করতে হয় না বিধবাদের। অন্নভোগ গ্রহণ করা চলে। প্রবাদ আছে, জগন্নাথদেব পুরীধামে বেঁধে রেখেছেন দেবী একাদশীকে।

মূল মন্দিরের পূর্বদ্বারের পাশেই—আনন্দবাজার। জগন্নাথ মন্দিরে নিবেদিত ভোগের প্রসাদ বিক্রি হয় এখানে। তীর্থযাত্রীরা প্রসাদ কিনে থাকেন এখান থেকেই। দুপুরে খাওয়ার প্রসাদ এবং বাড়ীতে আনার প্রসাদ। ডাল ভাত তরকারী শুক্তো পোলাও মালপোয়া থেকে খাজা পর্যন্ত। আরও অসংখ্য রকমের প্রসাদ। প্রসাদের শেষ নেই—শেষ নেই নামেরও।

জগন্নাথদেবের ভোগ রান্নার ঘরটি দেখার মতো। বিশাল ব্যাপার। এত বড় কাণ্ড কারখানা আর কোথাও আছে কিনা—জানা নেই। জগন্নাথদেবের কোনটাই ছোট নয়। সব ব্যাপারটাই বড় বড় ব্যাপার। মন্দির বড়, বিগ্রহ বড়। ভোগের আয়োজনও বড। জগতের ত্রাণকর্তার রান্না ঘরটিও বড়। আকর্ষণীয় বটে।

এখানে উনুনের সংখ্যা মোট ৭৫২টি। প্রতিদিন জগন্নাথদেবের ভোগ রান্না করে থাকেন ৩০০ জন পুরুষ। রান্না করা হয় ৫৬ প্রকার ভোগ। সাধারণভাবে প্রতিদিন ভোগ রান্না হয় কমপক্ষে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকার। বিশেষ বিশেষ তিথি উৎসবের কথা তো আলাদা।

কথিত আছে, রান্না-সেবাকর্মে নিযুক্ত যারা—তাদের মধ্যে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী আবির্ভূতা হন। বিশাল এই রন্ধনযজ্ঞের কাজ সমাধা করেন তিনিই। এই ভোগ রান্নার ঘরটি অত্যন্ত সুরক্ষিত। কোন যাত্রী বা দর্শনার্থীকেই ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। দেখতে হয় বাইরে থেকে। ছোট ছোট খোপ করা আছে রান্নাঘরের দেয়ালে। তার মধ্যে চোখ রাখলে ভিতরের সব কিছুই দেখা যায়। রান্নার পদ্ধতিটাও সুন্দর। একটা উনুনে হাঁড়ির উপরে হাঁড়ি—নীচে কাঠ জ্বালিয়ে এক আগুনে অনেক রান্না করা হয়। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না—কি বিশাল ব্যাপার চলছে প্রতিদিন—এই জগন্নাথধামে।

একটি বড় বটগাছ আছে মন্দির চত্বরে। ঘোরার সময়েই চোখে পড়বে। জগন্নাথ মন্দিরের পিছন দিকে। কল্পবট বা কল্পতরু নামেই এর প্রসিদ্ধি। প্রবাদ আছে, ঋষি মার্কেণ্ডেয়কে জগন্নাথদেব দর্শন দিয়েছিলেন এখানে—বালকবেশী কৃষ্ণরূপে।

মানুষের জন্য শ্মশান আছে কিন্তু ভগবানেরও যে আছে—এ-কথা কেউ ভাবতেই পারবে না—পুরীতে না এলে। এখানকার অধিকাংশ ব্যাপারটাই বৈচিত্র্যে ভরা। মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণে—একপাশেই রয়েছে জগন্নাথদেবের শ্মশান। সাজানো বাগানের মধ্যে। নব-কলেবর অনুষ্ঠানে নতুন করে নির্মিত হয় জগন্নাথ বিগ্রহ। তখন পুরনো বিগ্রহকে সমাধি দেয়া হয় এই শ্মশানে। তাই নাম হয়েছে জগন্নাথদেবের শ্মশান। অনেক দর্শনার্থীই এর খবর রাখেন না। এখানে দেখার মতো কিছুই নেই, তাই বলে এটা কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়।

গেলাম আর এলাম—এই করলে দেখা হবে না কিছুই। জগন্নাথদেবের মন্দির এবং প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত আর সব মন্দিরগুলি দেখতে সময় লাগে যথেষ্ট। তাও কমপক্ষে দু-থেকে আড়াই ঘণ্টা। সন্ধ্যা বা রাত্রে অসুবিধা হবে দেখতে। অসুবিধা হবে ভর দুপুরেও। রোদে তেতে ওঠে মন্দিরের বাঁধানো চত্বর। পা রাখা যায় না। সকালে জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছিলাম। কষ্ট তো হয়ইনি—দেখাও হয়েছে সুন্দরভাবে, সবকিছু।

সাধুসঙ্গ—কাম দমনের কৃত্রিম উপায়

আজ থেকে বছর কুড়ি আগের কথা। বেলা তখন দুপুর। আসছি পুরীর মন্দিরের ওদিক থেকে। খাব বলে যাচ্ছি হোটেলে। দেখি, কালো নয়—ধূসর বর্ণের একটা কম্বল গায়ে এক সাধুবাবা। আসছেন ধীর পদক্ষেপে। মাথায় জটা। ঝুটি করে বাঁধা। হাতে মাত্র একটা চিমটে। কাঁধে কোন বোঝা নেই। একটা লোটা পর্যন্ত নয়। মনে হয় যেন সংসারের কোন বোঝা না বইবার জন্যই এসেছে সংসারে। গায়ের রঙ বেশ ময়লা। তার উপর ছাই মেখে একেবারে ভূত হয়ে আছে। বয়েসটা এই মুহূর্তে অনুমান করতে পারলাম না। ছিপছিপে চেহারা। বোগাও বলা যায়। সারা দেহে কঠোর তপস্যার ছাপ একটা আছে। প্রথম দর্শনে এটাই মনে হলো আমার। আর মনে হলো—অনাহার খুব বেশী।

দুপুরের রোদ খাঁ খাঁ করছে। এই গরমেও সাধুবাবার গায়ে একটা কম্বল জড়ানো। অবাক হলাম। কাছাকাছি হতেই সামনে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে পড়লেন সাধুবাবাও। প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই হাত দুটো কপালে না ঠেকিয়ে সোজা তুললেন উপর দিকে। কারফিউ জারীর পর কোন পথচারী রাস্তায় বেরিয়ে যেভাবে হাত তোলে—ঠিক তেমন। শূন্যে তাকালেন। বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। তারপর নামালেন হাতদুটো। এতে সময় কাটলো প্রায় মিনিট দেড়েক।

এত গরমে—এই সময় বুঝলাম কম্বল গায়ে দেয়ার রহস্য। সাধুবাবার গায়ে দ্বিতীয় কোন বস্ত্র নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। হাত দুটো উপরে তোলার সময়েই তা দেখলাম। কম্বলে হাঁটুর একটু উপর পর্যন্তই ঢাকা। সুদর্শন নয়—তবে মুখশ্রীটা খারাপও নয়। সাধু-সন্ন্যাসীদের দেখতে যেমনই হোক না কেন—গেরুয়া বসন অথবা ছাইমাখা দেহটাই যেন একটা আলাদা আকর্ষণ। আলাদা সৌন্দর্যেরও সৃষ্টি করে। এই সাধুবাবা আলগা সুন্দর। অনেক মেয়েকে খুঁটিয়ে দেখলে ভালো লাগে না। ভালো লাগে পলকে। আলগা-শ্রী। ঠিক তেমন এই সাধুবাবাও। দাঁড়িয়ে রইলেন। কথা বললেন না একটাও। দাঁড়িয়ে আছি মুখোমুখি। রাস্তার ধারে। লোক চলাচল করছে। দুপুর বলে একটু কম। দুজনের মাথার উপর রোদ। কাছেই বড় একটা অশ্বত্থ গাছ। নীচে একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে জিভ বার করে। গাছটা দেখিয়ে বললাম,

—চলুন বাবা, ওখানে—গাছের ছায়াতে একটু দাঁড়াই।

বলেই একটু এগিয়ে গেলাম। সঙ্গে সাধুবাবাও। এখানেও দাঁড়ালাম মুখোমুখি হয়ে। খাওয়ার কথা মনে থাকলেও এড়াতে পারলাম না সাধুবাবাকে। তিনি

কিন্তু এখনও মৌন। কথা বললেন না। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু ?
তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। কয়েক মিনিট। কি যেন একটা ভাবলেন। মনে হলো তিনি যেন ভাবলেন—আমি ব্যক্তিটা কে—উদ্দেশ্যটা কি—কেন জানতে চাইছি ইত্যাদি। কথার কোন উত্তর দিলেন না। বুঝলাম, নিজের বিষয়টা খোলাখুলি না বললে উত্তর পাওয়া যাবে না। তাই বললাম,
—থাকি কলকাতায়। বেড়াতে এসেছি এখানে। আপনাকে দেখে আমার ভালো লাগলো—তাই দাঁড়ালাম। দয়া করে যদি দু-চারটে কথা বলেন—তাহলে খুব খুশী হবো।
এবার সাধুবাবা আর কোন দ্বিধা না করেই বললেন,
—আমি বৈষ্ণব নাগা।
সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাড়ী কোথায় ছিল আপনার ?
কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব নিয়েই বললেন,
—কিঁউ ?
বলেই চলে যাওয়ার জন্য যেই পা বাড়িয়েছেন, ওমনি পা-দুটো ধরে ফেললাম। দিনের বেলা। খোলা রাস্তার ধারে। কে দেখছে, না দেখছে—কোন ভ্রুক্ষেপই করলাম না। আর এগোতে পারলেন না সাধুবাবা। দাঁড়িয়ে গেলেন। বুঝলাম, কাজ হবে। কথাও হবে। বললাম,
—আপকা গোড় লাগে বাবা ! অপরাধ নেবেন না। কোন অসৎ উদ্দেশ্য আমার নেই। আপনাদের মতো যাঁরা—তাঁদের জীবন কথা জানতে ইচ্ছে করে—সেইজন্যেই জিজ্ঞাসা করেছি।
এ-কথায় মনে হলো একটু দমে গেলেন সাধুবাবা। তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। সাধুসঙ্গের সম্বল আমার বিড়ি। দিতে গেলাম। বললেন,
—আমার গাঁজা চলে, বিড়ি নয়।
বিড়িটা রেখে দিলাম। নিজেও ধরালাম না। আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম,
—আপনার বাড়ী ছিল কোথায় ?
গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,
—মজঃফরপুর, বিহার মে।
—আভি আপকা উমর কিতনা ?
ভুরু কুচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন,
—কত আর—৫০/৫৫ হবে।
অধিকাংশ সাধু-সন্ন্যাসীদেরই দেখেছি, সহজে কথা বলতে চান না। একবার শুরু করিয়ে দিতে পারলে তখন কোন অসুবিধেই হয় না। চলতে থাকে। তাই জিজ্ঞাসা করলাম এবার,

—ঘর ছেড়েছেন কত বছর বয়সে ?
এ-কথায় উত্তর দিলেন দেরী না করেই,
—বয়েস তখন বছর দশেক হবে।
এবার ঘর ছাড়ার কারণ জানতে চাইলে বললেন,
—মজঃফরপুরে, বলতে পারিস্ এক জমিদারেরই ছেলে আমি। কোন অসুবিধেই ছিল না আমার। 'আপনি খুশী সে ঘর ছোড় দিয়া।'
জিজ্ঞাসা করলাম,
—সে তো বুঝলাম বাবা। কিন্তু মা, বাবা, ভাই, বোন—তাঁদের কথা একবারও ভাবলেন না ?
কথাটা শেষ হতেই বললেন,
—মায়া অউর জঞ্জালকে ফের মে সাধু নেহি রহতা হ্যায়।
অবাকই হলাম কথাটা শুনে। মনে হলো, বাধাগতেই কথাটা বললেন। সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,
— এ-কথাও বুঝলাম বাবা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গৃহত্যাগ করেছেন দশ বছর বয়সে। ওইটুকু বয়েসে সংসার জীবন 'মায়া' এবং 'জঞ্জাল'—এ-সব কথা ঢুকলো কি করে আপনার মাথায় ? ও-তো অনেক বড় বড় কথা। তখন ও-সবের বুঝেছিলেন কি ?
এতটুকু দেরী না করেই উত্তর দিলেন,
—পরমাত্মার করুণাতেই ওই বয়েসে বুঝেছিলাম সংসাব জীবন মানেই মায়ার বন্ধন। দুঃখ-কষ্ট, শোক-বেদনা, লোভ-হিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই সংসারে। সুখ যেটুকু—তা তাৎক্ষণিক। আর 'শান্তি'—কথাটা অ্যছে—সংসারে নেই। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম।
কথাটা ঠিক মনে ধরলো না। তাই আবার প্রশ্ন করলাম একটু ঘুরিয়ে,
—অতটুকু বয়সে ওইসব কঠিন কথা মাথায় ঢোকা তো একটা বিস্ময়ের ব্যাপার—আপনার কি মনে হয় ?
কথা বলছি দুজনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে। বসার কোন উপায়ই নেই। ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ। কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছেও হলো না। তাহলে সাধুবাবা হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমার প্রশ্নে এবার সাধুবাবা একটু হাসলেন। প্রসন্ন হাসি মানেই—ভরসা। বললেন,
—বেটা, পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া কি ওই বয়েসে এ-সব কথা কারও মাথায় ঢোকে ? নইলে এ-পথে এলাম কেন ? তোর মতো সংসারে আর যারা—তারাই বা আসছে না কেন ? তাদের মাথায়ই বা এ-সব কথা ঢুকছে না কেন ? ঢুকলেও তারা বেরোতে পারছে না কেন ? চেষ্টা—সেটুকুই বা করতে পারছে না কেন ? আমিই বা বিনা চেষ্টাতে এ-জীবনে এলাম কেন ? কেউ তো ডাকেনি আমাকে। সংসারের কেউ তো বলেনি—যা, সাধু হয়ে যা। আসলে সংস্কারই আমাকে সংসার থেকে টেনে এনেছে এ-পথে। যে—যে-পথে চলেছে—জানবি, তার সংস্কারই তাকে সেই

পথে নিয়ে চলেছে।

জন্মান্তরবাদ, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়টা দাঁড়িয়ে আছে অনেকের কাছে বিশ্বাসের উপর। আবার এ-সব বিশ্বাসই করে না অনেকে। সাধুসঙ্গের সময় কোন সাধু-সন্ন্যাসী এই বিষয়টা টেনে এনে পাল্টা প্রশ্ন করলে কিছুই বলার থাকে না আমার। সাধুবাবার পাল্টা প্রশ্নে কিছুই বলার রইলো না। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

সাধুজীবনে, সাধুদের এই বেশ এবং পথকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করে অনেকেই। কারণ গৃহীদের অনেকেই এই জীবনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। নিজে দেখেছি—শুনেছিও। আপনার জীবনে কি কখনও এমন ঘটনা ঘটেছে—যারা আপনাকে অবজ্ঞা করেছে—গালাগাল দিয়েছে?

সাধুবাবার মুখমণ্ডলটা কেমন যেন হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললেন,

—বেটা, চলার পথে সাধুদের প্রথম প্রাপ্তি তো এটাই। অনেকেই বলে 'পেটকে লিয়ে বৈরাগ'—'খাট্‌কে খাও'—'ফোকট মে খানা না মিলি'—এমন কথা আমার মতো শুনতে হয় অনেক সাধুকেই। তবে 'ভিখ মাঙা' সাধু তো আমি নই। তাই সামনাসামনি কেউ কিছু বলেনি আমাকে। পথ চলতে গেলে এ-সব কথা অবশ্য শুনতেই হবে। এই দেখ্‌না, আজ নিয়ে অভুক্ত আছি পাঁচদিন। জল ছাড়া খাইনি কিছুই। কত লোক যাচ্ছে পথ দিয়ে—কত দোকান আছে এখানে—কিন্তু হাত পাতিনি কারও কাছে। সুতরাং গাল দেবে কাকে?

পাঁচদিন অনাহারে রয়েছেন এই সাধুবাবা! বিস্মিত হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। মনটা একেবারে মুষড়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বললেন তিনি,

—তুই ভাবিস্‌ না—এ-সব কথা বলে তোর কাছে পরোক্ষে খেতে চাইছি। এখন তুই কিছু দিলেও তা গ্রহণ করবো না আমি।

এ-কথার পর আপাতত বলার বা করার কিছু রইলো না আমার। বিমর্ষ মনেই বললাম,

—পাঁচদিন হলো অনাহারে আছেন—ক্ষিদে পায় না আপনার?

সুন্দর হাসি ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখে। অনাহারক্লিষ্ট মুখেও হাসি—ভাবতেই পারছি না। বললেন,

—ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ্‌—দেখবি, তোরও ক্ষিদে পাবে না।

কথাটা শেষ হতে না হতেই বললাম,

—ঈশ্বরে বিশ্বাসটা আলাদা কথা। দেহের তো চাহিদা আছে একটা—আছে খাদ্যের প্রয়োজন।

মুখের ভাবটা একই রেখে বললেন সাধুবাবা,

—তা তো আছেই। অস্বীকার করি না। তবে খাবার না জুটলে ক্ষুধার সৃষ্টি করেন না তিনি। কখনও তিনি কিছু জুটিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করেন—কখনও কিছু না জুটিয়ে, ক্ষুধার উদ্রেক না ঘটিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করেন। এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি—দেহ মনে কোন বোধই নেই। কথা-প্রসঙ্গে কথাটা এলো—তাই

কথাটা বললাম।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—সামনাসামনি না হলেও, যারা অবজ্ঞা বা কটূক্তি করে—ক্রোধবশতঃ তাদের অভিশাপ দেন না কখনও ?

প্রশান্ত-চিত্তেই বললেন,

—ক্রোধ আমার নেই। আর জীবনে কখনও অভিশাপ দিয়েছি কাউকে—এমন তো মনেই পড়ে না।

কথা-প্রসঙ্গে এসে পড়লো 'অভিশাপ' কথাটা। তাই এ-বিষয়ে হঠাৎ প্রশ্নও এলো মাথায়। জানতে চাইলাম,

—বাবা, সংসারে দেখেছি, কোন একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় একে অভিশাপ দেয় অপরকে। এই অভিশাপ কি সত্যিই ফলপ্রসূ হয়ে অনিষ্ট হয় তার—যাকে দেয়া হয় ?

পা-দুটো একইভাবে রেখে কথা বলছেন সাধুবাবা। দাঁড়িয়ে আছি দুজনেই। কেটে গেছে অনেকটা সময়। মাঝে মাঝেই পা-দুটো আমার ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। তাই ঘোড়া যেমন তিন পায়ে দাঁড়িয়ে একটা পা-কে বিশ্রাম দেয়—আবার খানিক-বাদে পায়ের পরিবর্তন করে—তেমন একবার ডান, একবার বাঁ-পা করছি আমিও। এইভাবেই পায়ের বিশ্রাম দিচ্ছি। সে সবের কোন বালাই নেই সাধুবাবার। এবার উত্তরে বললেন,

—মানুষের যে কত শক্তি—সততার যে কি তীব্র শক্তি—তা বেটা তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আকারে মানুষ ছোট হলেও অভিশাপ বাক্যের শক্তি কাজ করে ভীষণভাবে। যেমন ধর, অভিশাপদাতার কথা। পূর্ণমাত্রায় যদি তার সততা থাকে—তাহলে নিশ্চিত জানবি, অভিশাপবাক্য তার অবশ্যই কার্যকরী শক্তিরূপে কাজ করবে। যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিশাপ—সেই ঘটনায় অভিশাপদাতার বিন্দুমাত্র সততার ঘাটতি থাকলে—অভিশাপবাক্য কখনও কার্যকরী হবে না। বরং ক্রোধ বা দুঃখবশতঃ সে যে অভিশাপ দেবে—বাক ব্রহ্ম, তা মিথ্যে হতে পারে না—ফলে ওই অভিশাপবাক্য কার্যকরী না হয়ে—পরে ঘুরে এসে অভিশাপদাতাকে আশ্রয় করে তারই ক্ষতিসাধন করে। কোন ভুল নেই এর মধ্যে।

কথা হচ্ছে রাস্তার ধারে। গাছের তলায়। লক্ষ্য করছি, কিছু কিছু পথচারী আমাদের দেখতে দেখতেই চলে যাচ্ছে। সাধুবাবা বলে চলেছেন,

—এ-যুগটা পাপের যুগ। তাই সংসারে পূর্ণ সততা নিয়ে কেউই নেই—থাকতেও পারে না। এমনকি সাধুরাও। ফলে অভিশাপবাক্য প্রায়ই কার্যকরী হয় না। অভিশাপদাতা নিজেই কুফল ভোগ করে অভিশাপ দিয়ে। তাই কার্যকারণে যতই মানসিক কষ্টের সৃষ্টি হোক না কেন—অভিশাপ দিতে নেই কখনও। ফল ভুগতে হবে নিজেকেই। কারণ সততার অভাব কমবেশী সকলের মধ্যেই রয়েছে। বাক্যের শক্তি নষ্ট হয় না কখনও। কোন ঘটনায় অভিশাপদাতা যদি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ

থাকে—তবে তার সততা থেকে উৎপন্ন শক্তি কার্যকরী করে অভিশাপ বাক্যকে।
জিজ্ঞাসা করলাম,
—মায়ের অভিশাপবাক্য কি কার্যকরী হয়—মা বলে কথা!
একেবারে নির্লিপ্তভাবেই বললেন,
—বিষয়মূলক মা অনেকটা বেশ্যা সমতুল্য। সর্বদা বিষয় চিন্তায় আচ্ছন্ন মায়ের অভিশাপবাক্য কখনও কার্যকরী হয় না। আর কখনই ফলপ্রসূ হয় না বিষয়মূলক এবং স্বার্থজড়িত সম্পর্কের অভিশাপ। এ-সব ক্ষেত্রে অভিশাপদাতা অভিশাপ দিয়ে নিজেই কষ্ট ভোগ করে—তিনদিন, তিনমাস নইলে তিন বছরের মধ্যে।
এবার সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,
—বাবা, সুন্দরী কুমারী যুবতী কিংবা বউকে দেখলে সব বয়সের পুরুষের ভালো লাগে। সুদর্শন ছেলে দেখলে একই প্রতিক্রিয়া হয় মেয়েদেরও। পরিচিত বা অপরিচিত—যাই হোক না কেন। একবার দেখলে, দূরত্ব বেশী না থাকলে—চোখটা ঘুরে গিয়ে আবার তার উপরেই পড়ে। আপনি সাধু কিন্তু পুরুষ তো। তাই আপনার কি কখনও এমন হয়?
এই জাতীয় প্রশ্নের স্পর্ধা দেখে এতটুকু বিরক্ত হলেন না সাধুবাবা। একটু অস্বস্তির ছাপ পড়লো চোখে মুখে। মুহূর্তে সে-ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন,
—তুই কি এইসব কথা বলার জন্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস এখানে?
এ-কথার কি উত্তর দেবো! মাথাটা নীচু করেই রইলাম। নিজের মনেও যে একটু অস্বস্তি হলো না—তা নয়। কোন উত্তর না পেয়ে সাধুবাবা নিজের থেকেই বললেন,
—জগতের যা কিছু সুন্দর, অসুন্দর—তা সবই তো ভগবানের সৃষ্টি। তার মধ্যে বিশেষ রূপ—ভগবানের এক বিশেষ সৃষ্টি। এই রূপের মধ্যে তাঁরই প্রকাশ। যাব জন্য আমরা কথায় বলি, মেয়েটির মুখখানা 'লছমী'র মতো। সুন্দর নারীর রূপে তাঁরই প্রকাশ—তাঁরই আকর্ষণ। এই আকর্ষণকে উপেক্ষা করার সাধ্য গৃহী তো দূরের কথা—কঠোরতপা সাধু-সন্ন্যাসীদেরও নেই। আমি তো তাঁদের বাইরে নই।
এবার জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, সাধুই হোক আর গৃহীই হোক—কামের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না কেউই। কাম-চিন্তা, নারীভোগের ইচ্ছা জাগেনি—জাগে না কখনও আপনার মনে?
প্রশ্নটা করার আগে ভেবেছিলাম, সাধুবাবা বোধ হয় অসন্তুষ্ট হবেন। দেখলাম, না—তা হলেন না। বরং হাসতে হাসতেই উত্তর দিলেন,
—না বেটা, আমার মনে ওসব ইচ্ছা জাগেনি কখনও—জাগেও না।
অস্বাভাবিক লাগলো কথাটা শুনে। মনে মনে ভাবলাম, মিথ্যা কথা বলছেন সাধুবাবা। নির্মম এই সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোরই নেই। এইটুকুই ভেবেছিমাত্র। নিজের থেকেই বললেন সাধুবাবা,

—না বেটা, সত্যকে অস্বীকার না করেই তোকে সত্যি কথাই বলেছি।

আবারও ভাবলাম, এ-তো অবাস্তব—অসম্ভব কথা। কৌতূহলী হয়ে বললাম,

—মনুষ্যদেহ ধারণ করে কাম-চিন্তা রোধ করা আপনার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হলো? স্বাভাবিকভাবেই বললেন,

—এটা আমাদের সম্প্রদায়ের একটা গোপন কথা। এ-সব কথা বলা নিষেধ।

চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। অনেক অনুরোধ করলাম। মুখ খুলছেন না কিছুতেই। আমিও ছাড়ার পাত্র নই। আমাকে জানতেই হবে। দেখলাম, শেষ অস্ত্র একটাই—পায়ে ধরা। এটাতে কাজ না হলে আর কিছু করার নেই। ঝট্ করে বসে পড়ে পা-দুটো ধরে বললাম,

—না বললে বাবা আপনার পা আমি কিছুতেই ছাড়বো না। বলতেই হবে আপনাকে।

একে রাস্তার ধারে—তাতে লোক চলাচল করছে—দিনের বেলা। আর হুট্ করে পা ধরে ফেলবো—বুঝতেই পারেননি সাধুবাবা। এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে পড়ে বললেন,

—ছাড়্ ছাড়্ বেটা, লোকে দেখলে অন্য কিছু ভাববে। পা ছেড়ে দে। ওঠ্ ওঠ্—বলছি।

উঠে দাঁড়ালাম। বেশ কয়েক মিনিট চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। আমিও দেখলাম সাধুবাবার প্রসন্ন মুখখানা। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। শুরু করলেন,

—এখন তোকে যে সব কথা বলবো—তা বলা নিষেধ আছে আমাদের সম্প্রদায়ের। এত করে ধরেছিস্—তাই বলছি। ঘর ছেড়ে যখন সাধু জীবনে এলাম তখন বয়েস আমার দশ। ভগবানের দয়ায় গুরুলাভ হলো অযোধ্যায়। কিছুদিন গুরু-সান্নিধ্যে থাকার পর দীক্ষা হলো আমার। এই দীক্ষার দিনটাই হলো জীবনের এক অন্যতম স্মরণীয় দিন। দীক্ষার দিনে মন্ত্র দিয়েই 'গুরুজীনে মেরা কামকো উখাড় লিয়া'।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—ক্যায়সে বাবা?

এবার কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না সাধুবাবা যদিও পথচারীর সংখ্যা কম—ভরা দুপুর। গরমও পড়েছে বেশ। গায়ের কম্বলটা সরিয়ে নিজের ছোট্ট পুরুষাঙ্গটা ধরে বললেন,

—দীক্ষার দিন গুরুজী দুটো লোহার শিক

বলে কনিষ্ঠা আঙুল দেখিয়ে বললেন,

—এ-রকম মোটা হবে। আমার লিঙ্গের উপরে একটা আর নীচে একটা—একেবারে গোড়ায় দিয়ে—শিকের দু-মাথা ধরে, বেশ জোরে একটা চাপ দিয়েই খচ্ করে টেনে দিলেন সামনের দিকে। অসম্ভব ব্যথা লেগেছিল। জল বেরিয়ে এসেছিল চোখ দিয়ে। যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছি প্রায় মাসখানেক। ভালো করে 'পিসাব' করতে

পারতাম না। খ-ুব কষ্ট হতো। তারপর ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে গেল সব। সেইদিন থেকেই আজ পর্যন্ত লিঙ্গের উত্থান হয়নি কখনও। কামভাবও জাগেনি দেহে—মনেও আসনি চিন্তা।

বিস্মিত হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। একটু ভেবে নিয়েই বললাম,

—এ-তো বাবা কৃত্রিম উপায়ে কামকে দমন করা হলো। এক বিশেষ কায়দায় লিঙ্গের কোন নার্ভকে আপনার গুরুজী অকেজো করে দিলেন সারাজীবনের মতো। রহিত হয়ে গেল লিঙ্গের উত্থান শক্তি। আমার ধারণা—সারাজীবনের জন্য হলোও তাই। এতে না হয় বাহ্যত কাম দমন হলো—কিন্তু আপনার মন! সেখানে তো এ-সব কায়দা চলেনি। চলার পথে রমণীর রূপ যৌবন চোখে দেখলে তার প্রভাব তো পড়ে মনে। তাতে কি মনে কাম-চিন্তা আসে না? দেহকে না হয় এইভাবে ঠুঁটো করে রেখেছেন নারীভোগের বাসনা থেকে—মনকে কি তা পেরেছেন?

দেখলাম, কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনলেন সাধুবাবা। তারপর খুব সহজভাবেই হাসতে হাসতে বললেন,

—বেটা, পেটে ক্ষিদে থাকলে তো খাওয়ার চিন্তা আসবে মনে। ছোটবেলা থেকে যার ক্ষিদের অনুভবই হলো না—খাওয়ার চিন্তা তার মনে আসবে কি করে?

কথাটা শুনে মনে হলো, দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন ভোগ্যবস্তু দেখলেও তাতে ভোগের চিন্তা আসে না—যদি তা অনাস্বাদিত হয়। এটাই হয়তো সাধুবাবার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনাদের সম্প্রদায়ের সব সাধুদেরই কি এই পদ্ধতিতে কাম থেকে নিবৃত্ত করা হয়?

দ্বিধাহীন চিত্তেই সাধুবাবা বললেন,

—এই পদ্ধতি ছাড়াও আছে আরও একটি পদ্ধতি। কারও লিঙ্গে এফোঁড় ওফোঁড় করে গেঁথে দেওয়া হয় সরু লোহার শিক। ঠিক যেমন করে মেয়েদের কান বেঁধানো হয়।

এবার একটু ক্ষুণ্ণভাবেই বললাম,

—সাধন ভজনের মাধ্যমে কামকে জয় না করে, কৃত্রিম উপায়ে কামকে দমন করা—এটা আমার মনে হয় ঠিক না।

এ-কথায় সাধুবাবা একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,

—তোর ঠিক বেঠিক-এ কি আমরা চলবো? কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা নয়—তুই তার বুঝিস্‌ কি?

এবার প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আমরা সংসারী যারা—কোন না কোন সমস্যা তাদের লেগেই আছে। এমন কিছু বলুন—যাতে সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে পারি।

কথাটা শুনে একটু চিন্তা করলেন। তারপর ভাবলেশহীন মুখেই বললেন,

—দেখ্‌ বেটা, মানুষের যেমন সমস্যা আছে—তার সমাধানও আছে। যে কোন সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়ার পথটা তোকে বলি শোন॥

কোন ব্যাপারে সমস্যা মনে হলে—প্রথমেই ভাবতে হবে, প্রকৃতই কোন সমস্যায় পড়েছিস্ কি-না ? যদি পড়ে থাকিস্—তাহলে সমস্যার ধরনটা কি—কাল্পনিক, সাময়িক না মারাত্মক ? যদি প্রকৃতই কোন সমস্যা হয়—তবে নিজে প্রথমে ভাববি গভীরভাবে। তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা খুঁজতে থাকবি। সমাধানের পথ পেলে ভালো। না পেলেও ক্ষতি নেই। নিজের উপর একটু ভরসা রেখে ধৈর্য ধরে চলবি—দেখবি, ধীরে ধীরে সমাধানের পথ পেয়ে যাবি। সমস্যার জট খুলে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। কাল্পনিক সমস্যা—সমস্যায় পড়িস্‌নি অথচ মনে হচ্ছে পড়বি—এ-সব ব্যাপার একেবারেই উড়িয়ে দিবি মন থেকে। ভাববি, সমস্যা এলে তখন দেখা যাবে। নইলে কিন্তু মনের শান্তিটা নষ্ট হবে।

একটু থেমে আবার বললেন,

—সমস্যাটা সাময়িক, কল্পনাপ্রসূত কিংবা মারাত্মক—যাই হোক না কেন, তাড়াহুড়ো করবি না। তাড়াহুড়ো করে সমস্যা কখনও অতিক্রম করা যায় না। সমাধানও হয় না। একটু ধৈর্য ধরবি। তারপর কোন জ্ঞানী অথবা বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে সমস্যার বিষয় নিয়ে আলোচনা করবি। দেখবি, যত বড় সমস্যাই হোক—সমাধানের পথ একটা পাবিই পাবি। কেমন করে জানিস্ ? মনে রাখবি, 'আইডিয়া ইউনিভাসলি।' (কথাটায় সাধুবাবা হিন্দি শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। পাঠকের সুবিধার্থে এখানে 'ভাব'টা যথাযথ রাখতে ইংরাজী শব্দ লেখা হলো।) অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনন্ত 'আইডিয়া'। কারও মাথায় দুটো চারটে আসছে—কারও মাথায় আসছে অসংখ্য 'আইডিয়া'। অতএব, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যে 'আইডিয়া' তোর মাথায় আসছে না—সেটা অন্যের মাথায় আসতে পারে। তাই আলোচনা বা পরামর্শ করবি—দেখবি, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এখানেই থামলেন না সাধুবাবা,

—সামাজিক কিংবা পারিবারিক সমস্যা যাদের আছে—তারা যে কোন সদ্‌গ্রন্থ পড়বে। কাউকে দিয়ে পড়িয়েও শুনতে পারে। কাজটা করতে হবে প্রতিদিন একই সময়ে—একদিনও বাদ না দিয়ে। বেশ কিছুদিন এই নিয়মে চলতে থাকলে প্রথমেই চলে যাবে মনের অবাঞ্ছিত চঞ্চলতা। আসবে মানসিক স্থিতি। তখন সমস্যা সমাধানের পথ আপনিই খুঁজে পাবে।

বেটা, হতাশ হতে নেই। তা হলেই মানুষের পার্থিব জীবনের মৃত্যু এগিয়ে আসবে দ্রুত। একটা কথা নিশ্চিত জানবি, মহাকালের বাঁধা একটা রুটিন আছে। সেই রুটিনে প্রতিটি মানুষ সংসার জীবনে সাময়িক সুখ বা দুঃখ ভোগ করছে। এটাই নিয়ম। এ-কথা বলে গেছেন প্রাচীন ভারতের ঋষিরা। যখন খারাপ সময় চলবে—তখন ধরে নিতে হবে, এটা সাময়িক। পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। বিপরীতভাবে যখন সু-সময় চলবে—তখন ধরে নিতে হবে, পরে আবার কোন না কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতে পারে। সংসারে আছিস্, একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবি, মহাকালের এই চক্রে অতি দুঃস্থ মানুষের জীবনে হচ্ছে আমূল

পরিবর্তন। আবার উচ্চাবস্থা থেকে পতনও হচ্ছে অবিরত।

এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। কোন কথা বললাম না। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—আমার কি মনে হয় জানিস্ বেটা, আজকের অধিকাংশ মানুষেরই সঠিক কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। এটা হয়েছে জীবন আর জীবিকার সংঘাতের ফলে। তাতে সৃষ্টি হচ্ছে হাজার সমস্যা। যাদের সঠিক কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে, তাদেরও নানা সমস্যা আর ঘাত-প্রতিঘাতে হচ্ছে লক্ষ্যচ্যুতি। আরও একটা মজার কথা, মানুষ—'সে যে কি চায়'—সে নিজেই জানে না। অথচ ছুটে চলেছে বিভ্রান্তের মতো।

এবার বেশ উদ্দীপ্ত-কণ্ঠেই বললেন,

—বেটা, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গভীরভাবে অনুভব করি—কোন মানুষের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আর তীব্র মানসিক শক্তি যদি থাকে—তবে সংসারে সাফল্য তার অনিবার্য। কোন বাধা বা সমস্যা আর তার কাছে বাধা বা সমস্যাই হবে না। আত্মবিশ্বাস আর মানসিক স্থিতির অভাব হলেই মনের অপমৃত্যু ঘটে। ফলে প্রতিনিয়ত সবকিছুতেই দেখে সমস্যা। তখন মানুষ প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে চলে পার্থিব জীবনে মৃত্যুর পথে। বেটা, এ-কথা কথার কথা নয়। সামনে যত অন্ধকারই হোক, জীবন যত সমস্যা জর্জরিতই হোক না কেন—লক্ষ্য অবিচল অকম্পিত রেখে এগোলে কোন সমস্যাই মানুষকে আটকাতে পারে না—পারবেও না।

সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তরে—কোথা থেকে কোথায় চলে গেলেন সাধুবাবা। এদিকে বেলাও হলো অনেক। আমার জীবনে সাধুসঙ্গের সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা হলো এই প্রথম। পা-দুটো আমার ধরে গেছে। সাধুবাবা নির্বিকার। তাঁর ভাবে কষ্টের কোন লক্ষণই দেখলাম না। যত বড় সাধুই হোক না কেন—দেহটা যখন মানুষের—কষ্ট কি এতটুকুও হয় না! আমার ক্ষিদেও পেয়েছে অসম্ভব। এবার যেতে হবে। প্রণাম করলাম। আবার হাতদুটো তুললেন উপরে। চিমটেটা ধরাই আছে ডানহাতে। কি একটা প্রার্থনা করে নামালেন। অভুক্ত সাধুবাবা। কিছু প্রণামী দিতে গেলাম। কিছুতেই নেবেন না। আমিও ছাড়লাম না। শুধু বললাম,

—বাবা, এটা কোন দান বা সাহায্য নয়। দয়া করে গ্রহণ করুন।

সাধুবাবা একেবারেই নারাজ। নেবেন না কিছুতেই। অগত্যা জড়িয়ে ধরলাম পা-দুটো। না নিলে যে আমি শান্তি পাচ্ছি না। নিতেই হবে। সাধুবাবা চিমটেটা মাটিতে ফেলে দু-হাত দিয়ে আমার বাহু দুটো ধরে তুললেন। উঠে দাঁড়ালাম। সামান্য প্রণামীটুকু গ্রহণ করলেন। এতক্ষণে হালকা হলো মনটা। তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে—অপলক দৃষ্টিতে। চাওয়া পাওয়ার কোন বাসনা নেই এ-দৃষ্টিতে। একেবারেই নির্লিপ্ত। এবার শেষ প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, এত বছরের সাধনজীবনে ঈশ্বর সম্পর্কে কি ধারণা হলো আপনার ? ঈশ্বর মানে কি—কোথায় থাকেন তিনি—তাঁকে লাভ করা যায় কি ভাবে—তাঁর দর্শন কি পেয়েছেন আপনি ?

হাসিমাখা মুখ সাধুবাবার—অথচ উদাসীন। এবার কাছে সরে এলেন একটু। উত্তর দিলেন শেষ প্রশ্নের—শান্ত ধীর কণ্ঠে,

—ঈশ্বর মানেই অপেক্ষা—অপেক্ষার মধ্যেই ঈশ্বর—অপেক্ষায় ঈশ্বর লাভ হয়—আমি বসে আছি তাঁরই অপেক্ষায়।

স্বর্গদ্বার—সমুদ্র সৈকতে

পুরুষোত্তম জগন্নাথের সর্বোত্তমক্ষেত্র হলো এই পুরী। স্বর্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, চক্রতীর্থ এবং মার্কেণ্ডেয় সরোবর—এই পাঁচটি তীর্থের সমাহার হয়েছে এখানে। নাম হয়েছে পঞ্চতীর্থ।

পুরীতে প্রবেশদ্বারই হলো স্বর্গদ্বার—যেমন উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার। কিংবদন্তী আছে, পুরীর মন্দির নির্মাণ শেষ করলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। তারপর স্বর্গদ্বারে—সমুদ্র তীরে বসলেন কঠোর তপস্যায়। উদ্দেশ্য—ব্রহ্মাকে এনে করবেন মন্দির উদ্বোধন। রাজার তপস্যায় প্রীত হলেন ব্রহ্মা। খুশী হলেন আর সব দেবতারাও। যথা সময়ে সকলে উপস্থিত হলেন তপস্যাস্থলে। তাঁদের উপস্থিতিতে সৃষ্টি হলো স্বর্গের মতো এক অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ। পবিত্র হয়ে উঠলো ক্ষেত্রটি। অজানা অজ্ঞাতকাল থেকেই নাম হয়ে এলো এর স্বর্গদ্বার—আজও।

রূপ আছে যৌবন নেই। যৌবন আছে রূপ নেই—এমনতরটাই চোখে পড়ে বেশী। পুরীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আর সুন্দর সমুদ্র সৈকত—দুটোই আছে পুরীর। এ-দুয়ের আকর্ষণেই তো যুগ যুগ ধরে ছুটে এসেছে অগণিত পর্যটক, তীর্থকামী। আসবেও অনাগত ভবিষ্যতে। নীলাচলের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য আর আকর্ষণে একদা এসেছিলেন শংকরাচার্য, আচার্য রামানুজ, মাধবেন্দ্র-পুরী, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, মহাযোগী গম্ভীরনাথ, প্রেমিক সাধক কবীর, মহাত্মা নানক, তোতাপুরী, সন্তদাস বাবাজী, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—এমন কত শত মহাপুরুষ। ক-জনার খবরই বা জানি। তাঁদেরই পাদস্পর্শে আজও শ্রীক্ষেত্রের প্রতিটি ধূলিকণা ধন্য। ধন্য তাঁরাও—যাদের দেহে লেগেছে সেই ধূলিকণার স্পর্শ। আজ তাঁরা দেহে নেই কেউই। তবুও তাঁদের পুণ্য স্মৃতি বুকে ধরে রেখেছে পুরুষোত্তমক্ষেত্র—পুরী।

এক সময় এখানকার সমুদ্র সৈকত ছিল সত্যিই সুন্দর। আজও সে কৌলিন্য হারায়নি সৈকত। হারিয়েছে শুধু পরিচ্ছন্নতা। সেটুকু উপেক্ষা করলে সৈকত আজও আছে সৈকতে। কালে রাজা ভিখারী হলেও চলন থাকে রাজারই।

এখন বেড়ে চলেছে দোকানপাট। বেড়েছে জন-সমাগম। দার্জিলিং-এ ম্যাল, কাশ্মীরে ডাল, হরিদ্বারে যেমন হর কি পেয়ারী—পুরীতে তেমনই আকর্ষণ স্বর্গদ্বারের। জগন্নাথের চেয়েও অনেক বেশী। স্বর্গদ্বারই পুরীর প্রাণ। যে যেখানেই হোটেল হলিডে হোম কিংবা আশ্রম ধর্মশালায় থাকুক না কেন—স্বর্গদ্বারই সকলের মিলনভূমি। পরিচয় নেই অথচ বহুবারই দেখা হয় তার সঙ্গে। এ-দেখায় পরিচয় হয়। কথা হয়। হৃদ্যতা বাড়ে। মানুষ তো। মনের মানুষ হলে সম্পর্ক রয়ে যায়। নইলে পথের পরিচয়—শেষ হয়ে যায় পথেই।

কোন জাতিভেদ নেই স্বর্গদ্বারের এই সমুদ্র সৈকতে—নেই উচ্চ-নীচ বর্ণের বিচার। এ-যেন এক মহামিলনক্ষেত্র। আসলে সমুদ্রের কোন জাত নেই—জাত নেই তার জল বাতাসের। সেই জন্যেই হয়তো!

ভোরে সূর্যোদয়, বিকালে সূর্যাস্ত, সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ—অপূর্ব এক আনন্দের সৃষ্টি করে ভ্রমণপিয়াসীদের মনে। বাঁধ ভাঙা যৌবন যেন সমুদ্রের—এ-যৌবন যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাদের—যারা আসে তার তীরে।

অনেক নারীর রূপ আছে—আছে যৌবন। রূপ যৌবন আছে সাগরেরও। নারীর বয়স বাড়ে। ভাঁটা পড়ে যৌবনে—হারিয়ে যায় সৌন্দর্য। বিগত যৌবনা নারী—ফিরেও তাকায় না কেউ। বলে, শেষ হয়ে গেছে সব। সাগরের বার্ধক্য নেই। তরঙ্গযৌবন তটে ধরে রেখেছে অনন্ত কাল ধরে।

তাই তো সাগর হার মানায় সুন্দরী নারীর আকর্ষণকেও। অনুসন্ধিৎসু চোখ খুঁটিয়ে দেখে সুন্দরীর দেহ সৌন্দর্যকে। ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় রূপের আকর্ষণ—পুরুষ মনে। নারী আপাতসুন্দরী—নিখুঁত সুন্দরী নয় কেউই। তাই তো সুন্দরী মুছে যায় মন থেকে। সাগর সুন্দর। নিখুঁত সুন্দর। চিরকালের সুন্দর। চির-যৌবনে উচ্ছ্বসিত সাগরের তরঙ্গমালা। মুছে যায় না মন থেকে। পুরীতে গেছি যতবার—ততবারই পুরীকে পেয়েছি নতুনভাবে—আপন করে।

স্মৃতি হিসাবে কেনাকাটা যা—তা স্বর্গদ্বার থেকেই করে থাকেন সকলে। এখানে যাত্রীদের সেবায় আছে ভারত-সেবাশ্রম সংঘ। থাকার কোন অসুবিধে হয় না—যারা এসে ওঠেন এখানে।

কয়েকটি প্রাচীন স্মৃতিমন্দির আছে এই স্বর্গদ্বারে। পায়ে হেঁটে কয়েক মিনিট। প্রয়োজন হয় না রিক্সার। সময়ও লাগে না বেশী। ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিপরীত দিকে—যে কোন দোকানে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে নানক মঠ—গুরুদ্বার।

শিখধর্মগুরু মহাত্মা নানক নিরংকারী। একদা নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করতে করতে এসেছিলেন এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে। পরনে পিরাণ। গালে লম্বা দাড়ি। আসন পাতলেন নির্জনে—এই স্বর্গদ্বারে, সমুদ্রতীরে।

একদিন সন্ধ্যায় এলেন জগন্নাথদেবের মন্দিরে—জগন্নাথ দর্শনে। নাট-মন্দিরে প্রবেশ করেই হলেন ভাবাবিষ্ট। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেল সন্ধ্যারতি। উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছেন শ্রদ্ধাভরে। দর্শন করেছেন প্রভু জগন্নাথকে। কিন্তু সেদিকে কোন হুঁসই নেই মহাত্মা নানকের। পরমানন্দেই বসে আছেন নাটমন্দিরে। চোখ থেকে ঝরে চলেছে ঈশ্বর প্রেমের প্রেমাশ্রু।

এমন সময় নানকের দিকে চোখ পড়লো একদল পাণ্ডার। ক্রোধে ফেটে পড়লেন তাঁরা। আরতি হচ্ছে অথচ উঠে দাঁড়ায় না—জগন্নাথদেবকে অসম্মান করা—এ কেমনতর সাধু?

কেটে গেল কিছুটা সময়। শেষ হলো আরতি। পাণ্ডারা ঘিরে ধরলেন নানককে। তিরস্কার করে বললেন, 'গলায় মালা আর আলখাল্লা পরলেই কি সাধু হওয়া যায়? যারা আরতির সময় দেবতাকে সম্মান দেয় না—তারা কি কখনও সাধু হতে পারে? সাধু হতে গেলে চাই একান্ত ভক্তি আর শরণাগতি।'

মুখে হাসি ফুটে উঠলো নানকের। বললেন, বাবা, জগন্নাথ কি আমার শুধু এই মন্দিরেই বিরাজ করছেন? তিনি কি শুধু কাঠের মূর্তিতেই আবদ্ধ? এই বিশ্বসংসারে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই যে তিনি আপনভাবে—আপন মহিমায় বিরাজমান।

আর কোন কথা সরলো না মুখ থেকে। কণ্ঠস্বর রোধ হয়ে এলো মহাত্মার। ভাবতন্ময় হয়ে উঠলেন তিনি। কণ্ঠে উচ্চারিত হলো স্তবগান। মুখরিত হয়ে উঠলো জগন্নাথ মন্দির—

"গগন মৈ থালু রবি চংদু দীপক বনে
তারিকামংডল জনক মোতি।
ধূপু মলআনলো পবন চরবো করে
সগল বনরাই ফলংত জ্যোতি।
কৈসী আরতি হোই ভবখংডনা তেরী আরতী।
অনহতা সবদ বাজংত ভেরী।"

—সোহিলা, মহলা-১

অর্থাৎ "হে আমার প্রভু, গগন হয়েছে তোমার আরতির থালা, রবি চন্দ্র এই দুই দীপ জ্বলছে সেথায় নিরন্তর। তারকামণ্ডল সুশোভিত রয়েছে মুক্তাখচিত চাঁদোয়ার মতো। মলয়জ চন্দন তোমার ধূপ—তারই সৌগন্ধ বয়ে নিয়ে পবন করছে তোমার চামর ব্যজন। হে জ্যোতির্ময় প্রভু, পুষ্প সম্ভার সাজিয়ে বনস্পতিরা নিবেদন করছে তোমার আরতির পুষ্পার্ঘ। হে ভবখণ্ডন প্রভু, হে মুক্তিদাতা, অনির্বচনীয় তোমার আরতি, এ আরতি বেজে উঠেছে অনাহত ধ্বনির মধ্যে দিয়ে।"

হতবাক হয়ে গেলেন মন্দিরে উপস্থিত দর্শনার্থীরা। বিস্ময়ে অভিভূত হলেন পাণ্ডারা। এমন কথা তারা কেউই শোনেনি কখনও। দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে।

পরেই সকলে জানতে পারলেন, লম্বা দাড়ি আর পিরাণ পরিধানকারী এই মহাত্মা আর কেউই নয়—উত্তর-ভারতের বহুবিশ্রুত মহাপুরুষ উদাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক নানক নিরংকারী।

জনশ্রুতি আছে, এই ঘটনার পর নানক আর কখনও প্রবেশ করেননি জগন্নাথ মন্দিরে। আসন করে বসে থাকতেন স্বর্গদ্বারেই। যেখানে আসন করে বসতেন—সেখানেই স্থাপিত হয়েছে মন্দির। ভিতরে রয়েছে বাঁধানো বেদী। দর্শনীয় কিছুই নেই—আসনবেদী ছাড়া। তাঁরই পাদস্পর্শে পূত পবিত্র হয়েছে ক্ষেত্রটি। শিখ সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি তীর্থস্বরূপ।

কথিত আছে, স্বয়ং জগন্নাথদেব এসে প্রসাদ দিয়েছিলেন স্বর্গদ্বারের আসনে উপবিষ্ট নানককে। একই সঙ্গে পা দিয়ে কূপ খনন করে এনেছিলেন পবিত্র গঙ্গাকে। পাতাল-গঙ্গা নামে এখানে আছে একটি গুপ্ত গঙ্গা। পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজা ছিলেন মহাসিংহ। মন্দিরের কপাটটি তিনিই করে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আনুমানিক সাড়ে চারশো বছর আগে নানক এসেছিলের শ্রীক্ষেত্রে।

নানক মঠ থেকে বেরিয়ে এলেই স্বর্গদ্বারের মোড়। ডানদিকে তাকালেই দেখা যাবে বড় কাঠের একটা দরজা। উপরে লেখা আছে—কবীর চৌরা মঠ। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে ভিতরে চোখে পড়ে ভাঙাচোরা রাস্তা। সোজা চলে গেছে কিছুটা।

মূল দরজা পার হয়ে একটু এগোলেই বাঁদিকে একটা অশ্বত্থগাছ। সামনেই ভাঙাচোরা বাড়ী একটা। ভিতরে ঢুকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামলেই ভাঙা ছোট্ট একটা মন্দির। প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে মন্দিরের সারা গায়ে। ছোট্ট দরজা। ভিতরে বাঁধানো একটা বেদী—যেখানে আসন পেতে ছিলেন কবীর। বেদীর ডানপাশে রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত খড়ম আর জপের মালা। প্রাচীন এই মঠটি যত্ন ও সংরক্ষণের অভাবে আজ ধ্বংস হতে চলেছে।

জনশ্রুতি আছে, সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়তো জগন্নাথ মন্দিরের গায়ে। ফলে ক্ষতির আশংকা দেখা দেয় মন্দিরের। ভক্ত কবীর তখন অবস্থান করছেন পুরীতে। তিনি দেখলেন, এ-রকম চল্লতে থাকলে ভবিষ্যতে লুপ্ত হয়ে যাবে এই মন্দির। স্বর্গদ্বারের এই ক্ষেত্রটিতে এসে বসলেন তপস্যায়। ঢেউ এসে আর আঘাত হানতে পারলো না শ্রীমন্দিরের গায়ে—সক্ষম হলো না কবীরকে অতিক্রম করতে। মরমীয়া সাধকের তপোপ্রভাবে সরে গেল সমুদ্র।

জানা যায়, স্বর্গদ্বারে বসেই বহু দোহা আর গান রচনা করেছিলেন তিনি। তারপর যথা সময়ে কবীর ফিরে যান কাশীতে। দেহরক্ষা করেন সেখানেই।

কবীর মঠ থেকে বেরিয়ে এলেই সামনে পড়বে মেসার্স এন. এন. মুখাজীর ট্যুরিষ্ট বাস বুকিং অফিস। এই অফিসের গায়েই আছে একটি নারায়ণ মন্দির। অনন্ত

শয্যায় রয়েছেন নারায়ণ। এর পাশ থেকে একটু এগোলেই একটা গলি। কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে—বিদুরের বাড়ী বা মূলক চোরা মঠ। এক থেকে দেড় মিনিটের হাঁটা পথ। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠলেই ডানদিকে মন্দির।

মন্দিরের পূজারী বললেন, হস্তিনাপুর থেকে একদা বিদুর এসেছিলেন শ্রীক্ষেত্রে। আসন পেতেছিলেন স্বর্গদ্বারে। জগন্নাথ স্বয়ং আসতেন বিদুরের কাছে—বিদুরের হাতে গড়া পিঠে খেতে। বসতেন পাশাপাশি বিশ্রামে।

বিদুরের বাড়ীতে পাশাপাশি আছে দুটি মন্দির। জগন্নাথদেব যেখানে বিশ্রামে বসতেন সেখানে একটি। আর বিদুর যেখানে আসন পেতে বসেছিলেন—সেখানে একটি। বর্তমান মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে জগন্নাথ বিগ্রহ। প্রতিদিন এখানে খুদের পিঠে আর শাকভোগ দেয়া হয় জগন্নাথদেবকে। এই প্রসাদ পেয়ে থাকেন দর্শনার্থীরাও।

বিদুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেই আবার স্বর্গদ্বারের মোড়। কয়েক পা এগোলেই বাঁপাশে পড়বে শ্মশান। রিক্সার কোন প্রয়োজন নেই। শ্মশানের পাশ দিয়েই সোজা চলে গেছে পীচের রাস্তা। কিছুটা এগিয়ে গেলেই পড়বে গৌড়ীয় মঠ। এটা ছেড়ে আরও একটু এগোলেই বাঁপাশে—হরিদাস সমাধি মঠ। স্বর্গদ্বার থেকে হাঁটাপথে মিনিট চার পাঁচেক। এলাম ঠাকুর হরিদাসের সমাধি মন্দিরে।

নীলাচলে চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যলীলার বহুদিন কেটে গেছে। একদা নিষ্কিঞ্চন মহাবৈরাগী ঠাকুর হরিদাস বসে আছেন 'সিদ্ধবকুলে'—আপন ভজন কুঠিরে। বয়সে বৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। তাই কোথাও যান না।

সকালে জগন্নাথ দর্শন করে ফিরছেন মহাপ্রভু। এমন দর্শন তিনি প্রতিদিনই করেন। সঙ্গে রয়েছেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত, স্বরূপ গোস্বামী, রামানন্দ সার্বভৌম, মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ—আরও ভক্তবৃন্দ। সকলেই এলেন হরিদাস-অঙ্গন—সিদ্ধবকুলে।

শুরু হলো মহানাম সংকীর্তন। ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন হরিদাস। তাঁকে ঘিরে কীর্তন করে চলেছেন মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ। আর আনন্দিত চিত্তে মহাপ্রভু করে চলেছেন ঠাকুর হরিদাসের গুণকীর্তন—বিশিষ্ট ভক্তগণের সামনে। বিচিত্র জীবন ও চরিতকথা, শরণাগতের গুণাবলী। কোন বিকার নেই হরিদাসের। মহাপ্রভুর মুখে এমন গুণকথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হলেন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ। ভুলে গেলেন সকলে জাতিভেদ, মান অভিমান—ভুলে গেলেন বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গৌরব। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন সকলেই—নামপ্রেমিক ঠাকুর হরিদাসকে।

এবার মহাপ্রভু বসালেন নিজের আসনের সামনে। অপলক দৃষ্টিতে হরিদাস চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে। চোখ থেকে নেমে এলো কৃষ্ণপ্রেমের বিগলিত ধারা। এক এক করে মাথায় নিলেন ভক্তগণের পদধূলি। তারপর মহাপ্রভুর চরণদুটি স্থাপন করলেন আপন বক্ষে। মুখে উচ্চারিত হলো কৃষ্ণনাম। সঙ্গে সঙ্গেই স্থির হয়ে গেল দেহ। নামসিদ্ধ দেহ ঢলে পড়লো মাটিতে। সিদ্ধবকুলেই তাপস

জীবনের অবসান হলো প্রেমের ঠাকুর হরিদাসের।
ভক্তগণের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো হরিদাসের ভজনস্থল। প্রেমোন্মত্তে বিহ্বল মহাপ্রভু। হরিদাসের নামময় পবিত্র দেহখানি তুলে নিলেন কোলে। নাচতে লাগলেন হরিদাস-অঙ্গনে—সঙ্গে ভক্তগণও।
তারপর হরিদাসের নিংপ্রাণ দেহ কোলে নিয়ে প্রথমে চলেছেন মহাপ্রভু। পিছনে চলেছেন ভক্তবৃন্দ—কীর্তন করতে করতে। এলেন সমুদ্র তীরে—স্বর্গদ্বারে। স্নান করালেন মহাতাপস হরিদাসের দেহ। এমন দেহস্পর্শে ধন্য হলো সমুদ্র। আকাশ বাতাস মুখরিত হলো হরিনাম ধ্বনিতে।
এবার ভক্তগণ পান করলেন হরিদাসের পাদোদক। অঙ্গ সাজালেন চন্দন আর প্রসাদ বস্ত্রে। বালুকায় গর্ত করলেন সকলে। আপন হাতে মহাপ্রভু শুয়িয়ে দিলেন হরিদাসের নিথর দেহখানি। আবার দেহ ঘিরে শুরু হলো মহানাম সংকীর্তন। তারপর মহাপ্রভু নিজহাতে বালু দিলেন ঠাকুর হরিদাসের শ্রীঅঙ্গে। আর শোক সম্বরণ করতে পারলেন না মহাপ্রভু। হরিদাস-বিরহে গাল বেয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা। বিলাপ করে বলতে লাগলেন,

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়া ছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

এই সমাধি-ক্ষেত্রের উপরেই বাঁধানো হলো বেদী। বস্ত্রঢাকা বেদীর উপরেই নির্মিত হয়েছে সমাধি মন্দির। এখানে এলে মহাপ্রভুর হাতের স্পর্শ অনুভব করা যায় আজও। প্রায় পাঁচশো বছর ধরে মহাপ্রভু আর হরিদাসের স্মৃতি বহন করে চলেছে এই সমাধি মন্দির। এর পাশেই আছে আরও একটি মন্দির। তাতে স্থাপিত আছে মহাপ্রভুর বিগ্রহ। সমাধি মন্দিরের সামনেই সুরম্য নাট-মন্দির। সদা মুখরিত হয়ে আছে নামকীর্তনে। বিরাম নেই কখনও। সমাধি বেদীর সামনেই লেখা আছে,

"গৌরভক্ত বাৎসল্যের নিদর্শন।
এই শ্রীসমাধি কর দরশন॥"

সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ছিলেন রামদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁরই এক গঠনধর্মী কর্ম এই হরিদাস মঠ। এখানকার সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থাপনা আর সংস্কার সাধন করেন তিন। রামদাস বাবাজী মহারাজের জন্যই অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায় এই সমাধি মন্দির।
বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। এবার আর স্বর্গদ্বারের দিকে নয়—বাঁদিকে, ওই একই পথ ধরে সোজা চললাম—মিনিট সাতেক। ডানদিকে চলে গেছে একটা পথ। এখানে জিজ্ঞাসা করলাম একজনকে—দেখিয়ে দিল তোটা গোপীনাথ মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাটা। মিনিট খানেক হাঁটা পথ। এলাম মন্দিরে। স্বর্গদ্বার থেকে সোজা হেঁটে এলে মিনিট বারো চোদ্দ লাগে।
উড়িয়া ভাষায় 'তোটা' শব্দের অর্থ ফুলের বাগান। বহু পূর্বে ফুলের বাগানে

মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই হয়তো নাম হয়েছে—তোটা গোপীনাথ। এখন অবহেলিত হলেও নির্জন পরিবেশ—সুন্দর। কোন কোলাহল নেই। মোটামুটি বাগান একটা আছে। তবে তেমন সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। একেবারেই চাকচিক্যহীন সাধারণ মন্দির। সামনেই বারান্দা। গোপীনাথ বিগ্রহ আছে মন্দিরে। সুদর্শন, পাথরের বিগ্রহ। পদ্মের উপর বসে আছেন তিনি। হাতে মোহন বাঁশি।

নাড়ুগোপাল মূর্তি ছাড়া কৃষ্ণের হাঁটু মুড়ে বসা বিগ্রহ সচরাচর দেখা যায় না কোথাও। সর্বত্রই বাঁশি হাতে দাঁড়ানো মূর্তি। গোপীনাথের বিগ্রহ এখানে বসা অবস্থায়। জনশ্রুতি আছে, পূর্বে এই মূর্তিটি ছিল নৃত্যের ভঙ্গিমায়—দাঁড়ানো অবস্থায়।

প্রবাদ আছে, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমিক গদাধর প্রভু। নিত্য সেবাপূজা করেন গোপীনাথের। চন্দন দিয়ে সাজান। গলায় পরিয়ে দেন নিজের হাতে গাঁথা ফুলের মালা। এইভাবেই কাটে দিনের পর দিন। পার হয়ে যায় বছরের পর বছর।

কালের নিয়মেই বৃদ্ধ হলেন প্রভু গদাধর। ঠিক মতো উঠে দাঁড়াতে পারেন না তিনি। ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠলো গোপীনাথকে মালা পরানো। ভক্তের কষ্টে হৃদয় ব্যথিত হলো ভগবানের। একদিন ভোরে মন্দিরে ঢুকলেন গদাধর। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন গোপীনাথকে দেখে। চেয়ে রইলেন অপলক দৃষ্টিতে। চোখের জলে বুক ভেসে গেল প্রভুর। ঘটে গেছে এক অলৌকিক কাণ্ড। গোপীনাথ আর দাঁড়িয়ে নেই। দয়াপরবশ হয়ে তিনি উপবিষ্ট হয়েছেন আসনে। বৃদ্ধাবস্থায় বসে মালা পরাতে সক্ষম হলেন প্রেমিক-ভক্ত গদাধর।

কথিত আছে, তোটা গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনও। বর্তমানে মন্দির যেখানে সেখানেই বাস করতেন চৈতন্যগতপ্রাণ গদাধর। তাঁর সাধনক্ষেত্রও বটে। প্রতিদিন মহাপ্রভু যেতেন প্রভু গদাধরের কাছে। বসতেন ভাবতন্ময় হয়ে। শুনতেন গদাধরের মুখে ভাগবতের অমৃতময় ব্যাখ্যা।

একদিন ভাববিহ্বল অবস্থায় মহাপ্রভু ছুটে গেলেন সমুদ্রতটে। বালুকারাশি সরিয়ে উদ্ধার করলেন গোপীনাথ মূর্তি। এনে নিত্যসেবার ভার দিলের গদাধরের উপর। পরবর্তীকালে এই মন্দিরে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে বসে থাকতেন বৈষ্ণব সাধক শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী এবং শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ।

তোটা গোপীনাথ মন্দিরের বয়স আনুমানিক প্রায় পাঁচশো বছর। তিনটি প্রকোষ্ঠে নির্মিত মন্দির। মধ্যের প্রকোষ্ঠে রয়েছে গোপীনাথ, রাধা আর ললিতার বিগ্রহ। একটিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, গদাধর এবং রাধা মদনমোহন। অপরটিতে প্রতিষ্ঠিত আছে বারুণী, রেবতী আর বলরামের বিগ্রহ।

মহাপ্রভুর মৃত্যু রহস্যজনক। এ-নিয়ে বিতর্ক আছে। সঠিক কোন তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোথায় তিনি দেহরক্ষা করেছেন—মরদেহই বা গেল কোথায়—

আজও তা অজ্ঞাত। কেউ কেউ বললেন, সমুদ্রে দেহ বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। কারও মতে, গোপনে হত্যা করে তাঁকে পুঁতে ফেলা হয়েছে মাটির নীচে। তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একাংশের মত, এই তোটা গোপীনাথ মন্দিরে গোপীনাথের অঙ্গে মিলিয়ে গেছেন মহাপ্রভু। তাই গোপীনাথ মূর্তিতে হাঁটুর কাছে গর্ত আছে একটি—যেখান দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন তাঁর দেহে। মন্দিরের দরজার উপরেই লেখা আছে—

"কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি স্ফুরে।
হারাইলাম গোরাচাঁদে গোপীনাথের ঘরে॥
গোপীনাথের ঘর গেলা দর্শন করিতে।
অপ্রকট হইলা গোপীনাথের অঙ্গেতে॥"

আরও একটি মত পাওয়া যায়। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ—আষাঢ় মাসের কোন একটি দিনের কথা। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর হবে। এক দিব্য ভাবাবেশে মহাপ্রভু ঢুকলেন জগন্নাথ মন্দিরে। প্রতিদিনই তিনি গড়ুড় স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে দর্শন করেন জগন্নাথ বিগ্রহ। কিন্তু সেদিন আর দাঁড়ালেন না সেখানে। সোজা চলে গেলেন রত্নবেদী—জগন্নাথ বিগ্রহের কাছে। ভক্ত এবং পার্ষদগণ তা লক্ষ্য করছেন সবিস্ময়ে। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল গর্ভমন্দিরের বিশাল দরজা। মহাপ্রভু রইলেন ভিতরে—আর সকলে বাইরে।

ধীরে ধীরে সময় কাটতে থাকলো। কেটে গেল বহুক্ষণ। তারপর খোলা হলো দরজা। মহাপ্রভুকে আর দেখা গেল না গর্ভগৃহে। চিরতরে অন্তর্হিত হলেন তিনি। অনেক অনুসন্ধান করেও পাওয়া গেল না তাঁর মরদেহ—কোথাও। তৎকালীন উড়িষ্যার রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র দেব। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা, ভক্ত আর পার্ষদগণের ব্যাকুল ও ব্যাপক অনুসন্ধান—সব কিছুই ব্যর্থ হলো সেদিন। চির-দুর্বোধ্য হয়ে রইলো মহাপ্রভুর এই রহস্যময় অন্তর্ধান।

তোটা গোপীনাথ থেকে ফিরে সোজা এলাম হরিদাস মঠের সামনে। এর ঠিক বিপরীত দিকেই চলে গেছে একটা রাস্তা। কথায় আছে—পথ চলো জেনে, টাকা নাও গুণে। একটু জিজ্ঞাসা করেই চললাম এগিয়ে। রাস্তাটির নাম বলুসাই। হরিদাস মঠ থেকে মিনিট আট দশেকের হাঁটা পথ। এলাম আচার্য শংকরের প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মঠে।

জগন্নাথ মন্দির থেকে স্বর্গদ্বারে আসার পথে মাঝামাঝি জায়গায়—ডানদিকে চলে গেছে একটা রাস্তা—ও পথেও আসা যায় গোবর্ধন মঠে। হেঁটে কিংবা রিক্সায়—অসুবিধে নেই কোনটাতেই।

আচার্য শংকর মাত্র পাঁচ বছর বয়সে গেলেন গুরুগৃহে। সমস্ত শাস্ত্র ও বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করলেন দু-বছরের মধ্যে। তারপর ফিরে এলেন গৃহে। আট বছর বয়সে গুরুগোবিন্দপাদের কাছে গ্রহণ করলেন দীক্ষা এবং সন্ন্যাস। সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করলেন বারোর মধ্যে। ব্রহ্মসূত্র, দ্বাদশোপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,

বিষ্ণুসহস্রনাম, সনৎসুজাতীয় প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্যরচনা করেন ষোল বৎসর বয়সের মধ্যে। তারপর সনাতন-ধর্মের প্রচার এবং বৈদিক-ধর্মের পুনরুদ্ধারকল্পে তিনি পরিভ্রমণ করেন আসমুদ্রহিমাচল।

এই পরিভ্রমণকালেই তিনি ভারতের চার প্রান্তে স্থাপন করেছিলেন চারটি মঠ। পূর্বে শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ, উত্তরে হিমালয়ে বদরীনারায়ণের পথে জ্যোতির্মঠ বা যোশী মঠ এবং দক্ষিণে রামেশ্বরে প্রতিষ্ঠা করেন শৃঙ্গেরী মঠ। গোবর্দ্ধন মঠের প্রবেশ-মুখেই বড় একটি তোরণ। ভিতরে মঠের প্রাঙ্গণ বেশ বড়। এখানে রয়েছে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ—গোড়া বাঁধানো।

এবার দ্বিতীয় তোরণ। এখান থেকে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম নীচে। সমগ্র মঠটিই একটি গর্ভগৃহ। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ। কোন কোলাহল নেই। যাত্রী সমাগম খুব কমই হয় এখানে। এ-সব দেখার ব্যাপারে অনেকেরই মাথা ব্যথা নেই। অনেকে তো কোন খবরই রাখেন না।

সম্পূর্ণ একতলাটাই গর্ভমন্দির। মন্দিরে সাজানো শয্যায় বসানো আছে আচার্য শংকরের বাঁধানো একটি ছবি। তার সামনে ছোট্ট একটি বোর্ডে লেখা রয়েছে—'শয্যাটি আচার্য শংকরের ব্যবহৃত'। এটির পাশেই স্থাপিত পাথরের মূর্তিটি শংকরাচার্যের।

এই মন্দিরের সামনেই আছে আরও একটি মন্দির। তাতে প্রতিষ্ঠিত আছে কালো পাথরের সুদর্শন কৃষ্ণমূর্তি। নাটমন্দিরে রয়েছে বিশাল একটি যজ্ঞকুণ্ড।

প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে সর্বত্রই। কৃষ্ণ মন্দিরের সামনের দিকটায় আছে একটি শিব মন্দির। তাতে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটি অর্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গের। পুরীতে অবস্থানকালে এটি নিজহাতে প্রতিষ্ঠা করেন শংকরাচার্য। এ-কথা লেখা আছে মন্দিরের দেয়ালে।

গোবর্দ্ধন মঠে দর্শনীয় যা—তা এই। স্থানীয় লোকমুখে বালি মঠ নামেও পরিচিত। আনুমানিক ১২৩৬ বছর ধরে শংকরাচার্যের পদধূলি আর তাঁর পুণ্যস্মৃতির বাহক শ্রীক্ষেত্রের এই গোবর্দ্ধন মঠ। মানসিক আনন্দ শুধু আচার্যের স্মৃতিমন্থনেই।

পায়ে হেঁটে দেখার জায়গাগুলো সেরে ফেলি। জগন্নাথ মন্দিরের সামনে—স্বর্গদ্বারের দিকে আসার পথে, পঁচিশ ত্রিশ পা এগোলেই বাঁ-পাশে পড়বে এমার মঠ। একদা আচার্য রামানুজ এসেছিলেন এই জগন্নাথ ক্ষেত্রে। এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এখানে স্থাপিত কুচকুচে কালো পাথরের মূর্তিটি আচার্য রামানুজের। মঠের দোতলায় আছে একটি লাইব্রেরী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই—এটি একটি মঠ। কোন জৌলুস নেই। দেখলেই মনে হবে পুরনো একটি দোতলা বাড়ী।

'এমার' মঠের নামকরণের পিছনে রয়েছে সুন্দর একটি কাহিনী। ভারতের সাধক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে,

" 'গোবিন্দ' আচার্য রামানুজের বাল্যবন্ধু এবং সহাধ্যায়ী। শ্রদ্ধাভক্তি ও দাস্য-ভাবের জীবন্ত মূর্তি এই গোবিন্দ। কিছুদিন মধ্যে রামানুজ স্বয়ং তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। অসামান্য মর্যাদা দিয়া ভক্তের নামকরণ করিলেন— 'মন্নাথ'। এ-যাবৎ এই নামে একমাত্র রামানুজই শুধু অভিহিত হইতেন। এবার তাই ইহাতে গোল বাধিল। দাস্যভাবে ভাবিত পরমবৈষ্ণব গোবিন্দ তাঁহার প্রভুর এ-নাম কি করিয়া ব্যবহার করিবেন! তিনি একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। শ্রীরামানুজকে তখন এক কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। 'মন্নাথ' শব্দটির তামিল প্রতিরূপ 'এম-পেরুমানার'—ইহার প্রথম অংশ 'এম' এবং শেষাংশ 'আর'—এই দুইটি একত্র সংযোজিত করিলে দাঁড়ায় 'এমার'। অতঃপর এই নামেই গুরু তাঁহার প্রিয়শিষ্য গোবিন্দকে চিহ্নিত করিলেন। উত্তরকালে পুরীধামে যে সুপ্রসিদ্ধ মঠ শ্রীরামানুজ কর্তৃক স্থাপিত হয়, গোবিন্দের নামানুসারেই তিনি উহার নামকরণ করেন। 'এমার মঠ' নামে উহা পরিচিত।"

তীর্থপুরীতে আর কোথায়—কি আছে

পায়ে হেঁটে দেখার জায়গাগুলো দেখে নিলাম। কিছু কিছু দর্শনীয় জায়গা আছে—যেগুলো দেখতে হলে রিক্সা ছাড়া গতি নেই। পায়ে হেঁটে দেখতে গেলে ক্লান্তি আসে। ভ্রমণের আয়াসও নষ্ট হয়। রিক্সা আর অটো—ঘোরা যায় দুটোতেই। ভাড়ারও পার্থক্য আছে। সওয়ারী বুঝে ভাড়া। অটোতে সময় লাগে কিছুটা কম। অটো বা রিক্সাচালক—সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয় এখানকার যা যা দেখার আছে—সব।

রিক্সা ভাড়া করলাম স্বর্গদ্বার থেকেই। চললো জগন্নাথ মন্দিরের দিকে। মন্দির থেকে কিছুটা আগেই দাঁড়িয়ে গেল রিক্সা। এখান থেকে জগন্নাথ মন্দির মাত্র মিনিট তিনেকের পথ। এদিক থেকে ডান পাশে—ওদিক থেকে আসলে বাঁ-পাশে পড়বে গম্ভীরা মঠ। একেবারে রাস্তার ধারেই। মূল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলেই মূল মন্দির।

তখন স্বাধীন উৎকলের স্বাধীন রাজা ছিলেন প্রতাপরুদ্র দেব। তাঁর কুলগুরু ছিলেন কাশী মিশ্র। রাজার দানের জমি—বালিশাহির (গম্ভীরা) পল্লীতে থাকতেন তিনি। একান্তে নিভৃতে। নিজস্ব বাসভবনও এটি। নিত্য সেবা-পূজো করতেন শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের। বর্তমান নাম—কাশী মিশ্রালয়, রাধাকান্ত মঠ, গম্ভীরা। মঠের প্রবেশ-দ্বারেই লেখা আছে।

মাত্র ২৪ বৎসর বয়সেই সন্ন্যাস নিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। সন্ন্যাস নেয়ার পর প্রথমেই এলেন নীলাচলে। তারপর এখান থেকেই বেরিয়ে পড়লেন দাক্ষিণাত্যের রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর এবং অন্যান্য তীর্থ পর্যটনে। দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটো বছর। আবার ফিরে এলেন জগন্নাথক্ষেত্রে। আশ্রয় দিলেন রাজগুরু কাশী মিশ্র। তিনি বুঝেছিলেন মহাপ্রভু সাধারণ মানুষ নন। তাই নিজ বাসভবনেই নির্মাণ করে দিলেন ছোট্ট মাটির একটি কুটির। আর সদা-সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন, কোনভাবেই যেন কষ্ট না পান তিনি। রাজগুরুর যত্ন ও আশ্রয়ে রইলেন মহাপ্রভু।

'গম্ভীরা' শব্দের অভিধানগত অর্থ—ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বা নির্জন ক্ষুদ্রগৃহ। গম্ভীরায় বসে ভাবতন্ময় অবস্থায় কৃষ্ণের নামগানেই দিন কাটাতেন মহাপ্রভু। আত্মহারা হয়ে উঠতেন কৃষ্ণপ্রেমে। দীর্ঘ আঠারোটা বছর বাস করেছিলেন এই প্রকোষ্ঠে। তাই ওই প্রকোষ্ঠই খ্যাতিলাভ করলো 'গম্ভীরা' নামে।

মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর তাঁর ব্যবহৃত ছেঁড়া কাঁথা, চন্দন-চর্চিত পাদুকা আর কমণ্ডলু—প্রায় পাঁচশো বছর ধরে সযত্নে রক্ষিত আছে এখানে—আজও। কাচের বাক্সের মধ্যে রয়েছে এগুলি। দর্শন করতে পারেন সকলেই। কোন দর্শনী লাগে না। পর্যটক বা তীর্থযাত্রীদের কাছে গম্ভীরায় মহাপ্রভুর এই স্মৃতি-চিহ্নের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। নরজীবনকে ধন্য করতে প্রতিদিন পূজাও করা হয়। শ্রী রায় রামানন্দ এবং শ্রী স্বরূপ দামোদর ছিলেন মহাপ্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ। এঁরা দুজনেই তাঁর গম্ভীরা লীলার নিত্য সঙ্গী।

গম্ভীরা সংলগ্ন একটি আলাদা মন্দিরে আছে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজগুরু কাশী মিশ্র। মহাপ্রভুর একান্ত অনুচর ছিলেন শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী। এক সময়—তিনিও রাধাকান্তের নিত্যপূজো করতেন।

ধ্যান গম্ভীর—শ্রীগম্ভীরা। এঁদেরই পদধূলিতে পবিত্র গম্ভীরা আজ সদা মহানাম সংকীর্তনে হয়ে আছে মুখরিত।

বেরিয়ে এলাম গম্ভীরা থেকে। সামান্য একটু পথ—বাঁয়ে গলিতে ঢুকে সোজা কিছুটা গিয়ে আবার থেমে গেল রিক্সা। এলাম সিদ্ধবকুল। কাঠের বড় একটা দরজা। ঢুকেই নাটমন্দিরযুক্ত ঠাকুর হরিদাসের মন্দির। ভিতরে স্থাপিত মূর্তিটি হরিদাস ঠাকুরের। মন্দিরের সামনেই রয়েছে একটি বকুল গাছ।

একসময় কাশী মিশ্রের ফুলের বাগান ছিল এখানে। বর্তমান নাম এর—সিদ্ধবকুল। এখন আর বাগান নেই—আছে শ্রীহরিদাস আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্পর্শ ধন্য বকুল গাছটি। সম্পূর্ণ ফাঁপা। সার নেই। শুধু বাকলের উপর গাছটি দাঁড়িয়ে আছে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে। বেঁচে আছে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে এই গাছটি সম্পর্কে। গাছ সংলগ্ন মন্দিরের দেয়ালে লেখা আছে—

'শ্রীশ্রী সিদ্ধবকুল পরিচয়'

"২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসলীলা অভিনয় করিবার পর প্রেম পুরুষোত্তম যুগাবতারী

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে আগমন করিলে শ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসও তাঁহার সঙ্গলোভে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীধাম নীলাচলে আগমন করেন। কিন্তু 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের মূর্ত্তিমন্ত স্বরূপ ঠাকুর শ্রীহরিদাস অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সম্মুখে না যাইয়া তাঁহার আদেশে গম্ভীরার অনতিদূরে একটি নির্জন প্রদেশে বাস করিলেন। দৈন্যভূষণে বিভূষিত পরম নিষ্কিঞ্চণ শ্রীহরিদাস অতিদৈন্যে নিজের ভজনস্থলী ছাড়িয়া অন্যত্র যান না।

এইজন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রত্যহ জগন্নাথদেবের দর্শনের পর এই স্থানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া যান। শ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরকে ছায়া প্রদানের উদ্দেশ্যে (প্রখর রোদের তাপের মধ্যে বসেই নাম জপ করতেন ঠাকুর হরিদাস।) ভক্তবৎসল গৌরহরি একদা জগন্নাথদেবের একটি প্রসাদী বকুল দাঁতন রোপণ করায় তাহা হঠাৎ এক বিরাট ছায়াদানকারী বৃক্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই বৃক্ষতলায় বসিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিন লক্ষবার নাম জপ করিতেন।

এই বৃক্ষছায়ায় বসিয়া শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী 'ললিত মাধব ও বিদগ্ধ মাধব' নামক নাটক রচনা করিয়া সপরিকর গৌরভক্তবৃন্দকে শুনাইয়াছিলেন।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও শ্রীধাম নীলাচলে অবস্থানকালে এইখানে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের সঙ্গে অবস্থান করিতেন।

পরিশেষে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অলৌকিক অপ্রকটের (নির্যানে) শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার চিন্ময় শরীর স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্বক সপরিকর এই বৃক্ষতলায় নৃত্য কীর্তন করিয়াছিলেন।

কালক্রমে (শ্রীহরিদাস ঠাকুরের স্বধামে প্রয়াণ এবং মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণের পর) একদা জগন্নাথদেবের রথের চক্র নির্মাণের জন্য তদানীন্তন গজপতি মহারাজের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রাজকর্মচারীগণ সুপরিপুষ্ট এই বৃক্ষরাজকে ছেদন করিবার জন্য আগমন করেন।

বৃক্ষরাজের সেবক ইহার সুরক্ষা নিমিত্ত রাজকর্মচরীগণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু অসীম রাজশক্তির সম্মুখে নিষ্কিঞ্চণ সেবকের প্রার্থনা নিষ্ফল হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি অনশনপূর্বক বৃক্ষরাজের নিকট নিপতিত হইয়া রহিলেন। যেদিন সেই বৃক্ষটি ছেদন করা হইবে বলিয়া রাজকর্মচারীগণ নির্দিষ্ট করিয়া গেলেন—তাহারই পূর্বরাত্রে বৃক্ষটি অকস্মাৎ অন্তঃসারশূন্য অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে শায়িত অবস্থায় রহিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজকর্মচারীগণ আসিয়া বৃক্ষরাজের এতাদৃশ্য অবস্থা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফিরিয়া গেলেন। সেই হইতে বৃক্ষরাজ শ্রীমন্ মহাপ্রভু তথা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পবিত্র লোকপাবনী লীলা-স্মৃতিকে চিরজাগ্রত করিয়া "শ্রীশ্রী সিদ্ধবকুল" রূপে সম্পূজিত হইতেছেন।"

জনশ্রুতি আছে, চৈত্র সংক্রান্তিতে এই বকুলগাছটি নিজ হাতে রোপণ করেছিলেন

মহাপ্রভু। তাই প্রতিবছর ওই সিদ্ধবকুলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় অভিষেক উৎসব। ছোটখাটো মেলাও বসে এখানে।
সিদ্ধবকুলের মঠটি নির্মিত হয় চৈতন্যদেব দেহে থাকাকালীন। নির্মাণ করেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। এই মঠের পাশেই আছে একটি ভজন কুটির—সাধক সতীনাথ দাসের।

আবার রিক্সা চললো। অল্প একটু পথ। জগন্নাথ মন্দির থেকে স্বর্গদ্বারের পথে—একটু এগিয়ে, ডানপাশের গলিতে ঢুকলো রিক্সা। এলাম শ্বেতগঙ্গা। পঞ্চতীর্থের মধ্যে অন্যতম তীর্থ এটি।
চারদিক বাঁধানো একটি কুণ্ড। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। পাশেই গঙ্গাদেবীর মন্দির। প্রবাদ আছে, ত্রেতাযুগে শ্বেত নামে এক রাজা ছিলেন। শত বৎসর অনশন এবং মাধবরূপী জগন্নাথদেবের উপাসনা করে ভগবানের স্বারূপ্যলাভ করেন। ফলে শ্বেতরাজা হলেন শ্বেতমাধব। এই কুণ্ডের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। কুণ্ডটি পরিচিত হয় শ্বেতগঙ্গা নামে। শ্বেতমাধব, নবগ্রহমূর্তি এবং মৎস্যমাধব বিগ্রহ স্থাপিত আছে এখানে।
এখান থেকে রিক্সা চললো একেবারে সোজা—জগন্নাথ মন্দিরের দিকে। মন্দির ছাড়িয়ে একটু এগোতেই বাজার। আরও একটু এগিয়ে এলাম জগন্নাথ বল্লভ মঠে। বড় রাস্তার ধারে—বাঁ-পাশে।
মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দ। এই মঠটিতে একদা ছিল তাঁরই সুবিস্তৃত বাগান বাড়ী। সপারিষদ মহাপ্রভু বহুবার এসেছেন এখানে। প্রেমভাবে রাধাপ্রেম আর কৃষ্ণকথা আলোচনা করেছেন রামানন্দের সঙ্গে। আজও তাঁর স্পর্শ অনুভব করা যায় এই বাগান বাড়ীতে এলে।
জগন্নাথ-মন্দিরের সঙ্গে এই জগন্নাথ বল্লভ মঠের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। মন্দিরের যা কিছু উৎসব অনুষ্ঠান—তা সবই আরম্ভ হয় এই মঠ থেকে। এখানকার বাগানের ফুলেই নিত্য পূজা হয় জগন্নাথদেবের। এই মঠের প্রধান দেবতা মহাবীর। লোক-বিশ্বাস, জগন্নাথ মন্দিরের পূজা ভোগ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সুন্দর পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রে যে অবদান—তা মহাবীরেরই।
এই মঠটি স্থাপন করেন বিষ্ণুস্বামী। রায় রামানন্দের সাধনক্ষেত্রও বটে। এখানে স্থাপিত আছে মহাপ্রভু এবং রামানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি। আর রয়েছে জগন্নাথ, রাধামাধব বিগ্রহ। জগন্নাথদেবের মন্দির দেখতে এসে পায়ে হেঁটেও দেখে নেয়া যায় জগন্নাথ বল্লভ মঠ। মাত্র মিনিট খানেকের পথ।
যাত্রীরা ঘুরতে গেলে দাঁড়িয়ে থাকে রিক্সা। দেখা শেষ হলে আবার চলা—আবার দেখা। এইভাবেই চলতে থাকে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখা—ঘোরা। পুরীতে অধিকাংশ রিক্সাচালকই বাঙালী। রুটি রোজগারের জন্যেই এসেছে এখানে। বেশ ভালোই আছে এরা। বাঙালী রিক্সাচালকের সংখ্যা বেশী দেখেছি বৃন্দাবনেও। দারুণভাবে রপ্ত থাকে এদের স্থানীয় ভাষা। নিজেরা পরিচয় না দিলে কারও

বোঝার উপায় নেই—এরা কোন্ ভাষাভাষীর লোক। চেহারাতেও পড়ে যায় আঞ্চলিকতার ছাপ।

অনেক রিক্সাচালকেরই মত, বাংলার চেয়ে ভালো আছি বাংলার বাইরে। তীর্থযাত্রী আর পর্যটকের পয়সা। অভাব নেই তাদের—অভাব হয় না আমাদেরও। মাঝে মধ্যে মন খারাপ হয়। তখন একবার ঘুরে আসি বাড়ী থেকে।

জগন্নাথ বল্লভ মঠ ছেড়ে ওই একই রাস্তা ধরে রিক্সা চললো এগিয়ে। এলো কিছুটা। এবার ঘুরলো বাঁ-দিকে। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল রিক্সা। সামনেই বিশাল—নরেন্দ্র সরোবর। চারদিক বাঁধানো।

আরও একটা নাম এর—চন্দন সরোবর। কপিলেন্দ্র দেবের পুত্র নরেন্দ্র দেব। তেরো শতাব্দীতে এই সরোবরটি খনন করান তিনি। তাঁর নামানুসারেই সরোবরের নাম হয়েছে—নরেন্দ্র সরোবর।

এর দক্ষিণঘাটের কাছাকাছি আছে ছোট্ট একটা দ্বীপ। তার মধ্যে রয়েছে সুন্দর একটি মন্দির। ছোট্ট পুল। যাওয়া যায় অনায়াসে।

প্রতিবছর একটি উৎসব হয় এখানে। শুরু হয় অক্ষয় তৃতীয়া থেকে। টানা চলে একুশ দিন ধরে। এ উৎসব চন্দনযাত্রা মহোৎসব নামেই খ্যাত। জগন্নাথদেবের মন্দির থেকে শৃঙ্গারবেশে এখানে আনা হয় শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন বিগ্রহদ্বয়কে। সাজানো থাকে নৌকা। বসানো হয় বিগ্রহ। অনেকক্ষণ ধরে নৌকাবিহার চলে সরোবরে। তারপর দ্বীপের মন্দিরে বসানো হয় যুগলমূর্তি। এটি রাধা মদনমোহনের বিলাস মন্দির। চলে সেবা-পূজা, ভোগরাগ। অনেক রাতে বিগ্রহদ্বয়কে ফিরিয়ে আনা হয় জগন্নাথ-মন্দিরে। পরদিন আবার—এইভাবেই একুশ দিন চলে চন্দনযাত্রা উৎসব।

জনশ্রুতি আছে, প্রতিদিন এই সরোবরে স্নান এবং জলক্রীড়া করতেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তাই লোক-মুখে আরও একটি নাম আছে এর—মহাপ্রভুর জলক্রীড়া সরোবর।

নরেন্দ্র সরোবর থেকে মিনিট খানেকের পথ। রিক্সা এসে থামলো জটিয়াবাবার আশ্রমের দোরগোড়ায়। হেঁটে আসলে জগন্নাথ বল্লভ মঠ থেকে গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে যেতে—কিছুটা এগিয়ে বাঁ-পাশে চওড়া একটা রাস্তা ধরে এগোলেই এই আশ্রম। ঠিক নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরেই।

বিশাল জটাজুটধারী দিব্যকান্তি মহাপুরুষ ছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এত বড় জটা খুব কম সাধকেরই দেখা যায়। পুরীধামে এই জটার জন্যই উৎকল-বাসীরা তাঁর নাম দেন জটিয়াবাবা। আশ্রমের নামও হয়েছে জটার কারণে।

শান্ত পরিবেশ। কোন কোলাহল নেই। সুন্দর সাজানো বাগান। একেবারে আশ্রমেরই পরিবেশ। এরই মাঝে গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দির। ভিতরে পাথরে বাঁধানো সমাধি বেদী। গেরুয়া বসনে ঢাকা। মন্দিরের কোণায় রয়েছে তাঁরই বহুকালের ব্যবহৃত একটি লাঠি।

সারা ভারতের অসংখ্য তীর্থ পর্যটন করেছেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ। এই পর্যটনে বাদ যায়নি কৈলাস ও মানস সরোবরও। দীর্ঘ সাধন জীবন প্রভুপাদের—শেষ করে জীবন সায়াহ্নে এলেন নীলাচলে—জগন্নাথদেবের আহ্বানে। সঙ্গে নিয়ে এলেন কয়েকজন শিষ্য-সেবক। উচ্চকোটি সাধক জটিয়াবাবা। অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা উৎকলে। পুরী তীর্থের ভক্ত সমাজে এলো বিপুল প্রতিষ্ঠা। ফলে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির মধ্যে। এ আগুনে পুড়লেন কিছু বৈষ্ণব মঠের মহন্ত। তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন বিজয়-কৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য।

একদিন ভোরবেলায় প্রভুপাদ বসে আছেন ভক্ত নীলমণি বর্মণের বাড়ীতে। সঙ্গে আছেন কয়েকজন ভক্ত-শিষ্য। এমন সময় তাঁর সামনে এলেন সাধুবেশধারী একটি লোক। হাতে রয়েছে জগন্নাথদেবের প্রসাদ। মুহূর্ত দেরী করলেন না তিনি। গোস্বামী প্রভুর হাতে দিলেন প্রসাদী নাড়ু। বললেন, প্রসাদ পাওয়ামাত্রই খেতে হয়—খেয়ে নিন বাবা।

সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ। প্রসাদী নাড়ুর রহস্য তিনি জানেন। বুঝতে এতটুকু দেরী হলো না—এই প্রসাদেই মেশানো আছে প্রাণঘাতি বিষ। আরও বুঝলেন, এতেই হবে তাঁর নরজীবনের অবসান। এটাই বিধিলিপি—ভগবানের ইচ্ছা।

পরম ভাগবত বিজয়কৃষ্ণ। জগন্নাথদেবের প্রসাদ এসেছে তাঁর কাছে। কিছুতেই অবজ্ঞা বা প্রত্যাখান করতে পারলেন না মহাপ্রসাদকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে খেয়ে নিলেন তিনি। তারপর অচেতন হয়ে পড়লেন ধীরে ধীরে। চিকিৎসক এলো। হলো জ্ঞান সঞ্চার। কিন্তু দেহ গেল একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে। আরোগ্য তো হলোই না—সুস্থও নয়। এমন অবস্থা চললো প্রায় একমাস। বাংলা ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ। পুরীধামের এই আশ্রমে নিত্যলীলার অবসান ঘটিয়ে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ চলে গেলেন সেখানে—যেখানে গেলে মানুষ আর কখনও ফেরে না।

নাথ সম্প্রদায়ের মহাযোগী গম্ভীরনাথ। একবার তিনিও এসেছিলেন পুরীধামে। কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন জটিয়াবাবার আশ্রমে। বিজয়কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তাঁর শিষ্য সেবকগণ। তাঁদের আন্তরিক অনুরোধ আর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেননি গম্ভীরনাথ। তাই তিনি এসেছিলেন জগন্নাথক্ষেত্রে। অত্যন্ত আনন্দ ও প্রীতিলাভ করেছিলেন তাঁদের সেবা-যত্নে।

বহুকালের একটি জনশ্রুতি আছে, তখন এখানে কোন আশ্রম নয়—ছিল বনজঙ্গল আর প্রায় নির্জন পরিবেশ। তারই মধ্যে ছিল একটি বিশাল বটগাছ। বর্তমানে জটিয়াবাবার মন্দিরটি যেখানে—এরই কাছাকাছি। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রতিদিন স্নান করতেন চন্দন সরোবরে। আর বটগাছের নুয়ে পড়া ডালে মেলে দিয়ে শুকাতেন তাঁর পরিধানের কৌপিনটি।

জটিয়াবাবার আশ্রমের বিপরীত দিকেই কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি মন্দির। প্রভুপাদ

বিজয়কৃষ্ণের একান্ত প্রিয়শিষ্য কুলদানন্দ। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি।

নানা বৃক্ষলতায় সুশোভিত সমাধি-মন্দির প্রাঙ্গণ। জটিয়াবাবার আশ্রমের মতোই সুন্দর শান্ত মনোরম এর পরিবেশ। পাথরে নির্মিত সমাধি মন্দির। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৪৫ সালে। ভিতরে সমাধি বেদী। পাশেই কুলদানন্দের সুন্দর পাথরের মূর্তি—যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মন্দিরের স্তম্ভগুলি কারুকার্যখচিত। গুরুদেব বিজয়কৃষ্ণের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয় শিষ্য কুলদার সমাধি মন্দির—উচ্চতায়, সৌন্দর্যে এবং শিল্পবৈচিত্র্যে।

কুলদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন ১২৭৪ সনের ২৪শে কার্তিক। জগন্নাথক্ষেত্রের এই আশ্রমেই দেহরক্ষা করেন ১৩৩৭ সনের ১১ই আষাঢ়।

সমাধি মন্দির দর্শন করে বাইরে এলাম। রিক্সায় ওঠা-মাত্রই চলা শুরু। সোজা চলে এলো বড় রাস্তায়। ডানদিকে জগন্নাথ-মন্দির। বাঁদিকে চললো রিক্সা। মিনিট খানেকের পথ। এলাম গুণ্ডিচা মন্দির। জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ী।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী ছিলেন গুণ্ডিচা দেবী। তাঁর নামানুসারেই মন্দিরের নাম—গুণ্ডিচা ঘর বা গুণ্ডিচা মন্দির।

বেশ অবস্থাপন্ন মাসি। সিংহদ্বার পেরোলেই বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণ। ঠিক যেন একটা বাগান বাড়ী। আরও একটু এগোতেই ডানদিকে মন্দির। জগন্নাথদেবের মাসির বিগ্রহ স্থাপিত আছে মন্দিরে। বিগ্রহটি দেখতে একেবারে লক্ষ্মীর মতো।

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। প্রতিবছর রথযাত্রার শুরু—এই মাস-তিথিতেই। জগন্নাথ মন্দির থেকে তিনটি রথ আসে মাসির বাড়ী—গুণ্ডিচা মন্দিরে। নন্দীঘোষ রথে জগন্নাথ, তালধ্বজে বলরাম এবং দেবদলন রথে সুভদ্রাকে চড়িয়ে আনা হয় গুণ্ডিচায়। এঁদের সাতদিন কাটে মাসির বাড়ীতে। তারপর আবার যথাস্থানে—জগন্নাথ মন্দিরে।

কথিত আছে, তখনও পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হননি জগন্নাথ। রাণী গুণ্ডিচা দেবী সর্বপ্রথম জগন্নাথদেবকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই গুণ্ডিচা মন্দিরে। পরে উৎসব করে স্থানান্তরিত করেন পুরীর মূল মন্দিরে। সেই থেকে এই উৎসব প্রসিদ্ধ হলো রথযাত্রা নামে—সূচনা হলো উৎসবেরও।

রথযাত্রা উৎসবকে পতিতপাবন মহোৎসবও বলে। কারণ এই উৎসবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই জগন্নাথ-দর্শনের সুযোগ পেয়ে ধন্য হন। যাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই—তারাও।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করে মহাপ্রভু ফিরে এলেন নীলাচলে। তখনও রথযাত্রা শুরু হয়নি। সামনেই আসছে সেই আনন্দমুখর উৎসব।

এদিকে দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলে গুণ্ডিচা মন্দির ভরে উঠেছে নোংরায়। সেই মন্দিরে প্রভু জগন্নাথ যাবেন—তা কেমন করে হয়! ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন

মহাপ্রভু। এতটুকু দেরী করলেন না তিনি। ব্যাকুল হয়ে ডেকে পাঠালেন কাশী মিশ্র, বাসুদেব সার্বভৌম আর পরিছা পাত্রকে। জানালেন তাঁর মনের কথা। নিজের হাতেই পরিষ্কার করবেন গুণ্ডিচা মন্দির।
উড়িষ্যার রাজা তখন প্রতাপরুদ্র দেব। তাঁরা সকলেই রাজাকে জানালেন মহাপ্রভুর কথা। রাজার আদেশ আছে—কোন ইচ্ছাই যেন মহাপ্রভুর কখনও অপূর্ণ না থাকে। মন্দির পরিষ্কার করবেন মহাপ্রভু—এটাই যেন রথযাত্রার আগে নতুন কোন উৎসব। তাই নতুন মাটির কলসী আর একশো ঝাঁটা—সংগ্রহ করে দিলেন পরিছা পাত্র।
কৃষ্ণভাবে বিভোর মহাপ্রভু সপারিষদ গেলেন গুণ্ডিচা মন্দিরে। কৃষ্ণনামে মুখরিত হয়ে উঠলো মন্দির। নিজ হাতে পরিষ্কার করলেন মহাপ্রভু—সঙ্গে আর সকলে। মহাপ্রভুর পায়ের স্পর্শ পায়নি—পুরীতে এমন মন্দির নেই বললেই চলে।

এবার রিক্সা চললো গুণ্ডিচা মন্দিরের উত্তরে। এলাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—পঞ্চতীর্থের অন্যতম একটি। বাঁধানো এই সরোবরের পাশেই সুন্দর একটি মন্দির। নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন মন্দিরে।
পুরাণ-প্রসিদ্ধ পুরুষ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। সূর্যবংশেই তাঁর জন্ম। স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত উৎকল-খণ্ডে উল্লিখিত আছে এই রাজার কথা।
ধর্মাত্মা এই রাজা যেমন ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত—তেমনই বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ। একই সঙ্গে প্রজাবৎসলও। রাজ্যের রাজধানী ছিল অবন্তীনগর। তাঁর রাজসভায় প্রতিদিন আগমন ঘটতো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কবি, শিল্পী, তীর্থপর্যটনকারী—এমন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের। তাঁদের মুখে তিনি শুনতেন নানা ধর্ম-কথা। একদিন কথা-প্রসঙ্গে রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কোন্ তীর্থ আছে—যেখানে চর্মচোখে স্বয়ং জগন্নাথদেবের দর্শন পাওয়া যায়?
কথাটা শুনলেন সকলেই। সভায় উঠে দাঁড়ালেন একজন জটাজুটধারী। জানালেন, সারা পৃথিবীর অসংখ্য তীর্থ পরিক্রমা করেছেন তিনি। তার মধ্যে পুরুষোত্তমক্ষেত্রই সর্বোত্তম। এই ক্ষেত্র মুক্তিপ্রদ। নীলাচল নামে একটি পর্বত আছে সমুদ্র তীরে। গভীর অরণ্য সমাবৃত। এরই মাঝে রয়েছে একটি কল্পবৃক্ষ। তার পশ্চিমে রোহিণী নামে কুণ্ড আছে একটি। সেই কুণ্ডের জল অতি পবিত্র। স্পর্শমাত্রই মানুষের মুক্তিলাভ হয়। এরই পূর্বতীরে বিষ্ণুধাম—সেখানে বিরাজ করছেন পুরুষোত্তম জগন্নাথদেব। তিনি স্বয়ং মুক্তিদাতা।
এইভাবে আরও অনেক কথা বললেন জটাজুটধারী—পুরুষোত্তমক্ষেত্রের। তারপর অন্তর্ধান করলেন সভাস্থল থেকে।
জটাজুটের কথা শুনলেন রাজা। কালবিলম্ব করলেন না তিনি। চিরতরে ত্যাগ করলেন অবন্তীনগর। এলেন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে। স্থাপন করলেন তাঁর নতুন রাজধানী।

এবার দেবর্ষি নারদ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের উপদেশ দিলেন রাজাকে। যজ্ঞ সমাপন করলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। এরপর সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণদের মুক্ত-হস্তে দান করতে উপদেশ দিলেন নারদ। রাজা দান করলেন আনন্দিত মনে। কোটি কোটি গো-দান করলেন তিনি। ফলে যজ্ঞক্ষেত্রে গো-ক্ষুরের দ্বারা সৃষ্টি হলো গর্ত। একই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের জলদান কালে পড়ে যাওয়া জলে পূর্ণ হলো গর্ত। পরিণত হলো সরোবরে—তীর্থরূপে। রাজার নামেই সরোবরের নাম হলো—ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
এরপর একদা সমুদ্র তীরে (চক্রতীর্থে) ভেসে এলো একটি বৃক্ষ। জগন্নাথদেবের আদেশে সেই বৃক্ষ (দারু) দিয়ে নির্মিত হলো দারুময় ব্রহ্ম—জগন্নাথ। কালক্রমে দর্শন দিলেন জগন্নাথ—ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নকে। দিব্যমূর্তি দর্শন করে রাজা নিমজ্জিত হলেন আনন্দ সাগরে।

রিক্সা চললো। সামান্য পথ। এখানে দর্শনীয় স্থানগুলি একটি থেকে আর একটির দূরত্ব খুব বেশী নয়। এলাম মার্কেণ্ডেয় সরোবরে।
চারদিক বাঁধানো সরোবর। গাঢ় সবুজ জল। সরোবরের পাশেই মার্কেণ্ডেয় শিব-মন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম মন্দিরের গর্ভগৃহে। প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন পূজারী। অল্প আলো। তবুও পরিষ্কার দেখা যায় সবই। এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শিবলিঙ্গ। লক্ষ্য করলাম, এটি সাধারণ শিবলিঙ্গের মতো নয়। প্রধানত মসৃণই হয় শিবলিঙ্গ। কিন্তু এখানকার শিবলিঙ্গটি একেবারে ফাটা ফাটা।
এই ফাটা শিবলিঙ্গের কারণ বর্ণিত আছে উৎকল-খণ্ডে। ঋষি মার্কেণ্ডেয় ছিলেন মৃকণ্ড ঋষির পুত্র। অতি অল্প আয়ু ছিল মার্কেণ্ডেয়র। তাই দীর্ঘায়ু কামনায় তপস্যা সুরু করলেন ভগবান বিষ্ণুর—এই জগন্নাথক্ষেত্রে। তপস্যায় প্রসন্ন হলেন বিষ্ণু। আদেশ দিলেন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের উপাসনা করতে। আয়ু দান করতে পারেন একমাত্র মহাদেব। আনন্দিত-চিত্তে নিত্য উপাসনায় নিরত হলেন ঋষি।
এক সময় নির্ধারিত আয়ু শেষ হলো মার্কেণ্ডেয়র। উপাসনাস্থলে হাজির হলেন স্বয়ং যমরাজ। তখন উপাস্যের ধ্যানে আত্মমগ্ন রয়েছেন ঋষি। হঠাৎ যমরাজের বিভৎস ও ভয়ংকর রূপ দেখে ভীত হয়ে পড়লেন তিনি। মৃত্যু ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর আরাধিত শিবলিঙ্গকে। ভক্তকে রক্ষা করতে এলেন ভগবান। তৎক্ষণাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করে আবির্ভূত হলেন মৃত্যুঞ্জয় শিব। রক্ষা করলেন মার্কেণ্ডেয়কে। বর দিলেন ইচ্ছামৃত্যুর। ঋষির দেহের উপর আর কোন অধিকার রইলো না যমরাজের। ফলে ফিরে গেলেন তিনি।
শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করে মৃত্যুঞ্জয় আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই লিঙ্গটি ফাটা ফাটা। এই বিদীর্ণতা আজও তাঁর আবির্ভাবের সত্যতা নির্দেশ করে। আর মার্কেণ্ডেয় আরাধিত শিব, তাই নাম হয়েছে—মার্কেণ্ডেয় শিব।
ভগবান বিষ্ণুর তপস্যা এবং বরলাভের পর একটি খাত খনন করেন ঋষি মার্কেণ্ডেয়।

তারপর আত্মনিয়োগ করেছিলেন মহাদেবের তপস্যায়। এই খাতই মার্কেণ্ডেয় সরোবর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রবাদ আছে, মহাপ্রলয় কালেও এই সরোবরের অস্তিত্ব ছিল। সেই সময় অসংখ্য পবিত্র নদীর জল মিলিত হয় এই সরোবরে। তাই এখানে স্নান এবং শিবলিঙ্গ দর্শন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। প্রতিবছর বারুণীর স্নান উপলক্ষ্যে মেলা বসে এখানে। অসংখ্য তীর্থযাত্রীদের সমাগম হয় এই সরোবরে। শ্রীক্ষেত্রে পঞ্চতীর্থ—তার মধ্যে মার্কেণ্ডেয় সরোবরও একটি।

এবার রিক্সা সোজা চলে এলো পুরী স্টেশনের পাশ দিয়ে। থামলো এসে সমুদ্র তীরে—চক্রতীর্থে।

রাস্তার পাশেই চক্রনারায়ণ মন্দির। উত্তরমুখী এই মন্দিরের পিছনেই সমুদ্র। অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় মন্দিরে। ছোট্ট মন্দির। চতুর্ভুজ বিষ্ণু আর দেবী লক্ষ্মীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে মন্দিরে। পূজারী বললেন, এটি জগন্নাথদেবের শ্বশুরবাড়ী।

অনেক ঘরের বউ আছেন—যাঁরা বাপের বাড়ী বলতে অজ্ঞান। এককালে বাপ জমিদার ছিল। পাঁচশো বিঘে জমি ছিল। পাঁচশো পিস্ গরু ছিল। বিয়ের আগে দুধপুকুরে সাঁতার কাটতাম। এখন তোমার পাল্লায় পড়ে জীবন শেষ। জগন্নাথদেবের বউ এমন কথা বলেন কি-না জানা নেই। তবে তাঁর বাপের বাড়ীর অবস্থাটা যে কোন কালেই ভালো ছিল না—তা আজকের মন্দিরটা দেখলেই বোঝা যায়। গালগল্প যতই করুক—জগন্নাথের মতো জামাই পেয়েছিল বলে শ্বশুর-মেয়ে দুজনেই উতরে গেছে। নইলে অনেক দুঃখ ছিল কপালে। এর চেয়ে মাসির বাড়ীর অবস্থাটা অনেক ভালো। এখন জমি বিক্রি করলে মাসি হয়তো কাঠা প্রতি কয়েক লাখ টাকা পেয়ে যাবেন।

এই মন্দিরের পিছনেই বিস্তৃত বালুচর। তার উপর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে—এলাম চক্রতীর্থে। এটিও পঞ্চতীর্থের একটি। কথিত আছে, একদা সমুদ্র সৈকতের এই ক্ষেত্রটিতে ভেসে আসে কিছু শঙ্খ ও চক্রচিহ্নিত দারু। এই দারু দিয়েই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথম নির্মাণ করেন দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের মূর্তি। দারুগুলি চক্রচিহ্নিত হওয়ায় স্থানের নাম হয়েছে চক্রতীর্থ।

এই তীর্থে বালুরাশির মধ্যে রয়েছে একটি কুণ্ড। উন্মুক্ত আকাশের নীচে। আরও একটি কুণ্ড আছে এখানে—একটি মন্দির-মধ্যে। বারো মাসই এতে জল পূর্ণ থাকে। চারদিক বাঁধানো কুণ্ড। পাথরে খোদিত একটি সুদর্শনচক্র আছে তার মধ্যে। প্রতিদিন এটি এবং লক্ষ্মী-নৃসিংহ বিগ্রহ পূজিত হয় এখানে।

এই তীর্থ প্রসঙ্গে প্রচলিত আছে একটি পৌরাণিক কাহিনী। গজ কচ্ছপের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এখানে। একদা বন্ধুবেশী কচ্ছপের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ সংশয় হয় গজের। তখন নারায়ণের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় গজ। সুদর্শনচক্র পাঠালেন নারায়ণ। সেই চক্রে দ্বিখণ্ডিত হলো কচ্ছপ। প্রাণরক্ষা পেল গজের।

অনেকের ধারণা, নারায়ণের চক্রের আগমন কারণে এই তীর্থের নাম হয়েছে চক্রতীর্থ। এখানকার মন্দিরেও আছে গজ কচ্ছপের মূর্তি। তবে কচ্ছপটির আকৃতি হাঙরের মতো।

বালুচরের উপর দিয়ে আবার ফিরে এলাম রাস্তায়। একটু এগোতেই সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির। উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। বেশ বড় মন্দির। তোরণদ্বার পার হয়ে এলাম বিস্তৃত মন্দির চত্বরে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি। উঠলেই মূল মন্দির। ভিতরে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ—সম্পূর্ণ সোনার। অপূর্ব মহিমময় সুদর্শন মূর্তি। মাথায় সোনার ছাতা। পাশেই রয়েছে বাল-গোপালের মূর্তি। এই গৌরাঙ্গ মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৩২২ সনের ৬ই চৈত্র। নির্মাণ করেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কিশোরানন্দ স্বামী।

গৌরাঙ্গ মন্দির থেকে কাছেই—একই পথে পড়লো আরও একটি সুন্দর মন্দির। এখানে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিটি মহাবীরের। সমুদ্র অর্থাৎ 'দরিয়া' তীরে বলেই হয়তো মহাবীরের নাম হয়েছে—দরিয়া মহাবীর। আরও একটি নাম—বেড়ি হনুমান। আদরে হনুমানের আরও কোন নাম হয়তো যোগ হতো—সীতা বেঁচে থাকলে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় তিন ঘণ্টা। দরিয়া মহাবীর মন্দিরেই শেষ হলো রিক্সা ভ্রমণপর্ব। এখান থেকে সোজা চলে এলো রিক্সা—স্বর্গদ্বারে। যেখান থেকে উঠেছিলাম—সেখানে।

এবার তিনটি দর্শনীয় স্থানের কথা বলি—যেখানে সাধারণ তীর্থযাত্রী এবং ভ্রমণকারীদের অনেকেই যান না। অনেকের জানাও নেই। রিক্সা ছাড়া যাওয়া যাবে না। আলাদা ভাড়া। পুরী টাউন থেকে একটু বাইরে।

একটা রিক্সা ভাড়া করলাম। চললো তোটা গোপীনাথ মন্দিরের দিকে। পথের অবস্থাটা তত ভালো নয়—উঁচুনীচু। মাঝে মাঝেই রিক্সাচালক নেমে টেনে নিয়ে চলেছে রিক্সা—আবার কখনও পায়ে চালিয়ে। তোটা গোপীনাথ মন্দিরকে বাঁয়ে রেখে—বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে এলাম—যমেশ্বর শিবমন্দির।

মন্দিরটি বহুকালের প্রাচীন। প্রায় দোতলা সমান নীচে। সম্পূর্ণ মন্দিরটি যেন মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করা হয়েছে। উপর থেকে দেখলে মনে হয় গভীর খাদের মধ্যে। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম নীচে।

মূল মন্দিরের প্রবেশ-মুখেই বিষ্ণুর বাহন গড়ুড় এবং শিবের বাহন বৃষমূর্তি। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে জগন্নাথদেবের দ্বারপাল—পঞ্চশিব। যমেশ্বর শিব আছে মন্দিরের গর্ভগৃহে—পঞ্চশিবের একটি। হরিহর মূর্তিতে পূজিত হন যমেশ্বর। মুক্তিশ্বর—আরও একটি নাম এই যমেশ্বর শিবের। প্রবাদ আছে, শ্রীক্ষেত্রে কারও মৃত্যু হলে যমের এক্তিয়ারভুক্ত হন না তিনি। মুক্তিশ্বরই তাঁকে মুক্তি দিয়ে থাকেন জগন্নাথদেবের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। শিব এখানে যমেশ্বর

নামে প্রতিষ্ঠিত। যমনিক তীর্থ নামেও এর পরিচিতি আছে।

এখান থেকে রিক্সা এগিয়ে চললো লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে। দুপাশেই পাকা বাড়ী। ছোট ছোট দোকান। লোকালয় শেষ হলো কিছুক্ষণ চলার পর। পাকা রাস্তা ছেড়ে রিক্সা ধরলো কাঁচা রাস্তা। চারদিকে ধু-ধু করছে বালি। পথের দুধারে ঝাউবন আর কাজুবাদামের গাছ। জায়গাটা বেশ নির্জন। প্রাকৃতিক পরিবেশ বড়ই মনোরম। তার মধ্যে দিয়েই চলেছি। একেবারে কাঁচা রাস্তা। তাই কখনও রিক্সা থেকে নেমে হাতে টেনে, আবার কখনও পায়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রিক্সাচালক। এইভাবে স্বর্গদ্বার থেকে যমেশ্বর হয়ে এলাম প্রায় ৩ কি. মি.। রিক্সা থামলো।

সামনেই বালিয়াড়ীর ঢিবি। ঢিবিতে ওঠার মুখেই বড় একটা তোরণ। তার উপরে লেখা—অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম। গির্ণারীবস্ত।

বেশ চওড়া সিঁড়ি। দুপাশে ঝাউবন। পাহাড় যেমন দেখতে লাগে—তেমন। ধীরে ধীরে উঠলাম উপরে। সিঁড়ির শেষেই প্রশস্ত চত্বর। বাঁ-পাশে নাঙ্গাবাবার সমাধি মন্দির। ডানপাশে ছোট্ট অনাড়ম্বর আশ্রম।

একদা এই আশ্রমেই বাস করতেন জটাজুটধারী আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ নাঙ্গাবাবা। অদ্বৈত বেদান্তবাদী নাঙ্গাবাবা ছিলেন নির্লিপ্ত কঠোরতপা সন্ন্যাসী। প্রায় আড়াইশো বছর জীবিত ছিলেন তিনি। তার মধ্যে জীবনের শেষ পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী সময় কাটিয়েছেন পুরীতে। সময় কেটেছে শ্মশান, সমুদ্র সৈকত আর গির্ণারীবস্তের এই আশ্রমে। সর্বদাই তিনি থাকতেন দিগম্বর হয়ে। তাই নাম হয়েছে নাঙ্গা বা নেংটা বাবা। জগন্নাথক্ষেত্রে তিনি নেংটাবাবা নামেই পরিচিত ছিলেন। রিক্সাচালকরা একবাক্যে চেনে, নাঙ্গা নয়—নেংটাবাবা নামে।

নাঙ্গাবাবার স্মৃতিধন্য গির্ণারীবস্তের এই আশ্রম। এখানে তাঁর ব্যবহৃত খড়ম, পা-পোষ, কমণ্ডলু আছে আজও। দীর্ঘকাল ধরে যে বাঘছালের আসনটিতে বসে তপস্যা করেছিলেন—সেটিও সযত্নে রক্ষিত আছে এখানে। দর্শন তো করা যায়ই—স্পর্শেও কোন বাধা নিষেধ নেই। আলাদা একটি শয্যায় বসানো আছে নাঙ্গা বাবার বড় একটি বাঁধানো ছবি। এখানে এসে মনে পড়ে গেল তৈলঙ্গস্বামীর কথা। বেনারসে স্বামীজীর ব্যবহৃত এমন অনেক জিনিসই আছে—যা দেখার মতো। অথচ অনেকেই যান না সেখানে।

আশ্রমের পাশেই মূল সমাধি মন্দির। প্রবেশ মুখে দরজার উপরেই লেখা আছে—'শ্রীশ্রীদিগম্বর পরমহংস'। ভিতরে শ্বেতপাথরের বাঁধানো বেদী। তাতে স্থাপিত হয়েছে শিল্পীর নিপুণ হাতে গড়া নাঙ্গাবাবার দিগম্বর মূর্তি। এটিও ধবধবে সাদা পাথরের। বেশ বড়। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। ফুল দিয়ে সাজানো বেদী। এমন সাজানো থাকে সর্বদাই—প্রতিদিন।

এই সমাধি মন্দিরের পিছনেই রয়েছে বারান্দা। এসে দাঁড়ালাম। যতদূর দেখা চোখ যায়—চারদিকে শুধু বালি আর বালি। তারই মধ্যে দিগন্ত বিস্তৃত গভীর

বনভূমি। ঝাউবনের মেলা। কোন লোক বসতি নেই—নেই কোলাহল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—অপূর্ব। মন কিছুতেই আসতে চায় না এই নাঙ্গাবাবার আশ্রম ছেড়ে। এখানে বসেই শোনা যায় সমুদ্রের অবিরাম গর্জন। আশ্রমের পরিবেশটি যেন প্রাচীন ঋষিদের তপোভূমি।

এমন একটি আশ্রমের খবর রাখেন না অনেকেই। ফলে যাত্রী সমাগম নিতান্তই কম। পুরী ভ্রমণ সার্থক হবে না—এখানে না এলে।

তোতাপুরী নামধারী এই নাঙ্গাবাবাই ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দীক্ষাগুরু। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের কথা। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে তোতাপুরী মহারাজের সাক্ষাৎ ঘটে দক্ষিণেশ্বরে।

একদা কলকাতাব এক বিশিষ্ট ভক্ত এলেন গির্ণারীবস্তের আশ্রমে। কথায কথায় এক সময় প্রশ্ন কবেন মহাবেদান্তী নাঙ্গাবাবার কাছে,

—বাবা, আপনিই কি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন ?

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন মহাপুরুষ,

—'ঐছা তো অওর্ গৃহস্থকো ম্যায় দীক্ষা দিয়া হ্যায়। লেকিন সন্ন্যাস কিস্‌কো দিয়া বাতাও।'

শিবকল্প মহাপুরুষ এই নাঙ্গাবাবা। প্রায় দুশো বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন আসমুদ্র হিমাচলের বিভিন্ন প্রান্তে। শেষ জীবনটা কাটিয়েছিলেন এই পুরী তীর্থে—জগন্নাথের কোলে।

১৯৬১ সালের ২৮শে আগস্ট। মর্ত্যলীলার অবসান ঘটলো দিগম্বর বাবার। তীর্থ পুরীর এই নিভৃত কোণে—মহাসমাধি লাভ করলেন গির্ণারীবস্তের বালিয়াড়ীর চূড়ায়। তপোবন ভারতবর্ষ চিরতরে হারালো তার তপোবনের এক মহাতপস্বীকে—আত্মজ্ঞানের আলোকস্তম্ভ নাঙ্গাবাবাকে।

এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল রিক্সাচালক। আবার এসে বসলাম। কাঁচা রাস্তা ছেড়ে এলো পাকা রাস্তায়। মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পৌঁছালাম লোকনাথ মন্দিরের কাছে।

স্নিগ্ধ ছায়া ঘেরা বাঁধানো পথ। এগিয়ে গেছে মন্দিরের দিকে। শান্ত পরিবেশ। বিশাল বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। বিশাল বিশাল অশ্বত্থ আর তেঁতুলগাছ দাঁড়িয়ে আছে প্রাঙ্গণে। কিছুটা এগোতেই সিংহদ্বার। এখান থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম। সামনেই ডান পাশে ছোট্ট একটি মন্দির—দেবী শীতলার। এর পাশেই একটি বড় কুণ্ড—শিবপার্বতী সরোবর।

এবার প্রবেশ করলাম মূল মন্দির চত্বরে। ডানপাশেই লোকনাথ মহাদেবের বাহন—বিশাল পাথরের একটি বৃষমূর্তি। আরও একটু এগিয়ে গেলাম মূল-মন্দিরে। প্রদীপ আর মোমবাতির আলো জ্বলছে ভিতরে আবছা অন্ধকার। বাইরে বিদ্যুতের আলো আছে—ভিতরে নেই। গর্ভমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ—লোকনাথ।

জগন্নাথদেবের দ্বারপাল পঞ্চশিব। তার মধ্যে যমেশ্বরের মতো লোকনাথও একটি। এই মন্দিরে লোকনাথ মহাদেবকে দর্শন করা যায় না। গর্ভগৃহে ফুল বেলপাতা আর জলে নিমজ্জিত থাকেন লোকনাথ। প্রতিবছরে একদিন—শিবরাত্রিতে পরিষ্কার করা হয় এই মন্দির। শিবরাত্রি ছাড়া প্রতিদিন পূজা করা হয় লোকনাথের প্রতিনিধি মূর্তি। এটি থাকে গর্ভমন্দিরের প্রবেশ মুখে। দর্শন করতে হয় দরজার কাছ থেকে। ভিতরে যাওয়া যায় না।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মেলা বসে এখানে। চলে কয়েকদিন ধরে। অগণিত তীর্থযাত্রীতে ভরে ওঠে মন্দিরের কাছে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠেন যাত্রীরা—আনন্দিত হন স্বয়ং লোকনাথও।

প্রবাদ আছে, ত্রেতাযুগ থেকে এখানে প্রতিষ্ঠিত আছেন মহাদেব—লোকনাথ। অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্র এর প্রতিষ্ঠাতা।

বনবাসী রাম চলেছেন সীতাকে উদ্ধার করতে—লঙ্কাভিমুখে। নীলাচলের এই পথে বনমধ্যে উপস্থিত হলেন তিনি। নিত্য শিবপূজা করেন রামচন্দ্র। কিন্তু একটি শিবলিঙ্গও দেখতে পেলেন না কোথাও। সেই সময় শবর নামে এক জাতির বাস ছিল নীলাচলের এই বনে। তাদের কাছে শিবলিঙ্গের খোঁজ করলেন রাম। তারা একটি লাউ দিলেন পূজার উদ্দেশ্যে। সেটি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করলেন তিনি। লাউকে শিবজ্ঞানে পূজা করেছিলেন—তাই লাউকনাথ থেকে মহাদেব পরিবর্তিত হলেন লোকনাথে। এ-সব কথাগুলি বললেন মন্দিরের পূজারী।

যমেশ্বর, নেংটাবাবার আশ্রম আর লোকনাথ—এ-গুলো সব ঘুরে দেখতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। রিক্সা আবার ফিরে এলো স্বর্গদ্বারে—যথাস্থানে।

সাধুসঙ্গ—সংসার জীবনে সুখের পথ

যখন কোথাও ভ্রমণে যাই, তখন সঙ্গী থাকে অনেক ভ্রমণেই। যখন সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজ করি বা সাধুসঙ্গ করি—তখন কোন সঙ্গীকেই নিই না সঙ্গে। কারণ ওদের ধৈর্য কম। তাড়া দিতে থাকে। কথা বলা যায় না। উদ্দেশ্যটাও নষ্ট হয় আমার। তাই সঙ্গী নিই না। বেরিয়েছি একা।

আজ থেকে বছর একুশ আগের কথা। ফিরছি নাঙ্গাবাবার আশ্রম থেকে। আসার পথে পড়ে লোকনাথ মন্দির। এই মন্দিরে যাওয়ার পথের দুধারেই রয়েছে বিশাল বিশাল অশ্বত্থ আর তেঁতুল গাছ। অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশ বাগানের পরিবেশ। মন্দিরের একটু আগেই—একটা অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় দেখি জনা-দশেক নারী-পুরুষ বসে আছে। বিভিন্ন বয়েসের। বসে আছে সব এক সাধুবাবাকে ঘিরে। সাধুবাবাও বসে আছেন গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে। লক্ষ্য করলাম দূর থেকেই। বুঝলাম, ওখানে একটা কিছু ব্যাপার আছে।

রিক্সা ছেড়ে দিলাম—ভাড়া মিটিয়ে।

কৌতূহল আমার আছে। আজ না—বরাবরই। তাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। অনেকটা কাছাকাছি হলাম ওদের। উপস্থিত সকলেই তাকালেন আমার মুখের দিকে। কেউ কোন কথা বললেন না। তবে সকলেই যে একটু বিরক্ত হলেন—মুখের ভাব দেখেই তা বুঝলাম। আরও বুঝলাম, অনেকক্ষণ ধরেই কথা হচ্ছে ওদের। আমার উপস্থিতিতে চুপ করে গেলেন সাধুবাবা।

সাধু আমি বহু দেখেছি—তবে এমন সাধু এই প্রথম। পরনের কাপড়টা একেবারে শতছিন্ন। হাঁটু পর্যন্ত। নোংরা আর কাকে বলে! এতো নোংরা—উদাহরণেও আনা যায় না। গালভর্তি কাঁচায় পাকায় দাড়ি। খোঁচা খোঁচা অথচ বড়। দাড়ি বড় অথচ খোঁচা খোঁচা—এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, একেবারেই এলোমেলো। ঝোড়ো কাকের বাসা যেন। চুলগুলোও ময়লাতে জটা জটা লাগছে। গায়ের রঙও ময়লা। একে ময়লা, তার উপর দীর্ঘকাল স্নান করেনি। ফলে দশাটা দেহের যেমন হয়—তেমনই। গায়ে গলায় কিছুই নেই। একটা মালা পর্যন্ত নয়। কপালে তিলক টিলকও কিছু নেই। পাশেই একটা পোঁটলা। কাঁধে ঝোলানোর কোন ব্যবস্থা নেই। মনে হয় বগলদাবা করে নিয়েই পথ চলতে হয়। দেখলে পাগল কিংবা একেবারেই না খাওয়া ভিখারী ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। অন্তত অন্যে তাই ভাববে। সাধুবাবার ভাবে বুঝলাম, এসব কথা তাঁর ভাবার অবকাশ নেই। সাধু ভেবে শ্রদ্ধা তো দূরের কথা—কথা বলারও প্রবৃত্তি হবে না কারও। তবুও সকলের পাশ কাটিয়ে গিয়ে প্রণাম করলাম। দাঁড়ালাম সাধুবাবার বাঁ-পাশে।

একবার মুখের দিকে তাকালেন সাধুবাবা। তারপর বসতে বললেন ইসারায়। এই তাকানোতেই সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল আমার। চোখ আমি বহু সাধুরই দেখেছি। তবে এমন চোখ দেখলাম এই প্রথম। ভিতর থেকে যেন বিদ্যুতের আলো ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে। তাকানো যায় না চোখের দিকে। দেহের বিষয় যাইহোক—চোখদুটো দেখেই বুঝলাম, এ-সাধুবাবা উচ্চমার্গের কোন সাধু হবেন।

বসলাম, সাধুবাবার ইসারাতেই বসলাম। মাটিতে, আর সকলে যেমন বসে আছে। এখনও একটা কথাও শুনিনি সাধুবাবার। তাই বুঝতে পারছি না কোন্ ভাষাভাষীর লোক। আমার আসাতে এখানকার পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম হয়েছিল। সাধুবাবা বসতে বলায় আবার আগের অবস্থাটাই ফিরে এলো—ধীরে ধীরে। রাজা সরাসরি কাউকে গ্রহণ করলে পার্ষদদের কিছু বলার থাকে না। এখানেও ঠিক তাই হলো।

একটা কথাও বললাম না। সাধুবাবাকে ঘিরে রয়েছে যারা—তাদের চেহারা দেখেই বুঝলাম, প্রত্যেকেই ওড়িষাবাসী। ছ-জন মহিলা—পুরুষ চারজন। এদের পোশাক দেখে মনে হলো—বেশ দরিদ্র। ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতেই এক মহিলা বললেন,

—বাবা, আমার কথাটার উত্তর দিলেন না ?
আনমনা হয়েই সাধুবাবা বললেন,
—কি যেন বলছিলি ?
এবার কথাতেই বুঝলাম, সাধুবাবা হিন্দিভাষী। ওই মহিলা বললেন,
—ওই যে বললাম, প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখি। কখনও ভূতপ্রেত, কখনও ভয়ের। আবার কখনও দেখি আজেবাজে স্বপ্ন—যার মাথা মুণ্ডু নেই। ভীষণ ভয় পাই। দয়া করে এমন একটা কিছু দিন—যাতে ও-সব বন্ধ হয়ে যায়।
এক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলেন সাধুবাবা। বসলেন সোজা হয়ে। কোন কথা না বলে সকলকে দেখছি—দেখছি সাধুবাবাকেও। আমার উপস্থিতিতে প্রাথমিক অস্বস্তিটা কেটে গেছে ইতিমধ্যেই। তিনি বললেন,
—রবি আর বৃহস্পতিবার বাদ দিবি। সকাল থেকে বেলা বারোটার মধ্যে একটা তুলসীপাতা তুলবি। বোঁটা সমেত। বাড়ীতে গাছ না থাকলে কেনা তুলসীপাতা হলেও চলবে। এবার তুই যে বালিশে মাথা রেখে ঘুমাস—সেই বালিশের ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিবি। একদিনই রাখবি। ব্যস, ধীরে ধীরে দেখবি কুস্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে যাবে। খেয়াল করবি, পাতাটা যেন ভিতর থেকে বেরিয়ে না পড়ে যায়। প্রতিদিন বিছানায় শুধু গঙ্গার জল ছিটিয়ে ঘুমালেও ওই একই ফল হবে। এখানে তো আর গঙ্গাজল পাবি না—ওটাই করিস।
এইটুকু বলে সাধুবাবা আবার হেলান দিলেন গাছের গোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ওদেরই আর একজন—পরনে ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড়—ভদ্রলোক বললেন,
—বাবা, সংসারে আমার অভাব অনটন আর বাচ্চা বউ-এর রোগভোগ লেগেই আছে। দয়া করে আমায় এমন কিছু দিন—যাতে এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাই।
এ-কথা শোনামাত্রই সাধুবাবার মুখমণ্ডলটা যেন দয়ায় ভরে উঠলো। মনেই হলো, অন্তরে যেন ব্যথার সৃষ্টি হলো সাধুবাবার। করুণাঘন কণ্ঠে তিনি বললেন,
—আমি তো নিজেই ফকির রে—একেবারেই ভিখিরী। দেবার মতো আমার কিছুই নেই। তোদের মতো যারা—তাদের দয়াতেই তো প্রাণটা আমার আছে। তোরাই তো আমার দেবতা। তোদের কি দিই বলতো ?
এ-কথায় দুচোখ জলে ভরে উঠলো গ্রাম্য ভদ্রলোকটির। সাধুবাবার পা-দুটো ধরে বললেন,
—না বাবা, কোন কথাই শুনবো না আমি। একটা কিছু দিতেই হবে। নইলে আমি আর বাঁচবো না। সংসারটা আমার শেষ হয়ে যাবে। কিছু একটা করে না দিলে আমি কিছুতেই পা ছাড়বো না।
বলে চুপ করে বসে রইলেন পা-দুটো ধরে। কাটলো কিছুটা সময়। আবার সোজা হয়ে বসলেন সাধুবাবা। বুঝলাম, আজকের এই সাধুসঙ্গে জানতে পারবো

অনেক কথাই। ভিতরে ভিতরে আনন্দিন হয়ে উঠলাম। খুশীতে ভরে উঠলো মনটা। উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা বিড়ি বের করে বললাম,
—একটা বিড়ি খাবেন বাবা?
বিড়ির কথায় প্রশ্নকারীর মুখটা কেমন যেন অস্বস্তিতে ভরে গেল। কোন কথা বললেন না সাধুবাবা। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। মুখটা দেখে মনে হলো—খুব খুশী। ধরিয়ে দিলাম। বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন,
—খুব জ্ঞানী ছিলেন আমার গুরুজী। এখন আর দেহে নেই। অনেক শাস্ত্র পড়াশুনা করেছিলেন তিনি। আমি নিজে 'পড়া লিখা' কিছুই জানি না। শাস্ত্রের কথা আর ভগবানের নাম ছাড়া তাঁর মুখে অন্য কোন কথাই ছিল না। এখন তোদের যে সব কথা বলবো—এ-সব তাঁর মুখ থেকেই আমার শোনা। অনেক কথা। কিছু বলবো তোদের। তোরা যদি মেনে চলতে পারিস্—তাহলে সংসারে আর যাই হোক—মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যাবে জীবনটা। এতে তোদের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কিছু হবে না।
এই পর্যন্ত বলে একটা টান দিলেন বিড়িতে। এতক্ষণ পর আমাকে উদ্দেশ্য করে সাধুবাবা বললেন,
—বেটা, তুই থাকিস্ কোথায়?
মুখে হাসির একটা প্রলেপ টেনে বললাম,
—থাকি কলকাতায়। এখানে এসেছি জগন্নাথ-দর্শনে। এখন নাঙ্গাবাবার সমাধি মন্দির দর্শন করে এসেছিলাম লোকনাথ দর্শনে। আপনাকে দেখতে পেয়ে এখানে এলাম।
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কথাটা শুনে। কিছুতেই পারলাম না সাধুবাবার দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টিকে স্থির রাখতে। চোখ নামিয়ে নিলাম। আর কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি। উপস্থিত সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন এক নজর। তারপর শুরু করলেন আবার,
—শোন্, প্রতিদিন সকালে উঠে স্নানটা সেরে নিবি। হাজার কাজ থাকলেও এটা করবি আগে। এতে অলক্ষ্মী, অশুভ আত্মা আর প্রেত-পিশাচের দৃষ্টি পড়ে না দেহে। পড়লেও তা মুছে যায়। খারাপ চিন্তা, কু-স্বপ্নও মুছে যায় মন থেকে। যত অভাবেই থাকিস্ না কেন—চেয়েচিন্তে হলেও সাধু আর ভিখারীকে কিছু ভিক্ষে দিবি। এতে কল্যাণ হবে সংসারের। সাধু না পেলে ভিখারীকেই দিবি—তাতেই কাজ হবে।
বিড়িটা নিভে গেছে সাধুবাবার। ফেলে দিয়ে বললেন,
—যখন কোন কথা বলবি—তখন হাত পা নাড়িয়ে বলবি না। প্রয়োজনের বেশী এতটুকুও খাবি না। এ-গুলো করলে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে। সংসারে অভাব বাড়ে। যে কোন খাবার যত খারাপই হোক—মুখে রাস্না ভালো না লাগুক—সেই খাবারের নিন্দা করবি না কখনও। ভালো না লাগলে খাবি না। কিন্তু

না নিরামিষাশী ?

কথাটা শুনেই হাসলেন। বিরক্ত হলেন না। বললেন,

—খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছিস্। তবে শোন বেটা, জগৎ সংসারটা তিনিই সৃষ্টি করেছেন—যেন সাজানো বাগান। তাঁর সৃষ্ট বাগানের ফল তিনিই গ্রহণ করেন। দানও করেন তিনিই। উপলক্ষ্য বা মাধ্যম—মানুষ। সুতরাং পরমেশ্বরের কাছে আমিষের কোন প্রশ্ন নেই—নিরামিষেরও নয়। তিনি আপেল আঙুরের সৃষ্টি-কর্তা—ছাগ মেষেরও।

কণ্ঠে এবার দৃঢ়তার সুর ফুটে উঠলো সাধুবাবার,

—সংকল্প যদি সৎ আর একান্তভাবে ঐকান্তিক হয়—একই সঙ্গে সংকল্প যদি ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন না করে—তাঁর বিবেচনাধীনে—কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে বলিদানের প্রার্থনা করলে তা পূরণ হয়ই। শাস্ত্রে বলিদানের কথা বলা হয়েছে। গুরুজী বলেছেন, সংকল্প করে আরাধ্য দেব দেবীর তুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য বা উৎসর্গীকৃত বস্তুর নামই বলি। বলিদানের উপাসনাটাই সকাম উপাসনা।

বেটা, শক্তি উপাসনায় অনেকের বংশানুক্রমিক বলির প্রথা প্রচলিত আছে। আবার অনেকে বলি দেয় মানসিক করে। চার প্রকার বলির মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা এবং কার্যসিদ্ধির প্রার্থনা করা হয়।

যেমন, নৈবেদ্যদান, পুজোপহার, প্রাণীবধ এবং যেকোন মহৎকার্যে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ। প্রাণীদের মধ্যে ছাগ-বধকেই বলি বলে। হরিণ উট হস্তিশাবক ইত্যাদি বধকে মহাবলি—আর অতিবলি বলে নরবলিকে।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—অনেক ক্ষেত্রে দেখি, মহিষ, ভেড়া, পায়রা, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি বলি দেয়—সেগুলোকে কি বলে ?

ঘাড় নেড়েও মুখে বললেন,

—হাঁ বেটা, এ-গুলোও দেয়া হয়—ভক্ত বা উপাসকের ইচ্ছানুক্রমে। তবে প্রাণীবধে অনেকের মন চায় না। অথচ উপাসনা তাদের সকাম। তাই তারা বলি দেয় শশা, চালকুমড়ো, আখ, ক্ষীরের পাঁঠা—এমন অনেক কিছু। তাহলে বুঝতেই পারছিস্, ভগবানের কাছে আমিষ নিরামিষ ব্যাপারটা একই। আসলে দেবদেবীর তুষ্টি-বিধানই বলির উদ্দেশ্য।

যেমন, পুরাণের কথা গুরুজীর মুখে শুনেছি—মহিষ বলিতে দেবী তুষ্টা থাকেন একশো বছর। অন্যান্য বলির মধ্যে হরিণজাতীয় প্রাণী, উট, ছাগ ইত্যাদি বলিতে দশবছর—ভেড়া, পাখি, চালকুমড়ো বলিতে দেবী প্রসন্না থাকেন একবছর পর্যন্ত। আর প্রাণীর বিকল্পে ক্ষীরজাতীয় কোন দ্রব্যের দ্বারা তৈরী কৃত্রিম পশু—এতে ছ-মাস এবং আতপ চাল আর ফুল-ফলাদি নিবেদনে দেবী তুষ্ট থাকেন একমাস পর্যন্ত—সাধক বা উপাসকের প্রতি। তবে বেটা, বলির মধ্যে ভগবান বা যে কোন

মহৎকার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদনই হলো সর্বোৎকৃষ্ট বলি।

সাধুসঙ্গের সময় কোন সাধুর কাছেই রুটিনমাফিক কোন প্রশ্নই করিনি কখনও। এ-তো আর ইস্কুলের পড়া নয়। যখন যেখানে যে প্রশ্ন মনে এসেছে—তাই-ই জিজ্ঞাসা করেছি। কোন নিয়মে নয়। এবার প্রশ্ন করলাম প্রসঙ্গ পাল্টে,

—বাবা, সাধুজীবনের এতোগুলো বছর তো পার হয়ে এলেন। অনেক পথও চললেন। এই চলার পথে কি কোন বড় বিপদে পড়েছিলেন কখনও?

একটু ভেবে নিয়েই বললেন,

—না বেটা, বড় কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা জ্ঞানত আমার জীবনে ঘটেনি কখনও। তবে বহুকাল আগের কথা। তখন একের পর এক তীর্থে ঘুরতাম গুরুজীর সঙ্গেই। সেই-বারই প্রথম গেছিলাম বদরীনারায়ণে। এখনকার মতো তো আর নয়—তখন ছিল হাঁটা-পথ। বয়েসও ছিল কম। অনেক পথ-কষ্ট সহ্য করে তো পৌঁছালাম বদরীনারায়ণে—গুরুজীর সঙ্গে। দু-দিন থাকার পর হঠাৎ লেগে গেল ঠাণ্ডা। কফ্ বসে গেলে বুকে। শেষে অবস্থা এমন হলো যে, প্রাণ আমার যায় আর কি! গুরুজীর দিনরাতের অক্লান্ত সেবা আর জড়িবুটি চললো কয়েকদিন ধরে। তারপর আরোগ্য হলাম ধীরে ধীরে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আর কিছু হয়নি। ওই সময় আরও একটা অভিজ্ঞতা হলো আমার। গুরুর সেবা করে শিষ্য। এই নিয়মই প্রচলিত আছে সমাজে। কিন্তু শিষ্যকে গুরুজীর সেবা যে কি—তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমার বিশ্বাস, গৃহী মা বাবাও বোধ হয় এমনভাবে সেবা করতে পারেনা তার অসুস্থ সন্তানকে।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—সারা ভারতবর্ষের সব তীর্থই তো আপনার ঘোরা। তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছে কোন তীর্থ?

একমুহূর্ত দেরী না করেই বললেন,

—হাঁ বেটা, সমস্ত তীর্থেই গেছি কয়েকবার করে। কৈলাস, মানস সরোবরেও গেছি তিন-তিনবার। কিন্তু বেটা, হরিদ্বার, কেদার-বদরী, যমুনোত্রী আর গঙ্গোত্রী—এমন তীর্থ আমি দেখিনি কোথাও। আহা—অপূর্ব। বহুবারই গেছি। আজও টানে আমায়। মানস-কৈলাসের চেয়েও ভালো লেগেছে এই তীর্থগুলো।

সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,

—কি এমন আছে ওখানে যে, উত্তরাখণ্ডের তীর্থগুলোই গেঁথে আছে আপনার মনে? আপনি কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথাই বলতে চাইছেন?

—না না বেটা, ও-কথাই বলছি না আমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মানস সরোবর, কৈলাস কি কমতি যায়! আসলে ওখানকার মাটিতে আধ্যাত্মিক কোন ভাবই নেই। উত্তরাখণ্ডের তীর্থের মাটিতে পা দিলেই মনে এমন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক-ভাবের সঞ্চার হয় যে—জাগতিক কোন আবিলতা, কোন মলিনতাই স্পর্শ করতে পারে না দেহ মন আত্মাকে। বেটা, এ-যে একেবারে মাটির গুণ। এ তোকে বলে

বোঝাতে পারবো না। ওখানে কিন্তু তা আমার মনে হয়নি। আর কারও হয়েছে কিনা, বা হয় কিনা—বলতে পারবো না। অবশ্য এ-গুলো যার যেমন মন—তার সেইরকম ভাবের সৃষ্টি হয় বিভিন্ন তীর্থে। হরিদ্বার আমি আগেও দেখেছি—অনেক পরেও দেখেছি—এখন আর সে হরিদ্বার কোথায় ?

একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছি—কখন থেকে। অথচ কোন বিরক্তির ভাবই দেখলাম না সাধুবাবার মধ্যে। কি সংযম, কি ধৈর্য সাধুবাবার! অনেক বেলা হলো। এবার উঠতে হবে। প্রণাম করে শেষ প্রশ্ন করলাম,

—সারাজীবনই তো সাধন ভজন করলেন। তীর্থ দর্শনও হলো অসংখ্য। কিন্তু ঈশ্বরের দর্শন কি পেয়েছেন ?

এ-কথায় একগাল হেসে ফেললেন সাধুবাবা। স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। আহ—এমন হাসি দেখা যায় না কখনও। সাধুবাবা হাসছেন—আর আমার ভিতরে বয়ে যাচ্ছে আনন্দের হিল্লোল। বুঁদ হয়ে গেলাম আনন্দে। হাসতে হাসতেই বললেন,

—এতক্ষণ পর তুই বেশ মজার প্রশ্ন করেছিস্ একটা। যদি বলি তাঁর দর্শন পাইনি—ওমনি ভাববি, বাপরে—এত বছর এই জীবনে থেকেও কিছু পাইনি! অবাক হবি! কিছুতেই বিশ্বাস হবে না তোর। আবার যদি বলি, পেয়েছি—তাহলেও তোর শান্তি হবে না। সেটা কিরকম—কেমন করে পেলাম—এমন হাজার প্রশ্ন ঢুকবে তোর মাথায়। এ-সব কথা তোকে বলে বোঝাতেও পারবো না—দেখাতেও পারবো না কিছু—ঠিক কিনা বল্ ?

হতচকিত হয়ে গেলাম সাধুবাবার পাল্টা প্রশ্নে। সে ভাবটা কাটিয়ে ঘাড় নেড়েও মুখে বললাম,

—হ্যাঁ বাবা, ঠিকই বলেছেন আপনি। তবুও আন্তরিকভাবেই জানতে চাইছি আপনার ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বরীয় সজ্ঞান উপলব্ধির কথা।

এবার ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে এলো সাধুবাবার মুখমণ্ডল। ভাবটাই কেমন যেন বদলে গেল। এটা হলো কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে বললেন,

—বেটা, জংলী ফুলে অলক্ষ্যে যিনি সুন্দর, বিচিত্র রঙ ছড়িয়ে মধু ভরে দেন—তিনিই তো ঈশ্বর। তাঁকে কি তোর মতো এমন করে চোখে দেখা যায়।

বাস ভ্রমণে—কোণারক, ভুবনেশ্বর...

সকাল-৬/৩০ মিঃ থেকে রাত্-৭/৩০ মিঃ পর্যন্ত। টানা এই সময়ের মধ্যে ফুরসৎ পাওয়া যাবে না এতটুকু। নষ্ট করা যাবে না একমিনিটও। ঠাসা ভ্রমণসূচী—চলতে থাকবে একের পর এক। এবার আর পায়ে হেঁটে বা রিক্সায় নয়—বাসে।

অসংখ্য দর্শনীয় মন্দির আছে উড়িষ্যায়। পুরীকে ভিত্তি করেই দেখা যায় সব। এরজন্য ট্যুরিস্ট বাসের সিট বুকিং করতে হয় আগেই। তার আগে কিছু কথা আছে। তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণার্থী—এদের প্রথমেই সতর্ক হতে হবে এই বুকিং-এর ব্যাপারে। এখানে—এই স্বর্গদ্বারে এমন কিছু দালাল আছে—যারা অনেক সময়েই আসে হোটেল কিংবা হলিডে হোমে—ভ্রমণের জন্য বাসের সিট বুকিং করাতে। রাজী না হলে অনেকক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শন, এমনকি বলপ্রয়োগ পর্যন্ত করে থাকে। হোটেলের মালিক, হলিডে হোমের কেয়ারটেকার থেকে শুরু করে—কোথাও গিয়ে, কারও কাছে অভিযোগ করে কোনও লাভ হয় না।

তাদের অনেকেরই বক্তব্য—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করতে রাজী নয়। মরতে হয়—যাত্রীরা মরো। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এখন আরও বেড়েছে। এটা বন্ধ করার কোন পথ আছে কিনা—ভবিষ্যতে যাত্রীরা এই হয়রানির হাত থেকে বাঁচবে কিনা—কে বাঁচাবে, তা এখনও পর্যন্ত আমার জানা নেই।

অধিকাংশ ট্যুরিস্ট বাস বুকিং-এর অফিস স্বর্গদ্বারেই। 'মেসার্স এন. এন. মুখার্জী'-তেই বাসের সিট বুকিং করলাম। সুন্দর প্রতিষ্ঠান। ব্যবহার ভালো। ঠকে যাওয়ার ভয় নেই—ভয় নেই হয়রানির। আমার অন্তত হয়নি কখনও। বাসের গাইডও সুন্দর।

দুর-পাল্লায় ভ্রমণের সমস্ত বাসই ছাড়ে সাগরিকা হোটেলের সামনে থেকে। সকাল ৬/১৫ মিঃ। এলাম হোটেলের সামনে। আমার আগেই বাস এসে হাজির। যাত্রীরা সব একে একে উঠে বসলেন—আমিও। যার যেখানে যে আসন টিকিটে লেখা আছে—সেখানে। কাঁটায় কাঁটায় ৬/৩০ মিঃ। বাস ছাড়লো।

পুরী শহর ছেড়ে বাস এলো শহরতলীতে। তারপর ধরলো মেরিণ ড্রাইভ—বম্বের নয়—উড়িষ্যার। সুন্দর এই রাস্তাটির আরও একটি সুন্দর নাম—বেলা মার্গ। আগে ছিল না। কয়েক বছর হলো এটি নির্মাণ করেছে উড়িষ্যা সরকার। কিছুটা চলার পর শুরু হলো সুন্দর ঝাউবন। পথের দু-ধারেই। ঝাউবন থেকে একটু দূরেই সাগর—বঙ্গোপসাগর। এ-সবই দেখা যায় বাসে বসে—সুন্দরভাবে।

প্রথমে পার হলাম নেওয়া নদীর ব্রীজ। একটু পরেই পেরিয়ে এলাম মহানদীর শাখা—কুশভদ্রা। ফাঁকা রাস্তা। একেবারে সোজা। গর্ত নেই একটাও। যত্নে আছে। এমন রাস্তা পশ্চিম বাংলার কোথাও আছে—ভাবতেই পারি না। বাস ছুটেই চলেছে। গতি তীব্র নয়—সীমিত।

এবার দেখা পেলাম চন্দ্রভাগা নদীর। প্রথমে চন্দ্রভাগা—পাশেই সাগর। ডানপাশে নদী আর সাগর। ওরা বয়ে চলেছে পাশাপাশি। আমরা চলেছি ওদেরই হাত ধরে।

মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। লোক বসতি নেই—নেই জন-কোলাহল। সাগর যেন স্বামী—স্ত্রী চন্দ্রভাগা। নির্জনে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে কোন বাধা নেই।

প্রকৃতিও করেনি বাধার সৃষ্টি। তাই সাগর-নদীতে মিলন ঘটেছে—চন্দ্রভাগায়। স্থানের নামও চন্দ্রভাগা। বাস থামলো। পুরী থেকে এলাম টানা ৩৩ কি. মি.। সাড়ে ছটায় ছেড়ে এলো আটটায়।

চা জলখাবারের সময় এখন। বাস দাঁড়াবে পনেরো মিনিট। যাত্রীরা নেমে এলেন সকলেই। মাত্র কয়েকটা দোকান আছে এখানে। শুরু হলো অনেকের চা জলপান। চন্দ্রভাগার এই তীরটি কোণারক সমুদ্র সৈকতেরই অন্তর্গত।
কিংবদন্তী আছে, একদা ভগবান শংকরের কোন কারণে সৃষ্টি হলো ক্রোধ। এই ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো মর্ত্যলোকে। তখন জীব জগতকে রক্ষা করতে স্বর্গ থেকে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হলো মর্ত্যলোকে। মিলিত হলো কোণারকের কাছে—সাগরে। এ-লোকে এ-নদীর নাম হলো—প্রাচী।
কালক্রমে পুণ্যতোয়া প্রাচী-র দু-তীরেই গড়ে উঠলো সুরম্য তপোভূমি। নাম হলো মৈত্রেয় বন। এই বনে আব সব মুনি-ঋষিদের মতো বাস করতেন পরশুরামের শিষ্য মহর্ষি সুমণ্য। তাঁরই ঔরসে সাগর গর্ভে জন্ম হলো এক কন্যার। ঋষি কন্যার নাম দিলেন—চন্দ্রা।
কালের নিয়মেই এক সময় যৌবনে পা দিলেন চন্দ্রা। অপরূপা যৌবনবতী—অনিন্দ্য সুন্দরী চন্দ্রা। ধীরে ধীরে আকর্ষণীয়া হয়ে উঠলেন পুরুষের চোখে। নারীর যৌবন বলে কথা! তাই আর অপেক্ষা করলেন না সুমণ্য। স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন তিনি।
এ-দিকে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সে সময় পালিত হচ্ছে পুর্ণাভিষেক উৎসব। দেবতারা আসেন এই উৎসবে। এসেছেন আর সকলের মতো সূর্যদেব—মদনদেবও।
বিবাদ বাধলো মন্দিরে প্রবেশ নিয়ে—কে আগে প্রবেশ করবেন? সূর্যদেবই প্রথম প্রবেশ করলেন মন্দিরে। শুধু তাই নয়, অপমানও করলেন মদনদেবকে। অপমানিত মদনদেব প্রতিজ্ঞা করলেন—যে করেই হোক, অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেনই।
অভিষেক উৎসব শেষ হলো যথাসময়ে। এবার সূর্যদেব ফিরছেন কোণারকে। পথেই মৈত্রেয় বন। দৃষ্টি পড়লো তাঁর ঋষিকন্যা রূপ-লাবণ্যবতী চন্দ্রার উপর। সুযোগ পেলেন মদনদেব। কামবাণে জর্জরিত করলেন সূর্যদেবের দেহ মন। একই সঙ্গে বিরাগ সৃষ্টি করলেন চন্দ্রার মনে।
কামে অস্থির হয়ে উঠলেন সূর্যদেব। আকর্ষণ করতে এগিয়ে গেলেন রূপবতী চন্দ্রার দিকে। আত্মরক্ষার জন্য ছুটলেন চন্দ্রা। পিছনে সূর্যদেব। ক্লান্ত চন্দ্রাকে ধরে ফেললেন। তাঁর সতীত্ব রক্ষার আকুল প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। বিফল হলো প্রতিবাদ—প্রতিরোধও। বলপ্রয়োগ করলেন সূর্যদেব। সতীত্ব নষ্ট হলো চন্দ্রার। অপমানিতা চন্দ্রা সতীত্ব হারিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন সাগর-গর্ভে—প্রাচী নদীর মোহনায়। মৈত্রেয় বনে সকলের অলক্ষ্যে নেমে এলো শোকের ছায়া।

এ-সব কিছুই জানেন না মহর্ষি সুমণ্য। বেরিয়েছেন কন্যা খোঁজে। মৈত্রেয় বনে কোথাও পেলেন না চন্দ্রাকে। খুঁজতে খুঁজতে এলেন সাগর তীরে। দেখলেন, অনুতপ্ত সূর্যদেবকে। সমস্ত বিষয় অবগত হলেন তিনি। কন্যা-শোকের ব্যথা-বেদনায় মর্মাহত হলেন সুমণ্য। অভিশাপ দিলেন সূর্যদেবকে—'কোণারকে তোমার মন্দির খন্ড খন্ড হয়ে ভেঙে পড়বে।' অভিশাপ দিয়ে ঋষি ফিরে গেলেন আশ্রমে। পরবর্তীকালে হলোও তাই। সফল হলো ঋষিবাক্য। কালক্রমে ভেঙে পড়লো সূর্যমন্দির। পূজার্চনা বন্ধ হলো কোণারকে—সূর্যদেবের।

যেখানে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন চন্দ্রা—সেই ক্ষেত্রটি পরিণত হলো পবিত্র তীর্থে। সেখানে স্নান করলেন সূর্যদেব। চন্দ্রার মৃত্যুর কারণজনিত আত্মপাপ থেকে মুক্ত হলেন তিনি। চন্দ্রার নাম থেকেই স্থানটির নাম হলো চন্দ্রভাগা। অজ্ঞাত সেই প্রাচীনকাল থেকেই স্থানটি প্রসিদ্ধিলাভ করলো তীর্থরূপে।

চন্দ্রভাগায় বরাদ্দ সময় মাত্র পনেরো মিনিট। সমুদ্রের ঢেউ দেখতে দেখতেই কেটে যায় সময়। পাশেই রয়েছে সুন্দর ঝাউবন। সময় হয়ে এলো। একে একে উঠে এলেন সকলেই। বাস ছাড়লো চন্দ্রভাগা থেকে।

পথ মাত্র ৩ কি. মি.। সামান্য সময়। বাস এসে থামলো কোণারকে। যাত্রীরা সকলেই নেমে এলেন বাস থেকে।

কোণারক সূর্যমন্দিরে পূজোপাটের কোন ব্যাপারই নেই। হয়ও না। শুধু ঘুরে ঘুরে দেখা। এখানে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সময় দু-ঘণ্টা। দুপুরের খাওয়া আর দেখা—সবই সেরে নিতে হবে এই সময়ের মধ্যে। এখানে হোটেল আছে বেশ কয়েকটা। বাস থেকে নেমেই দিতে হয় খাওয়ার অর্ডার। জমা দিতে হয় টাকা। নইলে দুপুরের খাবার পাওয়া যায় না। নিয়মের বাইরে গেলাম না। ফিরে এসে খেয়ে উঠবো বাসে। অন্য যাত্রীদের অনেকেই তাই করলেন। যারা খাবার এনেছেন সঙ্গে—তাদের আর এ-ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা রইলো না।

এগিয়ে গেলাম কোণারক মন্দিরের দিকে। মন চলে পুরাণের কথায়।

দ্বাপর যুগের শেষ, কলির শুরু—মহাভারতীয় যুগের কথা। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী জাম্ববতী। আট মহিষীর মধ্যে অন্যতমা। পুত্র শাম্ব। জাম্ববতীর গর্ভেই তাঁর জন্ম। এমন ভুবনমোহিনী রূপ ছিল শাম্বর—মুগ্ধ হয়ে যেত সকলেই। এই রূপের অহংকারে সর্বদাই গর্বিত ছিলেন তিনি। অহংকারে মত্ত শাম্ব—শ্রদ্ধার পরিবর্তে অসম্মানই করতেন শ্রদ্ধাস্পদ গুরুজনদের।

দেবর্ষি নারদ। দ্বারকাধীশ কৃষ্ণকে দর্শন করতে প্রতিদিনই আসেন রাজসভায়। সমস্ত দেবদেবী—এমনকি কৃষ্ণও স্বয়ং শ্রদ্ধা করতেন দেবর্ষি নারদকে। কিন্তু শাম্ব এক বিপরীত চরিত্র। সম্মান তো দূরের কথা—অপমানই করতেন নারদকে। ক্ষমার অতলান্ত সাগর তিনি। অপমানিত হয়েও ক্ষমা করতেন অন্তরে। শাম্ব

স্বয়ং কৃষ্ণপুত্র যে ! এইভাবেই দেবর্ষির দিন কাটে কৃষ্ণের রাজসভায় ।
একদা সহ্যের সীমা অতিক্রম নারদের। রাজসভায় শাম্বের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন তিনি। এবার ক্রোধ সৃষ্টি হলো অন্তরে। কিন্তু প্রকাশ করলেন না। অপমানের প্রতিশোধ নিতে উপায় ভাবতে লাগলেন। উপায় উদ্ভাবনও করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন—শাম্বর প্রতি কৃষ্ণের মনে বিক্ষুব্ধ-ভাব সৃষ্টি করবেন তিনি।
নারদ একদিন অভিযোগ করলেন কৃষ্ণের কাছে—অসংখ্য গোপিনীর সঙ্গে পাপপ্রণয়ে লিপ্ত রয়েছেন শাম্ব। গোপিনীরাও শাম্বর রূপ-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরই সঙ্গে মত্ত রয়েছে প্রণয় লীলায়।
এ-কথায় বিশ্বাসই করলেন না কৃষ্ণ। অসম্ভব। শাম্ব রূপবান হতে পারে—চরিত্রহীন নয়। নিজপুত্র সম্পর্কে এ-দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কৃষ্ণের। এ অভিযোগের কোন গুরুত্বই দিলেন না তিনি। নারদও ছাড়লেন না। প্রতিশোধ নিতেই হবে অপমানের। শপথ করলেন কৃষ্ণের কাছে। প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেবেন তাঁর কথার সত্যতা।
এ কাজে সময় লাগলো না নারদের। কৃষ্ণ প্রায়ই যান রৈবতক পর্বতে—ভ্রমণে। ওই পর্বতের কাছেই রয়েছে এক মনোরম পুষ্করিণী। প্রতিদিন গোপিনীরা আসেন—জলক্রীড়া করেন সেখানে।
এই সুযোগই নিলেন দেবর্ষি নারদ। একদিন শাম্বকে ডেকে বললেন, কৃষ্ণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন রৈবতক পর্বতে—সেখানে গিয়ে যেন সাক্ষাৎ করেন।
নারদের কথায় বিশ্বাস করলেন শাম্ব। যাত্রা করলেন রৈবতক পর্বতের উদ্দেশ্যে। কথাটা মিথ্যাই বললেন নারদ। কৃষ্ণ সেখানে ছিলেন না। দেখাও করতে বলেননি তিনি।
এ-দিকে শাম্বের যাত্রার সময়ই ছিল গোপিনীদের জলক্রীড়ার সময়। অনেক গোপিনীই ছিলেন তখন জলক্রীড়ারতা। পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে চলেছেন শাম্ব—আপন মনে। দেখলেন গোপিনীরা। সৌন্দর্য আর রূপে মুগ্ধ হলেন তাঁরা। হারালেন সংযমতা। প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন রূপবান শাম্বকে।
মুহূর্তমাত্র দেরী করলেন না নারদ। কৃষ্ণকে জানালেন শাম্ব আর গোপিনীদের প্রেমালিঙ্গনে রত অবস্থার কথা। কৃষ্ণ এলেন—সঙ্গে নারদ। দেখলেন স্বচক্ষে। এবার বিশ্বাস করলেন নারদের কথা। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি। অভিশাপ দিলেন পুত্র শাম্বকে—রূপ সৌন্দর্যের অহংকার যেন নষ্ট হয়ে যায় কুষ্ঠ-রোগে।
এ-কথায় শুধু বিস্মিত নয়—দুঃখিতও হলেন শাম্ব। এমনটা কল্পনাও করেননি তিনি। অনন্যোপায় কৃষ্ণপুত্র। নতজানু হয়ে উপদেশ চাইলেন নারদের কাছে। দেবর্ষি বললেন, অভিশাপজনিত এ-ব্যাধি আরোগ্য হতে পারে একমাত্র সূর্যদেবের কৃপায়। ভারতের পূর্ব-উপকূলে সমুদ্রতীরে আছে মৈত্রেয় বন। সেখানে গিয়ে উপাসনা করো সূর্যদেবের। তাঁর কৃপাতেই তুমি মুক্ত হবে এ-ব্যাধি থেকে।
দ্বারকা থেকে শাম্ব এলেন চন্দ্রভাগাতীরে—মৈত্রেয় বনে। শুরু করলেন কঠোর

কঠিন তপস্যা। কেটে গেল দীর্ঘ বারোটা বছর। শাম্বের তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হলেন সূর্যদেব। বর দিলেন রোগমুক্তির। সাগর ও চন্দ্রভাগার সঙ্গমে স্নান করলেন শাম্ব। কষ্টের অবসান হলো। চিরতরে মুক্ত হলেন কুষ্ঠ-রোগ থেকে। আবার ফিরে পেলেন আগের হারানো সেই রূপ সৌন্দর্য।

এবার সূর্যদেব বললেন, মর্ত্যলোকে কেউ যদি সূর্যমন্দির নির্মাণ এবং ক্ষেত্রস্থাপন করে, তবে সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করবে সে।

এরপর একদিন নিরোগ শাম্ব স্নান করতে নেমেছেন চন্দ্রভাগায়। আকস্মিকভাবেই একটি বিগ্রহ পেলেন—সূর্যদেবের। নদীকূলেই নির্মাণ করলেন একটি মন্দির। প্রতিষ্ঠা করলেন আনন্দিতচিত্তে। তখন থেকেই সূর্যদেবের মূর্তিপূজার প্রচলন হলো মর্ত্যলোকে। ক্ষেত্র-স্থাপন করলেন শাম্ব। মৈত্রেয় বনই হলো অর্ক বা সূর্যক্ষেত্র—যা আজ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে কোণার্ক বা কোণারক নামে। পৌরাণিক মতে মোটামুটি এই হলো কোণারকের গোড়ার কথা।

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতেই চলে এলাম কোণারক মন্দির প্রাঙ্গণে। গাইড একটা একান্তই প্রয়োজন। নইলে দেখা হবে, তবে জানা যাবে না এর অতীত ইতিহাস—বোঝাও যাবে না মন্দিরের শিল্পকলার অন্তর্নিহিত শিল্প-মাধুর্য্য। তাই গাইড একটা ঠিক করলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চলতেই গাইড চলে গেলেন বর্তমান মন্দিরের অতীত ইতিহাসে।

ওষালঙ্গ—উড়িষ্যারই গ্রাম একটি। তারই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট নদী—প্রাচী। ওই গ্রামেই বাস করতেন কিছু সুদক্ষ শিল্পী। তাদের মধ্যে প্রধান শিল্পী ছিলেন বিশু মহারাণা। পাথর খোদাই করে মূর্তি তৈরী করাই ছিল তাঁদের ব্যবসা। অসংখ্য সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে খ্যাতি অর্জনও করেছিলেন তাঁরা। তার মধ্যে অন্যতম শিল্প নিদর্শন তাদের পুরীর জগন্নাথদেবের এবং ভুবনেশ্বরের অসংখ্য মন্দির।

সাল তারিখের হিসাব করতে গেলে বাদ হয়ে যাবে ইতিহাসের অনেক পাতা। একদিনের কথা। একটি অশ্ব-মূর্তি গড়ায় মনোনিবেশ করেছেন শিল্পী বিশু। এক খণ্ড আকৃতিহীন পাথর। ছেনি হাতুড়ির ছোঁয়ায় ক্রমশ রূপ পাচ্ছে অশ্ব-মূর্তিতে। কোন দিকেই হুঁস নেই শিল্পীর। কাজ করে চলেছেন আত্মমগ্ন হয়ে। ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন বিশুপত্নী। এমন সময় বিশুর দুয়ারে এলেন এক অশ্বারোহী সুদর্শন পুরুষ। সেদিকে কোন নজরই নেই বিশুর। আপন মনে—আপনভোলা হয়ে শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি। ছেনি হাতুড়ির ঠুক্‌ঠাক শব্দ ছাড়া আর কোন কিছুই যায় না তাঁর কানে।

এগিয়ে গেলেন বিশুপত্নী। রাতটুকুর জন্য একটু আশ্রয় চাইলেন অশ্বারোহী। এ-সংবাদ স্বামীকে দিতে চাইলেন শিল্পী-পত্নী। নিষেধ করলেন অশ্বারোহী। ধ্যানমগ্ন শিল্পী রয়েছেন শিল্প রচনায়। তাঁকে যেন বাধা না দেন তিনি। যথার্থ

কথা। খুশী হলেন বিশুপত্নী। অতিথি আপ্যায়ণের সমস্ত ব্যবস্থা করলেন নিজেই। আপনভোলা বিশু আপন খেয়ালেই হঠাৎ বলে উঠলেন অস্ফুটস্বরে,
এ-দেশের রাজা কত নির্বোধ।
কথাটা কানে গেল অতিথির। এগিয়ে এলেন তিনি। জানতে চাইলেন,
—রাজা নির্বোধ কেন?
ছেনি হাতুড়ি বন্ধ হলো না শিল্পীর। ফিরেও দেখলেন না প্রশ্নকর্তাকে। আপন মনেই বলে চলেন,
—অনেক সময় অসংখ্য নিরীহ মানুষ হত্যা করে দেশের রাজা। জয় করে রাজ্য। কিন্তু জয় করতে পারে না মানুষের মন।
অতিথি বললেন,
—রাজার ধর্মই তো যুদ্ধ করা। ইতিহাসে তার বীরত্বের কথাই তো লেখা থাকে চিরদিনের জন্য।
আপনভাবেই বললেন বিশু,
—এ-দেশের রাজার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন পরাক্রমশালী—বড় বড় যোদ্ধা। কিন্তু আজ কি কেউ তাঁদের মনে রেখেছে—না আছে তাঁদের সাম্রাজ্য। শুধু কীর্তির জন্যই বেঁচে থাকে মানুষ। অমর কীর্তি আছে যাদের—তারাই বেঁচে রয়েছেন মানুষের অন্তরে—শত শত বছর ধরে।
শেষ হলো কথা। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমালেন অতিথি। এদিকে সারা রাত ধরে চললো শিল্পীর ছেনি হাতুড়ি—একটানা। ভোর হতে সামান্য বাকি। আকৃতিহীন পাথর পূর্ণরূপ পেল অশ্বমূর্তিতে। কর্মক্লান্ত দেহ। ঘুমে ঢলে পড়লেন বিশু।
সকাল হলো। বিশুর সামনে নিজের অশ্বটি দেখে অবাক হলেন অতিথি। তাকে তো বেঁধে রেখে এসেছেন বাইরে—এখানে এলো কেমন করে? স্নেহমাখা হাত বুলিয়ে দিতেই চমকে উঠলেন তিনি। এটি তাঁরই অশ্বের রূপ—পাথরের। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দেখলেন, ক্লান্ত শিল্পী ঘুমিয়ে আছেন অশ্বেরই পায়ের কাছে। কোন কথা বললেন না। বিশুর অসাধারণ শিল্প-কর্মে বিমুগ্ধ হলেন অতিথি। তারপর বিদায় নিলেন বিশুপত্নীর কাছ থেকে।
এই অতিথি আর কেউই নয়—তৎকালীন গঙ্গবংশের রাজা স্বয়ং প্রথম নরসিংহ দেব। ফিরে গেলেন শিবিরে। উপলব্ধি করলেন, রক্তের বিনিময়ে রাজ্য জয় করা যায়—বেঁচে থাকা যায় না। মানুষের মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে তাঁর সৃষ্টির জন্য—চাই সৃষ্টি। শিল্পী বিশুর কথাই সত্য।
রাজা ডেকে পাঠালেন বিশু আর তাঁর পত্নীকে। অবাক হয়েই এলেন তাঁরা। যথোচিত সম্মান দিয়ে রাজা বললেন,
—যে শিল্পী ছোট্ট ছেনি হাতুড়ি দিয়ে পাথর কেটে জীবন্ত অশ্ব তৈরী করতে পারে—শিল্প সাধনায় যে ভুলে যায় সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা—সেই শিল্পীর সৃষ্টিকে

চিরদিনের জন্য অম্লান করে রাখতে চাই। এমন একটি মন্দির নির্মাণ করতে হবে তোমাকে—যা সারা পৃথিবীতে হয়ে থাকবে অদ্বিতীয়। আর মন্দিরের সামনেই থাকবে অশ্বমূর্তি—যা যুদ্ধের অশ্বের প্রতীক-স্বরূপ।
রাজার কথা শুনে আনন্দিত শিল্পী বিশু বললেন,
—এই স্থানটি সর্বত্রই খ্যাতিলাভ করেছে সূর্যক্ষেত্ররূপে। তাই এখানেই নির্মিত হোক একটি সূর্যমন্দির। সাতটি অশ্ব সংযোজিত থাকবে মন্দিরটিতে। এমনভাবে নির্মিত হবে—দেখলেই মনে হবে, এটি প্রকৃতই সূর্যদেবের রথ।
মন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন রাজা। সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হলো রাজমন্ত্রী শিবেই সান্তবার উপর। যথা নিয়মে শুরু হলো মন্দির নির্মাণের কাজ—সমুদ্রের বালুকাপ্রান্তে—অর্ক বা সূর্যক্ষেত্রে।
সূর্যমন্দির নির্মাণের কাজ চলছে কোণারকে। বারো-শ দক্ষ শিল্পী নিযুক্ত করা হয়েছে এই কাজে। এরা সকলেই উড়িষ্যাবাসী। এঁদের মধ্যে প্রধান বিশু মহারাণা। সময়ও বেঁধে দেওয়া হলো। তার মধ্যেই শেষ করতে হবে মন্দির নির্মাণের কাজ।
একের পর এক পাথর কেটে কাজ করে চলেছেন শিল্পীরা। প্রয়োগ করে চলেছেন তাঁদের শিল্প-কৌশল। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেন রাজা নরসিংহ—সঙ্গে পত্নী, রাজমন্ত্রী। মুগ্ধ হয়ে যান তাঁরা কর্মচঞ্চল ছেনি হাতুড়ি আর শিল্পীমনের একাগ্রতা দেখে। আনন্দে গর্বিত হয়ে ওঠেন রাজা। ইচ্ছা তাঁর বাস্তবায়িত হতে চলেছে। দীর্ঘ বারোটা বছর শেষ হতে চললো দেখতে দেখতে। বিশু মহারাণা পড়ে আছেন কোণারকে। যখন তিনি মন্দির নির্মাণের কাজে আসেন, তখন তাঁর স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। যথা সময়ে একটি পুত্র সন্তানও প্রসব করেছিলেন বিশুপত্নী। ধর্মদেবতার মন্দির নির্মাণে নিযুক্ত রয়েছেন সন্তানের পিতা। তাই বিশুপত্নী সন্তানের নাম রাখলেন—ধর্মপদ।
কালের নিয়মেই বড় হলো ধর্মপদ। পা দিয়েছে বারো বছরে। এই বয়সেই সে যেন জাতশিল্পী। শিল্পশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানলাভ করলো বালক বিশুপুত্র।
একদিন পিতৃ-পরিচয় জানতে চাইলো মায়ের কাছে। পিতাকে দেখার জন্যেও অস্থির হয়ে উঠলো ধর্মপদ। মা জানালেন শিল্পী পিতার পরিচয়। বারো-শ কারিগরের সঙ্গে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন সূর্যমন্দির নির্মাণের কাজে। শিল্পী মন। বেড়ে গেল কৌতূহল। জিদ ধরলো ধর্মপদ। যাবে পিতার কাছে—অর্কক্ষেত্রে।
সন্তানের পরিচয় পেতে যেন কোন অসুবিধা না হয়—তাই বিশুপত্নী ধর্মপদের সঙ্গে দিলেন বাড়ীর পোষা কুকুর 'বালিয়া' আর গাছের কিছু কুল। এই নিয়েই যাত্রা করলো ধর্মপদ। অজানা পথ। জিজ্ঞাসা করতে করতে অবশেষে পৌঁছালো সূর্যক্ষেত্রে। বিশাল মন্দির দেখে বিস্মিত হলো বালক। দেখলো, মন্দির নির্মাণ প্রায় শেষ হতে চলেছে। একটু বাকি।
খোঁজ করে উপস্থিত হলো ধর্মপদ—পিতা বিশুর কাছে। কুকুর বালিয়া আর

গাছের ফুল দেখে চিনতে অসুবিধা হলো না সন্তানকে। পিতা পুত্রের প্রথম মিলন হলো অর্কক্ষেত্রে। আনন্দের অশ্রুধারা নেমে এলো দুজনের গাল বেয়ে।
মন্দির প্রাঙ্গণ ঘুরে ঘুরে দেখছে ধর্মপদ। শিল্পীদের শিল্পকলায় মন্দির যেন উথলে উঠছে। প্রতিটি অঙ্গে জীবন্ত রূপ পেয়েছে উৎকলীয় শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের অনবদ্য দৃশ্য আর নানা ঘটনাবলী। সবই সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত। এমনভাবে মন্দির নির্মাণ করেছেন শিল্পীরা, যেন সাতটি অশ্ব আকাশমার্গে টেনে নিয়ে চলেছে সূর্যদেবের রথ। ধর্মপদ ভাবে, বারো বছরের অক্লান্ত শ্রম সার্থক হয়েছে শিল্পীদের।
হঠাৎ রাজা আদেশ দিলেন, পূর্ব নির্ধারিত সময়ের তিনমাস আগেই শেষ করতে হবে মন্দির নির্মাণের কাজ। কারণ সেই বছর মাঘ মাসে সপ্তমী তিথি পড়েছে রবিবারে। সূর্যদেবের জন্মতিথি। অতএব প্রথম পূজা আর মন্দির উদ্বোধন হবে ওই দিনেই।
সদাশিব সামন্ত রায় মহাপাত্র ওরফে শিবেই সান্তরা। রাজা নরসিংহ দেবের পূর্তবিভাগের মন্ত্রী এবং বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। অক্ষমতা প্রকাশ করলেন তিনি। একটি নির্দিষ্ট যোজনা অনুযায়ী কাজ। একটু এদিক ওদিক হলেই মন্দিরের গঠন কার্য হবে ত্রুটিপূর্ণ। ভবিষ্যতে ভেঙে পড়বে মন্দির। একেবারে জল হয়ে যাবে দীর্ঘ বারো বছরের নিরলস প্রচেষ্টা, শ্রম। এদিকে রাজার আদেশ অথচ এ-কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই চাকুরী থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগেই তিনি ইস্তফা দিলেন চাকুরীতে।
রাজার কঠোর নির্দেশ। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দ্রুত শেষ করতে হবে মন্দির নির্মাণের কাজ। তাই যে পর্যন্ত ইতিমধ্যেই হয়েছিল—তার উপর আর উচ্চতা না বাড়িয়ে শীর্ষ চূড়াটি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। শুরু হলো নিয়ম আর মাপের বাইরে কাজ। মন্দির শীর্ষে যতবারই চূড়া-কলস বসানোর চেষ্টা—ততবারই যায় পড়ে।
সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পীরা ব্যর্থ হলেন। বারংবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন প্রধান শিল্পী বিশু মহারাণা। কিছুতেই বসানো গেল না চূড়া-কলস।
অধৈর্য হয়ে উঠলেন রাজা নরসিংহ দেব। এবার কঠোর আদেশজারী করলেন তিনি। আগামীকালই শেষ দিন। যে করেই হোক—যেমন করেই হোক, এ কাজ শেষ করতেই হবে। নইলে প্রাণদণ্ড হবে বারো-শ শিল্পীর।
এমন আদেশের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি শিল্পীরা। প্রাণপাত পরিশ্রমের পুরস্কার আজ হতে চলেছে মৃত্যুদণ্ড। সকলের মধ্যেই নেমে এলো বিষাদের ছায়া।
পরদিন সকালে পিতা বিশুর কাছে বিষাদের কারণ জানতে চাইলো বালক ধর্মপদ। বিশু বললেন বিস্তারিত। মন দিয়ে শুনলো বিশুপুত্র। আজই শেষ রাত্রি। চূড়া-কলস লাগাতে না পারলে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যু হবে বারো-শ শিল্পীর।
এবার গম্ভীরভাবে আলোচনা হলো পিতা-পুত্রে। ত্রুটিও ধরা পড়লো। মন্দিরের মূল

নকসার সঙ্গে উপরের অংশের খাপ খাচ্ছে না ঠিক মতো। তাই এই বিপত্তি। একটু ভেবে নিল। সেদিনই চূড়া-কলস বসানোর দায়িত্ব নিল বালক—শিল্পী ধর্মপদ। মন্দিরের চূড়ায় উঠে গেল ধর্মপদ। গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শও দিয়ে গেল উপস্থিত শিল্পীদের। নির্দেশ মতো তারা সাহায্য করতে থাকলো তাকে। ধীরে ধীরে সম্পন্ন হলো মন্দিরের চূড়া স্থাপনের কাজ। উল্লসিত হয়ে উঠলো শিল্পীরা। সন্তানের গর্বে বুক ভরে গেল পিতা বিশুর। ধর্মপদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস—সমুদ্র সৈকত।

প্রাণ বাঁচলো বারো-শ শিল্পীর। কিন্তু শান্তি এলো না তাদের। যে কাজ বারো বছরের বালকের পক্ষে সম্ভব—সে কাজ এতগুলো দক্ষ শিল্পী করতে পারলো না—এ-কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে অক্লান্ত পরিশ্রমের কোন মূল্যই থাকবে না—থাকবে না শিল্পীদের সম্মান। তাছাড়া রাজার মনেও ধারণার সৃষ্টি হবে—এ-কাজ ইচ্ছাকৃত করেননি তাঁরা। অকারণ দেরী করে নষ্ট করেছেন সময়।

শিল্পীদের গোপনে আলোচিত এ-সব কথা কানে গেল ধর্মপদের। সত্যিই তো, প্রকৃত শিল্পীর কাছে অর্থ নয়, সম্মানই বড়—ভাবলো বালক শিল্পী। কিছুই বললো না—কাউকে।

রাত গভীর হলো। একটিবারও ভাবলো না মা-বাবার কথা। ভাবলো শুধু শিল্পীদের সম্মানের কথা। মন্দিরের চূড়ায় উঠে গেল ধর্মপদ। আগেও উঠেছে—শিল্পীদের সম্মান আর প্রাণরক্ষার জন্য। এবারও উঠলো। তবে প্রাণ নয়—শিল্পীদের সম্মান রক্ষার জন্য। ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দিল ধর্মপদ।

আজ আর ধর্মপদ নেই—নেই বিশু মহারাণা, রাজা নরসিংহ, মন্ত্রী শিবেই সান্তরা আর বারো-শ শিল্পী। ভেঙে পড়েছে কোণারকের সূর্যমন্দিরও। মহাকালের কবলে একদা হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেটিও—কিন্তু অমর হয়ে রইলো বালক শিল্পী ধর্মপদের মহৎ আত্মত্যাগের কথা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি—সঙ্গে চলেছে গাইড। অসংখ্য ভ্রমণার্থীর সমাগম হয়েছে এখানে। এসেছে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ। বিদেশী পর্যটকও এসেছে কিছু। কোণারকে তাদের অবাধ প্রবেশ। বাচ্চা বুড়ো জোয়ান—বয়সের কোন বাধ নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছে সবাই। বিশাল এলাকা নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ। তার মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে সূর্যমন্দির। গাইড চলেছেন বলতে বলতে—

১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখনই শুরু হয়েছিল কোণারকে সূর্যমন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা। আর নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে। টানা চললো বারোটা বছর। ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী, রবিবার। দিনটা ছিল শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। ওই দিনেই মন্দির উদ্বোধন হয়ে প্রথম শুরু হয় পূজার্চনা। ১২৫৮ থেকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ—কেটে গেল প্রায় তিনশো বছর। এই সময়কাল পর্যন্ত চললো নিয়মিত পূজো।

১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা এলো মুসলমান শাসনাধীনে। মন্দিরের যথারীতি পুজো আর রক্ষণাবেক্ষণে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। এই অবস্থা চলতে থাকলো সমানে।

১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। খসে পড়লো সূর্যমন্দিরের ধ্বজপদ্ম। এই প্রথম ক্ষতের সৃষ্টি হলো মন্দিরে। এর পূর্ব পর্যন্ত অক্ষতই ছিল। তারপর ১৬২১ থেকে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ—মন্দিরের পক্ষে চরম দুঃসময়। অসম্ভব ক্ষতিগ্রস্থ হলো —ভীষণভাবে ভেঙে পড়লো মন্দিরটি। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দেই খসে পড়লো মন্দিরের চূড়া-কলস আর উড়ন্ত গজসিংহ মূর্তিটি। একই সময়ে ভাঙলো উপরের অংশটি। এতে ভেঙে গেল মন্দিরের ভিতরে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত সূর্যনারায়ণের মূর্তি।

এ-দিকে চূড়া-কলস ভেঙে পড়ায় মন্দিরের ভারকেন্দ্র হয়ে পড়লো বিপর্যস্ত। ফলে উপর থেকে খসে পড়তে লাগলো খণ্ড খণ্ড পাথর। এইভাবে খসে পড়া পাথরের আঘাতে নীচের ছাদ আর দেয়ালও হলো ক্ষতিগ্রস্থ। ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগলো সে-গুলোও। এইভাবেই সমানে চলতে লাগলো মন্দিরের ধ্বংসলীলা।

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ—জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। সম্রাট নিযুক্ত করলেন বাংলার সুবেদার হিসাবে বাখর খাঁকে। তিনি এসে অপবিত্র করে দেন মন্দিরটিকে। সূর্যনারায়ণ আর পিতলের চন্দ্র ও সূর্যমূর্তি ছিল কোণারকে। ওই সালের ১৭ই মার্চ সরিয়ে আনা হলো পুরীতে। প্রতিষ্ঠা করা হলো জগন্নাথদেবের মন্দির চত্বরের একটি মন্দিরে। আজও আছে। তবে পিতলের মূর্তি দুটি রাখা হলো পুরীর মন্দিরে।

ওই সময় থেকেই একেবারে বন্ধ হয়ে গেল পূজার্চ্চনা। কমে গেল জন-সমাগম—ধীরে ধীরে কোণারক ভরে উঠলো গভীর জঙ্গলে। মন্দিরের কিছু অংশও চাপা পড়ে গেল বালিতে। এইভাবেই পড়ে রইলো নির্জন সমুদ্র তীরে কোণারক—সূর্যমন্দির।

তারপর থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভীষণভাবে ভেঙে পড়লো মন্দিরটি। সমুদ্রের বালিতেও ঢাকা পড়ে গেল সম্পূর্ণ মন্দির চত্বর। শুধুমাত্র মন্দিরের মুখ্যশালার অর্ধেকাংশ দেখা যেতো উপরে।

এইভাবে প্রায় তিনশো বছর—অন্ধকার যুগের মধ্যেই ছিল সূর্যমন্দির। এরই মাঝে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মেরিণবোর্ড একটি প্রস্তাব দেয় ইংরাজ সরকারকে —যে কোনভাবেই রক্ষা করতে হবে মন্দিরটি। কিন্তু সে কাজে কোন ইচ্ছাই প্রকাশ করলো না সরকার। কারণ মন্দির উদ্ধারের কাজ যেমন দুঃসাধ্য—তেমনই ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং মন্দির পড়ে রইলো ওই একইভাবে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ—তখন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যার চার্লস্ এলিয়ট। মন্দির সংরক্ষার বিষয়টি আন্তরিকভাবেই উপলব্ধি করলেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে কোন কাজই হলো না। এইভাবে কেটে গেল আরও কয়েকটি বছর।

প্রকৃতপক্ষে মন্দির উদ্ধার আর সংরক্ষণের কাজ শুরু হলো ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে—কার্জন সাহেবের অনুগ্রহে। মন্দির চত্বর থেকে পাথর বালি এনে ফেলা হলো

একেবারে বাইরে। বেরিয়ে পড়লো মন্দিরের বেদী আর চাকা। দেখা গেল, অর্ধেক ভেঙে পড়েছে মুখ্যশালা। সেটা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন বালি আর পাথর দিয়ে ভরিয়ে দেয়া হলো ভিতরটা—যাতে সম্পূর্ণ ভেঙে না পড়ে। ছাদটি সুদৃঢ় করার জন্য ভিতরে দেয়া হলো পনেরো ফুট চওড়া একটি দেয়াল। কিছু কিছু অংশের পুনর্নির্মাণও হলো। আর দীর্ঘ-স্থায়ীত্বের জন্য মন্দিরের সবকটি দরজা বন্ধ করে ভিতরে ভরে দেয়া হলো বালি।

সূর্যমন্দিরের নাটমন্দির আর মুখ্যশালার উদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজ শেষ হলো ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দিরের প্রকৃত রূপ দেখা গেল তখনই।

বড় মন্দির উদ্ধারের কাজ শুরু হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। সরানো হলো শুধু ভাঙা পাথর আর বালির স্তূপ। বেরিয়ে পড়লো মন্দিরের তিন পাশে খোদিত সূর্যদেবের মূর্তি আর সিংহাসনটি। পরিষ্কার হয়ে গেল সূর্যমন্দির ও মন্দির প্রাঙ্গণ।

কোণারক মন্দিরের প্রাথমিক সংরক্ষা আর উদ্ধার কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে আজও চলছে মেরামতের কাজ—চলছে ধারাবাহিক এবং নিয়মিতভাবে।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে চারটি ভাগ আছে। প্রথমে বিমান বা প্রধান মন্দির। তার সামনেই জগমোহন অর্থাৎ দর্শকদের বসবার জায়গা। নৃত্যমণ্ডপ—বাদ্য-যন্ত্রসহ যেখানে নৃত্য করা হয়। পরিশেষে ভোগমণ্ডপ—যেখানে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় ভোগ সামগ্রী। তবে কোন ভোগমণ্ডপ নেই এই কোণারক সূর্য মন্দিরে।

রথের আকারে নির্মিত মন্দির—কোণারক সূর্যমন্দির। রথ টানছে সাতটি ঘোড়ায়। এটিতে আছে মোট বারো জোড়া চাকা। সবই পাথরের। প্রতিটি চাকাই অপূর্ব কারুকার্যখচিত। সূর্যদেব বসে আছেন রথে। কোন সারথী নেই। সারথী নিজেই। দূর থেকে দেখলেই মনে হয় যেন শূন্যমার্গে রথ ছুটিয়ে চলেছেন সূর্যদেব।

রথের প্রতিটি চাকার আকৃতিই বিশাল। প্রশস্ত গোলাকার জায়গাগুলিতে সুন্দর সূক্ষ্মভাবে খোদিত—কোথাও সাজসজ্জা ও প্রসাধনেরতা নারী, কোথাও নানা দেবদেবীর, আবার কোথাও রয়েছে বিভিন্ন ভঙ্গীমায় মিলনে লিপ্ত নরনারীর মূর্তি। এ ছাড়াও চাকাগুলির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে নানা লতাপাতা ফুল আর জীব-জন্তুর মূর্তি।

এতই মনোরম কারুকার্যখচিত ভাস্কর্যের শিল্পরূপ—লিখে বোঝানো যায় না। শিল্প-কলার সৌন্দর্য সব সময়েই চোখে দেখে—অনুভবের বিষয়। যে কখনও বর্ষাকালে পাহাড়ী ঝরণার রূপ দেখেনি—তাকে কি বোঝানো যায় সে রূপের কথা!

সমগ্র মন্দিরের নীচের সারিতে—চারদিকে রয়েছে ১৮৫২টি হাতির মূর্তি।

খোদিত হয়েছে নানা ভঙ্গীমায়। এ-গুলির মধ্যে—রাজা চলেছেন হাতির পিঠে—লোক লস্কর নিয়ে। মাথায় অনুচরেরা ধরে আছে ছাতা। সারি সারি চলেছে 'মার্চ' করে। কোথাও কায়দা করে ধরা হচ্ছে হাতি। বনের মধ্যে ঢুকে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা গাছের ডালপালা ভেঙে খাওয়াচ্ছে বন্দী হাতিকে।

এ-ছাড়াও অশ্বারোহী সৈন্যেরা যুদ্ধ-যাত্রা, বলদের পিঠে মাল-বহন, গরুর গাড়ী চড়ে তীর্থ-যাত্রা—পথে বিশ্রাম এবং রান্নার আয়োজন—এমন অসংখ্য মনোগ্রাহী মূর্তি শোভাবর্ধন করেছে কোণারক সূর্য মন্দিরের। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী একটি দৃশ্য আছে এর মধ্যে—এক বৃদ্ধা চলেছেন তীর্থ-ভ্রমণে। যাওয়ার সময় প্রণাম করছে তার পুত্রবধূ। বৃদ্ধা মা তার ছেলেকে আদর করে চুমু খাচ্ছেন মাথায়। নাতিটি জড়িয়ে ধরেছে ঠাকুমাকে—তার ইচ্ছা, কিছুতেই যেতে দেবে না ঠাকুমাকে। এমন মর্মস্পর্শী দৃশ্যগুলি কিছুতেই ভোলা যায় না। এ-গুলি সুন্দরভাবে খোদিত আছে মন্দিরের গায়ে।

নিত্য জীবনের বাস্তব দৃশ্য যেমন আছে এখানে—তেমনই আছে শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত কিছু জীবজন্তুর মূর্তি। প্রাণী জগতে দেখা প্রাণীর সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। যেমন, হাতির পিঠে দাঁড়িয়ে আছে সিংহের মতো একটি প্রাণী—অথচ সিংহ নয়।

সূর্য-মন্দিরের বারান্দার চারদিক উন্মুক্ত। মন্দিরের উন্মুক্ত দেয়ালে রয়েছে নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে অসংখ্য নারীপুরুষের মৈথুনরত দৃশ্য। প্রতিটি দৃশ্যে সুন্দর নিখুঁতভাবে দেহের গড়ন ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পীরা। সমগ্র মন্দিরের গায়ে আছে আরও অন্যান্য অনেক দৃশ্য। তবে শৃঙ্গার ও মিলনেরত দৃশ্যের সংখ্যাই বেশী বলে মনে হয়। বাৎসায়ণের কামসূত্রে উল্লিখিত মিলনের সমস্ত রকম দৃশ্য তো আছেই—তাছাড়াও আছে কিছু বিকৃত কামে লিপ্ত নারীপুরুষের মিলন দৃশ্য। দক্ষ শিল্পীর হাতে খোদিত এই মূর্তিগুলির এমন কারুকার্য, নিখুঁত অঙ্গভঙ্গী—যা চোখে না দেখলে ভাবাই যায় না।

নরনারীর এই সব দৃশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। গালে দাড়ি আছে এমন এক সাধু—শৃঙ্গার ও মৈথুনে রত রয়েছে একটি নারীর সঙ্গে। বাস্তবে এ-ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অনেকক্ষেত্রে আবেগের বশে অথবা শোক দুঃখে কিংবা অন্য কোন কারণে গৃহত্যাগ করে মানুষ। কিন্তু তার কামনা বাসনার নিবৃত্তি হয়নি তখনও। তারপর সাধু জীবনে ক্রমেই চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। কামনায় উদ্বেলিত মন চায় কাম চরিতার্থ করতে। সমাজে এমন নারীরও অভাব নেই—পাত্রাপাত্র বিচারের অবকাশ নেই তাদের। সকলের অলক্ষ্যেই মিলিত হয় তারা। সংযমহীন সন্ন্যাস জীবনের পরিণতি কি হতে পারে—পাথরে খোদিত সুন্দর এই দৃশ্যটিই যেন তার প্রমাণ।

এখানে সময় দেয়া হয়েছে দুঘণ্টা। দেখতে দেখতে কেটে গেল একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। এবার ধন্যবাদ জানিয়ে ছেড়ে দিলাম গাইডকে। হাতে সময় রইলো

মাত্র পনেরো মিনিট। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে চলে এলাম হোটেলে। দেখি, যাত্রীদের অনেকেই বসে গেছেন আহারে। বসলাম আমিও।

ঠিক দশটায় বাস ছাড়লো কোণারক থেকে। সুন্দর রাস্তা। কোথাও খানা-খন্দ নেই। পথের দু-পাশে কখনও ধানক্ষেত—কখনও ধু-ধু করছে ফাঁকা মাঠ। আবার কখনও লোকবসতি। সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল। তাই নারকেল গাছই চোখে পড়ে বেশী। পথে বাস দাঁড়ালো না কোথাও। চললো একটানা। পেরিয়ে এলাম ৬০ কি. মি.।

এবার বাস উঠতে লাগলো পাহাড়ে—ধীরে ধীরে। ওঠার শুরুতেই বাঁ-পাশে রয়েছে সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি। সযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে এটি। একথা বললেন বাসের গাইড। বাস দাঁড়ালো না। পথের দুধারে কাজুবাদাম আর অসংখ্য নাম না জানা গাছপালা।

বাস থামলো। এলাম ধৌলীগিরি। উচ্চতা বেশী নয়—৫২৯ ফুট। কোণারক থেকে এখানে—সময় লাগলো দেড়ঘণ্টা। এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ সময় কুড়ি মিনিট।

বাস থেকে নেমে একটু হাঁটলেই সামনে বিস্তৃত চত্বর। আরও একটু এগোতেই বিশাল বুদ্ধ-মন্দির। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি রয়েছে মন্দিরে। মূর্তিও শ্বেতপাথরের। পরিচ্ছন্ন মন্দির—ঝক্‌ঝক্ করছে।

ধৌলীগিরির এই বুদ্ধ-মন্দিরটির নাম বিশ্ব-কলিঙ্গ শান্তিস্তূপ। এটি উচ্চতায় ৯৯ ফুট। ভারত সরকার এবং জাপানী বৌদ্ধমিশন—যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে স্তূপটি। কোন কারুকার্য নেই। ধবধবে সাদা। বৌদ্ধস্তূপ যেমন হয়—তেমনই এর গঠন শৈলী।

ধৌলীগিরির এই পাহাড়ের সঙ্গে জড়িত আছে অশোকের সম্রাট জীবনের অতীত কিছু স্মৃতি। তাঁর শিলালিপিই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আজও।

এই পাহাড় থেকেই সুন্দরভাবে দেখা যায় দয়া নদী। খুব দূরে নয়। একদা এরই তীরে সংঘটিত হয়েছিল ভয়াবহ কলিঙ্গ যুদ্ধ। সে যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতির স্মৃতি বুকে রয়েছে দয়ার। ব্যথাভরা বুকে, নীরবে বয়ে চলেছে আজও—চলবে আরও কত শত বছর ধরে। লক্ষ লোকের রক্তে ভেসেছিল এই নদী। আহত কয়েক লক্ষ। এ-সবের সাক্ষী ওই দয়া। কথা বলতে পারলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতো। পারেনি। সম্রাটকেও হয়তো ক্ষমা করেনি দয়া।

যুদ্ধে জয়ী হলেন অশোক। কিন্তু চণ্ডাশোক নামে কলঙ্কিত হলেন প্রজাদের কাছে। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভৎসতা আর ভয়াবহ পরিণতি দেখে ব্যথিত হলো অশোকের হৃদয়। বেদনায় অভিভূত হলেন তিনি। আকস্মিকভাবেই আমূল পরিবর্তন ঘটলো মনের। ধৌলীগিরির এই পাহাড়েই দীক্ষা নিলেন তিনি। ধর্ম ও দীক্ষাগুরু হলেন বৌদ্ধভিক্ষু উপগুপ্ত। এবার পরিবর্তিত অশোক—ধর্মাশোক।

এ-কথা ঐতিহাসিকেরা জেনেছেন অশোকের পালিভাষায় লেখা শিলালিপি থেকে। এ-সব ঘটনার সময়কাল আনুমানিক দু-হাজার একশো বছর পূর্বের। বুদ্ধের প্রেম ও অহিংসাবাণীর প্রচার অভিযান অশোক প্রথম শুরু করেন এই ধৌলীগিরি থেকে—যেমন গৌতম স্বয়ং শুরু করেছিলেন বারাণসীর উপকণ্ঠে—সারনাথ থেকে। আরও একটি সুদৃশ্য মন্দির আছে বুদ্ধ-মন্দিরের পিছনে—লাল রঙের। ধবলেশ্বর শিবমন্দির। নামে ধবল—বিশাল কালো পাথরেরই শিবলিঙ্গ। বুদ্ধ মন্দির নির্মাণের সময় খননের কাজ চলেছিল পাহাড়ে। তখনই এটি পাওয়া যায়। একদা দধীচিমুনি এখানে আশ্রম করে কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বরাদ্দ কুড়ি মিনিট সময়। একরকম তাড়াহুড়ো করেই দেখে নিতে হচ্ছে সব। উপায়ও নেই। নইলে ভ্রমণ সূচী অনুসারে দর্শনীয় জায়গাগুলি সব ঘোরা যাবে না। নির্দিষ্ট সময় আর দিনের আলো—এ দুটোর মধ্যেই দেখে নিতে হবে সব। সুতরাং তাড়াহুড়ো একটু আছেই।

বেলা ১১/৫০ মিঃ। বাস ছাড়লো। পাহাড় ছেড়ে নেমে এলো সমতলে। চললো ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে মাত্র ৮ কি. মি.। পনেরো মিনিটেই এসে গেলাম ভুবনেশ্বরে। বাস থামলো মন্দির থেকে একটু দূরে। এখানে দর্শন ও পূজো দেয়ার জন্য বরাদ্দ সময় আধ ঘণ্টা। এলাম লিঙ্গরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে।

উৎকলের শিল্পকলা, ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস বহন করে চলেছে ভুবনেশ্বর—আনুমানিক দুহাজার বছর ধরে। এর প্রাচীন নাম একাম্র-কানন।

দু-ভাগে ভাগ করা যায় ভুবনেশ্বরকে। একটি পুরাতন ভুবনেশ্বর—যেখানে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির। প্রায় সব-কটিই বয়সে বৃদ্ধ। তাদের মধ্যে অন্যতম—লিঙ্গরাজ মন্দির। অপরটি নতুন ভুবনেশ্বর। আধুনিক শহর। আজকের রাজধানী।

পুরাতন ভুবনেশ্বর যেন প্রাচীন মন্দির-মালা দিয়েই গাঁথা। জনশ্রুতি আছে, ছোট বড়—মোট মন্দিরের সংখ্যা ছিল এখানে হাজার দশেক। ধ্বংস হতে হতে এখন দাঁড়িয়েছে সাতশোতে। তবুও মন্দির-নগরী বলা যায় ভুবনেশ্বরকে। একটা শহরে এত মন্দির—আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই।

বর্তমানে লিঙ্গরাজ মন্দির সীমানার ভিতরেই রয়েছে ছোট বড় সত্তরটি মন্দির। এ ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আরও বহু মন্দির। অনেক মন্দির ভেঙে লীন হয়ে গেছে মহাকালের স্রোতে। কিছু জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মন্দির আজও দাঁড়িয়ে আছে—অতিকষ্টে। এক কালে এর রূপ ছিল, যৌবন ছিল—ছিল জৌলুষ। তখন দেখার লোকও ছিল। বয়সে সব গেছে। এখন দেখার কেউ নেই। সংসারে সম্বলহীন বৃদ্ধের শেষ বয়েসটা যেমন হয়। সবাই থেকেও—কেউই

নেই তার। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার অপেক্ষায় যেন দিন গুণছে। আর কিছু মন্দিরের শুশ্রষা চলছে—যদি বাঁচানো যায়।

কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মত, উড়িষ্যায় মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয় প্রথম ভুবনেশ্বর থেকেই। তবে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী—এই সময়কালের মধ্যেই এ-কাজ চলেছিল নিরবচ্ছিন্নভাবে। বিভিন্ন প্রণালী আর উৎকলীয় নিজস্ব ধারার শিল্পকলায় নির্মিত হয়েছে মন্দিরগুলি। অধিকাংশই নির্মিত—বৃত্তাকারে। তবে লিঙ্গরাজ মন্দিরের গঠনশৈলী ভিন্ন ধরনের। অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। স্থাপত্যকলাও অপূর্ব—আকর্ষণীয়।

লিঙ্গরাজ মন্দির। অসংখ্য দৃশ্য খোদিত আছে এর গায়ে। এ-দৃশ্যে কোথাও দুঃখ-বেদনা, গ্লানি, হতাশার চিহ্নমাত্র নেই—নেই অভাবের। সবই আনন্দ-মুখর। যেমন, নানা ভঙ্গীমায় রয়েছে সুদর্শনা নারী মূর্তি—বিভিন্ন পোশাকে। এ-গুলির অলংকার এবং পরিধানগুলির সূক্ষ্ম কাজ নয়নাভিরাম—মনোমুগ্ধকর। অন্যান্য দৃশ্যগুলির মধ্যে আছে নৃত্যরতা নর্তকী, শিকারের দৃশ্য, সেনাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা, বিভিন্ন রণকৌশল, নানা দেবদেবীর আর পশুপাখীদের মূর্তি। মন্দিরের দেয়ালে খোদিত শিল্পকলায় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভোগবাদের। অসংখ্য নারী পুরুষের রমণীয় ভঙ্গীতে শৃঙ্গার ও রমণেরত মূর্তি—শিল্পকলার মাধ্যমে কামকলা-গুলির প্রকাশ—শিল্পীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। মন্দিরের গায়ে যেন বয়ে চলেছে উৎকলীয় স্থাপত্য শিল্পকলার মন্দাকিনী ধারা—শত শত বছর ধরে—আজও।

পাণ্ডাদের তেমন কোন উৎপাত নেই এখানে। তবে সুযোগ পেলে যে ছাড়ে না—এমন দৃশ্যও চোখে পড়লো। যাত্রীদের কেউ কেউ পুজো দিলেন। আবার অনেকেই দিলেন না। কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

এই মন্দির নির্মাণের অতীত ইতিহাসে দেখা যায়, তখন কেশরী বংশের রাজা ছিলেন যযাতি কেশরী। যাযপুর ছিল তাঁর রাজধানী। একদা রাজধানীর পরিবর্তন করলেন তিনি। যাযপুর থেকে ভুবনেশ্বরে।

৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। লিঙ্গরাজ মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করলেন তিনি। শেষ করতে পারলেন না। মৃত্যুর কোলে মাথা রাখলেন রাজা। এবার কাজ চালিয়ে গেলেন তাঁর পুত্র সূর্যকেশরী। পরে নাতি অনন্ত কেশরী। তিনিও পারলেন না মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করতে। তারপর এলেন যযাতি কেশরীর প্রপৌত্র ললাটেন্দু কেশরী। তাঁর প্রচেষ্টায় অসমাপ্ত মন্দির নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হলো ৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। কয়েক পুরুষের প্রচেষ্টা আর ঐকান্তিকতায় নির্মিত হলো লিঙ্গরাজ মন্দির। উচ্চতায় মন্দিরটি ১৬৫ ফুট।

তবে ঐতিহাসিকদের একাংশের মত, কেশরী বংশের রাজা ছিলেন উদ্যোত কেশরী। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরটি তিনি নির্মাণ করেন নবম শতাব্দীতে।

মত যাইহোক, মূল মন্দিরটি সম্পূর্ণ হলেও এই মন্দিরে ভোগমণ্ডপ এবং নাটমন্দির ছিল না তখন। ৭৯২ থেকে ৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয় ভোগমণ্ডপ।

এটি নির্মাণ করেন রাজা কমল কেশরী। এর অ-নে-ক পরে হয় নাটমন্দির। নির্মাণ করেছিলেন রাজা শালিনী কেশরী—১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে।

লিঙ্গরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে উল্লেখযোগ্য মন্দির তিনটি। ভুবনেশ্বরী, নৃসিংহদেব এবং পার্বতী মন্দির। পর্যটক এবং তীর্থযাত্রীরা এ-গুলিই মূলতঃ দর্শন করে থাকেন—অল্প সময়ের মধ্যে।

একটি বিশালাকায় বৃষ-মূর্তি স্থাপিত আছে মূল মন্দির-সংলগ্ন একটি মন্দিরে। এতো বিশাল যে, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখার মতো।

লিঙ্গরাজ মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে আরও অনেকগুলি মন্দির। ফুলের মালার মতো—মন্দির-মালা দিয়েই সাজানো। মূল মন্দিরে লিঙ্গরাজ উজ্জ্বল নীলবর্ণের। উচ্চতায় সাধারণ শিবলিঙ্গের মতো নয়। সচরাচর যেমন দেখি—তেমন নয়। চেপ্টা—পাতানো। রূপোর একটি বড় সাপ বসানো আছে তার উপরে। গোলাকার এই শিবলিঙ্গের পরিধি আট ফুট।

কিংবদন্তী আছে, একদা নাস্তিকতাবাদের আধিক্য দেখা দিল কাশীতে। অথচ, কাশী বিশ্বনাথের প্রাণ। অতিষ্ট হয়ে উঠলেন তিনি। পরামর্শ করলেন দেবর্ষি নারদের সঙ্গে। তাঁরই উপদেশে বিশ্বনাথ লাভ করলেন জগন্নাথদেবের অনুগ্রহ। এলেন নীলাদ্রি পর্বতের উত্তরে—একাম্রকানন এই ভুবনেশ্বরে। অবস্থান করলেন বিষ্ণুর ডানপাশে।

লিঙ্গরাজরূপী বিশ্বনাথের ভুবনেশ্বরে নাম হলো ত্রিভুবনেশ্বর। শিব এবং বিষ্ণু—উভয়রূপেই পূজা করা হয় লিঙ্গরাজকে। তাই হরিহর নামেও পরিচিতি আছে লিঙ্গরাজের। অনেকের ধারণা, এটি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। গঙ্গবংশীয় রাজা ছিলেন অনঙ্গ ভীমদেব। লিঙ্গরাজকে হরিহর রূপে পূজার প্রচলন নাকি তিনিই করেন।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের তিন পাশে প্রতিষ্ঠিত আছে তিনজন পার্শ্বদেবতা। উত্তরে পার্বতী, পশ্চিমে কার্ত্তিক এবং দক্ষিণে রয়েছে সিদ্ধগণেশ।

এখানে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়—পার্বতী মন্দির। বিশাল নয় কিন্তু মন্দিরের গায়ে মনোমুগ্ধকর কারুকার্যই এর আকর্ষণ। মন্দিরটির গঠন-শৈলীর সঙ্গে উড়িষ্যার অন্য কোন মন্দিরের মিল নেই। এটি নির্মাণ করেন রাজা বিজয় কেশরী—৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দিরের ডানদিকে—সিদ্ধগণেশ বিগ্রহটিও অপূর্ব। মন্দির চত্বরে গোপালিনী মন্দিরটিও সুন্দর।

চারদিক উঁচু প্রাচীরে ঘেরা লিঙ্গরাজ মন্দির। এর একটা অংশে আছে পুরীর জগন্নাথদেবের মতো রন্ধনশালা। আনন্দবাজারও আছে। লিঙ্গরাজের প্রসাদ বিক্রি হয় এখানে।

মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত আছে, একদা তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে একাম্রকানন এই ভুবনেশ্বরে এসেছিলেন রাজা যুধিষ্ঠির। দর্শন করেছিলেন ত্রিভুবনেশ্বরকে।

এখানে স্থাপিত মন্দিরগুলির অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে বেলেপাথর দিয়ে।

এগুলি আনা হয়েছিল খণ্ডগিরি থেকে। পাথরের পর পাথর—এইভাবে সাজিয়ে নির্মিত হয়েছে মন্দিরগুলি। কোন মসলাই ব্যবহার করা হয়নি গাঁথুনির সময়। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে—সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে লোহার পাত। মন্দিরের দেয়ালগুলিও চওড়া—হাত দশ-বারো। মসলা ছাড়া নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল একটি কারণে—বিশাল বিশাল পাথর ব্যবহারের জন্যে। মন্দিরের গায়ে মূর্তি আর কারুকার্য খোদিত হয়েছে মন্দির নির্মাণের পর। এটাই ছিল তৎকালীন উৎকলীয় মন্দির নির্মাণ শিল্পীদের রীতি।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছেই পাদহরা পুষ্করিণী। কথিত আছে, একদা কামাতুর দুই অসুরের ভোগের ইচ্ছা জাগে দেবী পার্বতীকে। সে ইচ্ছার প্রকাশ ঘটলো। ক্রুদ্ধা হলেন দেবী। মাটিতে পুঁতে ফেলেন অসুরদ্বয়কে। তখন দেবীর পদাঘাতেই সৃষ্টি হয় এই পুষ্করিণী।

মূল মন্দির থেকে মাত্র তিনশো গজ দূরেই বিন্দুসরোবর। এক-কালে এর চারদিকেই ছিল বাঁধানো সিঁড়ি আর পাঁচিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে, অবহেলায় তা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আবার তৈরী হচ্ছে নতুন করে। লিঙ্গরাজের চন্দনযাত্রা উৎসব হয় এই সরোবরে। প্রতিবছর বৈশাখ মাসে। চলে টানা বাইশ দিন।

প্রবাদ এই যে, স্বয়ং মহাদেব নির্মাণ করেছিলেন এই সরোবর। বিন্দু বিন্দু করে সমস্ত তীর্থের জল এনে পবিত্র করেছেন তিনি। তাই নাম হয়েছে এর বিন্দু সরোবর। তবে ঐতিহাসিকেরা বলেন—মহাদেব নয়, এই সরোবরটি কেশরীবংশের রাজাদেরই অমর কীর্ত্তি।

নীলাচলে মহাপ্রভু আসেন ভুবনেশ্বরের পথ দিয়েই। আসার পথে তিনি স্নান করেন পবিত্র এই সরোবরে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখেছেন,

"তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর,
গুপ্তকাশী বাস যথা করেন শংকর।
সর্বতীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি,
'বিন্দু সরোবর' শিব সৃজিলা আপনি।
শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য,
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য।"

এই সরোবরের চার পাশেই আছে অনেকগুলি মন্দির। পূর্ব পাড়ে অনন্ত বাসুদেব আর ব্রহ্মার মন্দির, পশ্চিমে মার্কেণ্ডেয় মন্দির, উত্তরে উত্তরেশ্বর এবং ভবানীশংকরের মন্দির রয়েছে দক্ষিণে। পার্শীব্রাউন এবং ফার্গুসন প্রমুখ শিল্পবোদ্ধারা এই মন্দিরগুলির অভাবনীয় শিল্পনৈপুণ্য আর ভাস্কর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বহু শিলালিপিই পাওয়া গেছে গঙ্গবংশীয় রাজাদের। তা থেকে পাঠোদ্ধার করে ঐতিহাসিকরা বলেন, ওই বংশের রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের কন্যা ছিলেন চন্দ্রিকা দেবী। ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরটি নির্মাণ করেন তিনি।

নির্মিত হয়েছে লিঙ্গরাজ মন্দিরেরই অনুকরণে। মন্দিরে স্থাপিত আছে জগন্নাথ বলরাম আর সুভদ্রার বিগ্রহ। তবে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এই মূর্তিগুলিতে। বিগ্রহ তিনটিই পূর্ণাঙ্গ। পুরীর মতো হাত পা বিহীন নয়।

এই সরোবরের পশ্চিম দিকে—ভুবনেশ্বরের রথটানার যে পথটি বড় রাস্তায় মিশেছে—সেখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে একটি মন্দির। উচ্চতা ৩৯ ফুট। নির্মিত হয় ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। বোইতাল মন্দির নামেই এটি প্রসিদ্ধ। এর গায়ে খোদাই করা আছে মহিষমর্দিনী, অর্ধনারীশ্বর এবং সাতটি অশ্বযুক্ত রথে সূর্যদেবের মূর্তি।

মন্দিরের ভিতরে—ভৈরব আর চামুণ্ডার বিগ্রহ। গলায় নরমুণ্ডের মালা। অন্যান্য মূর্তিগুলির রূপও ভয়ংকর। অনেকের ধারণা, কোন এক সময় এটি ছিল তন্ত্র সাধনক্ষেত্র। মন্দির প্রাঙ্গণে কারুকার্য খচিত শিশিরেশ্বর মন্দিরটিও সুন্দর—দেখার মতো।

বরাদ্দ সময় শেষ। ছুটোছুটি করেই দেখা। ফিরে এলাম আমি—আর সব যাত্রীরাও। বাস ছাড়লো ১২/৩৫ মিঃ। পথ এক কিলোমিটার। বেশী চওড়া পথ নয়। চললো ধীরে ধীরে। সময় লাগলো পাঁচ মিনিট। দেখতে দেখতে এসে গেলাম কেদার-গৌরী আর মুক্তেশ্বর মন্দির। ভুবনেশ্বরে দর্শনীয় মন্দির-গুলির মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে এই মন্দির তিনটি। বাস ভ্রমণ সূচীতে এই মন্দির তিনটিরই উল্লেখ থাকে। এখানে সব ঘুরে ফিরে দেখার জন্য বরাদ্দ সময় মাত্র পনেরো মিনিট। যাত্রীরা সকলেই নেমে এলেন বাস থেকে। দেখতে চললেন—যে যার মতো।

বিশাল একটি অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। দেখে মনে হলো, আমার জন্মের অনেক আগেই এর জন্ম। এই গাছটার পাশেই গৌরী মন্দির। গাছ আর মন্দির—এ-যেন ভারতের এক প্রাচীন ঐতিহ্য। পাশাপাশিই যেন থাকতে হয় এদের। তার মধ্যে বট অশ্বত্থ হলে তো কথাই নেই। অন্য গাছে যেন মন্দিরের মান বাড়ে না।

গৌরী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। কর-বংশীয়া মহারাণী গৌরী-দেবীর কীর্তি এটি। তাঁর নামানুসারেই হয়েছে মন্দিরের নাম। পাশেই গৌরী আর কেদার নামে কুণ্ড আছে দুটি। এর জল নাকি স্বাস্থ্যপ্রদ।

গৌরী মন্দিরের পিছনের মন্দিরটিই কেদারেশ্বরের। উচ্চতা ৪১ ফুট। শিবলিঙ্গই প্রতিষ্ঠিত আছে মন্দিরে। একটি সরু ঝরণাধারা রয়েছে লিঙ্গের উপরে। জল ঝরছে সর্বদাই। এই মন্দির থেকে একটু এগিয়ে—পিছন দিকে আছে আরও একটি কুণ্ড। চাউল-ধুয়ো কুণ্ড নামে পরিচিত। এর পাশেই একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বড় মূর্তিটি মহাবীরের।' উচ্চতায় ৮ ফুট।

বেশ বাগানের পরিবেশেই কেদার-গৌরী মন্দির। অশ্বত্থ আর বকুলগাছের ছায়া ঘেরা স্থানটি মুগ্ধ হওয়ার মতো। দোকান পাট—মাত্র কয়েকটা আছে এখানে।

কেদার-গৌরী মন্দির থেকে বেরিয়ে ডানদিকে একটু এগোলেই মুক্তেশ্বর মন্দির। কেশরীবংশের রাজাদের কীর্তি বহন করে চলেছে নবম শতাব্দী থেকে। পাথরে চমৎকার সূক্ষ্ম খোদাই-এর জন্যই মুক্তেশ্বর প্রসিদ্ধ। এর শিল্পকলায় একদা মুগ্ধ হয়েছিলেন সাহেব ফার্গুসন। এই মন্দিরটিকে "উড়িষ্যার শিল্পরত্ন" শব্দে ভূষিত করেছেন তিনি।

মুক্তেশ্বর মন্দিরের তোরণ-দ্বারটির উচ্চতা ১৫ ফুট। দ্বারটি সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত। উচ্চতায় মন্দিরটি ৩৫ ফুট। চারদিক প্রাচীরে ঘেরা। মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে—মরীচিকুণ্ড। প্রবাদ আছে, অশোকাষ্টমীর পূর্বরাত্রে, কারও মতে—অশোকাষ্টমীর দিন এই কুণ্ডের জলপান করলে বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভ হয়।

এই মন্দিরের সামনেই একটি প্রাচীর। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে বিশাল চত্বর—যেখানে একই সারিতে রয়েছে ছয়টি মন্দির। এগুলো ছেড়ে একটু এগোলেই সিদ্ধেশ্বর মন্দির—প্রতিষ্ঠিত আছে শিবলিঙ্গ। উৎকলীয় মন্দির নির্মাণ শিল্পের এক পরিপূর্ণ প্রকাশ এই মন্দিরটি। অপূর্ব এর শিল্পকলা বৈচিত্র্য। নির্মিত হয়েছে দশম শতাব্দীতে। কেশরীবংশের রাজাদের গড়া স্মৃতি এটি।

মুক্তেশ্বর মন্দির থেকে সামান্য এগিয়ে গেলেই—রাজারাণীর মন্দির। লাল পাথরের তৈরী। উচ্চতায় ৫৮ ফুট। একাদশ শতাব্দী থেকে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে। ভাস্কর্যের চমৎকারিতার জন্যই এটি প্রসিদ্ধ। অপূর্ব—অপূর্ব এই মন্দিরের গায়ে খোদিত মূর্তিগুলির কলা-নৈপুণ্য আর অঙ্গসৌষ্ঠব। এটি শিব-মন্দির ছিল। এখন কোন বিগ্রহ বা শিব-লিঙ্গ নেই এখানে। পূজাদিও কিছু হয় না।

মন্দির ছাড়াও ভুবনেশ্বরে আছে অনেকগুলি আশ্রম। যেমন আছে—রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা—রামকৃষ্ণ মঠ, গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবনের নিম্বার্ক আশ্রমের একটি শাখা—কাঠিয়াবাবার আশ্রম, পুরীর সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরের একটি শাখা—জগন্নাথমঠ। এমন আরও বহু মঠ মন্দির আশ্রম আছে এখানে।

একদা কাঠিয়াবাবার এই আশ্রমে অবস্থান করছেন ব্রজবিদেহী মহন্ত সন্তদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁরই এক শিষ্য নির্মল মিত্র—সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন গুরুভাই। গুরু সন্তদাসকে দর্শন-উদ্দেশ্যে আসছেন আশ্রমে। আসার পথে দেখলেন, কয়েকজন সাধু বসে আছেন—লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনে। চলতে চলতেই নমস্কার করলেন হাতজোড় করে।

এলেন আশ্রমে। আসামাত্রই তিরস্কার করলেন বাবাজী মহারাজ। বললেন,—কি গো, এ তোমাদের কি রকম ব্যবহার! শ্রদ্ধা করতে শেখোনি। দূর থেকে কপালে হাত ঠেকালেই কি শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়? সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে তাঁদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয় ভক্তিভরে। তা করলে না কেন?

বিস্মিত হলেন আশ্রমের উপস্থিত সকলে। অনন্ত শক্তির অধিকারী গুরু মহারাজ। অজানা তাঁর কিছুই থাকে না। দিব্যদৃষ্টি যে তাঁর সুদূর-প্রসারী।

দুঃখীর সময় কাটতে সময় লাগে—ভ্রমণকারীর লাগে না। বিশেষ করে নিজেকে উজাড় করে দেয়া ভ্রমণে। এসে বসলাম বাসে। আমার মতো আর সকলেও। বাস ছাড়লো মুক্তেশ্বর থেকে। সময় বেলা ১২/৫৫ মিঃ।

বাস চললো ভুবনেশ্বরের রাজপথ ধরে। গতি একেবারেই শান্ত। এতটুকু তাড়া-হুড়ো নেই। ডাইনে বায়ে রাজ্য সচিবালয়, রাজ্য সংগ্রহশালা, বিধানসভা ভবন, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়—এগুলো সব দেখিয়ে দেখিয়ে বলতে থাকেন বাসের গাইড। সাজানো শহর পার হয়ে এলাম শহরতলীতে। এবার গতি বাড়লো বাসের। দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম ১৩ কি. মি.। বেলা ১/১৫ মিঃ—বাস এসে থামলো দুটি মাঝারী পাহাড়ের পাদদেশে। কটক রোডের ওপর। ডানপাশে উদয়গিরি—বাঁপাশের পাহাড়টি খণ্ডগিরি। এখানে যাত্রীদের কপালে বরাদ্দ সময় ৪৫ মিঃ। চটপট্ দেখে নিতে হবে—দর্শনীয় যা কিছু।
শহর ভুবনেশ্বরের পশ্চিমে উদয়গিরি—উচ্চতা ১১০ ফুট। খণ্ডগিরি—১৩৩ ফুট। উদয়গিরিতে উঠতে তেমন কষ্ট হয় না। বাঁধানো ঢালাই করা পথ। উঠে গেছে ক্রমশ। উঠছে আর সকলে। এই ভ্রমণে আমি কিন্তু একা নই। সহযাত্রীরা সকলেই আমার সঙ্গী। অসংখ্য ভ্রমণার্থী। বাস একটা নয়—এসেছে অনেকগুলি। সবই এসেছে পুরী থেকে। একই সময়ে। ভ্রমণসূচীতে নির্ধারিত সময় সকলেরই এক। ফলে একই সময়ে—একই জায়গায় প্রচুর ভ্রমণার্থী। কেউ আমার সাময়িক সঙ্গী হয়ে পথ চলছে—কখনও চলেছি একা। এইভাবেই ঘুরছি একের পর এক দর্শনীয় স্থানগুলি।
এখানে উভয় পাহাড়ের গায়েই রয়েছে অনেকগুলি গুহা। সবই খোদাই করা—প্রাকৃতিক নয়। এ-গুলি প্রাচীন ভারতের গুহা-স্থাপত্যের এক অন্যতম নিদর্শন। ঐতিহাসিক নামও আছে এই গুহাগুলির। বিভিন্ন জীব-জন্তুর আকৃতিতে খোদিত—তাই নাম হয়েছে এর ব্যাঘ্র গুহা, হস্তি গুহা ইত্যাদি।
উদয়গিরিতে রাণীহংসপুর গুহাটি প্রসিদ্ধ। এটি দোতলা। এ-ছাড়া মঞ্চপুরী, স্বর্গপুরী গুহাদুটিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। হস্তি গুহায় ব্রাহ্মী এবং পালিভাষায় খোদাই করা আছে শিলালিপি। এ-গুলি আজও আছে অক্ষুন্ন এবং সংরক্ষিত অবস্থায়। এতে উল্লিখিত হয়েছে সম্রাট খারবেলের চোদ্দ বছরের রাজত্বকালের বিস্তৃত বিবরণী। এই গুহাগুলি খোদিত হয়েছে আনুমানিক ২১০০ বছর আগে। গবেষকরা এ-কথা জেনেছেন শিলালিপি থেকে।
পাহাড় দুটিতে সন্ন্যাসীদের তপস্যার জন্য খনন করা হয় ১১৭টি গুহা। এ-গুলি সব সম্রাট খারবেলের অবদান। ঐতিহাসিকদের অনুমান, উদয়গিরি পাহাড়ে একটি বিরাট সভাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন খারবেল। যেটি নির্মিত হয়েছিল নানা মূল্যবান পাথর আর স্তম্ভ দিয়ে। কালের প্রভাবে তা ধ্বংস হয়ে যায়। তবে ধ্বংস-স্তূপের চিহ্ন আজও বর্তমান।

জনশ্রুতি আছে, ওদিকে ধৌলী পাহাড়ে সম্রাট অশোকের এবং এ-দিকে উদয়গিরি পাহাড়ে সম্রাট খারবেলের অস্থি সংরক্ষিত আছে।

এখানকার শিলালিপি থেকে ঐতিহাসিকেরা আরও জেনেছেন, চেদী-নামে এক রাজবংশ রাজত্ব করতে। এখানে। সেটা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তার কিছু আগে। তারা নিজেদের পরিচয় দিতেন 'মহামেঘ-বাহন' বলে। খারবেল এবং কুদেপ—এই দুজন রাজাব নাম জানা গেছে উক্ত বংশের।

মাত্র বছর পঁচিশ বয়সে সম্রাট হয়েছিলেন খারবেল। জয় করেছিলেন বহু দেশ। অগাধ বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তিনি। অত্যন্ত পটুও ছিলেন খেলাধুলায়। তাঁর রাজত্বকালে—তিনিই গুহাগুলি খনন করিয়েছিলেন উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরিতে। এই গুহাগুলিতে তপস্যা করতেন বহু বৌদ্ধ ও জৈন শ্রমণ সন্ন্যাসীরা। তাঁদের তপস্যার উদ্দেশ্যেই সম্রাট গুহাগুলি খনন করান। অল্প কিছু গুহা নির্মিত হয়েছে—যে-গুলি দোতলা। যার থামগুলি খুব সুন্দর।

তখনকার সন্ন্যাসীদের কঠোরতার নিদর্শন পাওয়া যায় এই গুহাগুলি থেকে। গুহার দেয়ালের দিকে পাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে বালিশ—যাতে মাথা দিয়ে শুতেন সন্ন্যাসীরা। গুহাগুলির উচ্চতাও বেশী নয়। কোন জিনিষপত্র রাখার ব্যবস্থাও নেই—হয়তো তাঁদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল নিতান্তই কম।

সম্রাট খারবেলের সময় কোন মূর্তিই ছিল না গুহাগুলিতে। জৈন ও বৌদ্ধরা কেউই বিশ্বাসী ছিলেন না মূর্তি পূজায়। তাঁরা উপাসনা করতেন প্রতীকের। যেমন, গাছকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করার প্রতীক রয়েছে অনন্ত গুহায়। পরবর্তী সময়ে কিছু গুহার গায়ে চব্বিশজন তীর্থংকরের নগ্নমূর্তি খোদিত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা, এ-গুলি করেছিলেন রাজা উদ্যত কেশরী।

হাতি গুহায় খারবেলের শিলালিপি থেকে জানা গেছে, উদয়গিরি পাহাড় থেকে দেখা যায় সূর্যোদয়—তাই নাম দেয়া হয়েছে উদয়গিরি। পালিভাষায় লেখা সম্রাট অশোকের শিলালিপিও পাওয়া গেছে এই পাহাড়ে।

উদয়গিরি থেকে নেমে এলেই রাস্তা। পার হলেই খণ্ডগিরির পাদদেশ। সারি সারি কিছু দোকান রয়েছে রাস্তার দু-পাশে। কেনার মতো কিছুই নেই। দোকানগুলি শুধু খাবার আর চায়ের।

বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় খণ্ডগিরি পাহাড়ে। উঠতে লাগলাম আমিও। উঠতে লাগলো অনেকেই। এক নাগাড়ে ওঠা যায় না। হাঁপিয়ে উঠতে হয়। সামান্য জঙ্গল রয়েছে পাশে। গাছের ছায়া ঘেরা সিঁড়ি। প্রাকৃতিক শোভা আর পরিবেশ এখানকার সত্যিই সুন্দর। তেমন লোকবসতি চোখে পড়লো না। উঠে এলাম ধীরে ধীরে। একেবারে উপরে—সমতল বাঁধানো চত্বরে।

একটি সুন্দর জৈন-মন্দির আছে এখানে—আছে পাশ্বর্মন্দিরও। কারুকার্য নেই

কোনও মন্দিরে। একেবারেই সাদামাটা। তবুও এ-গুলির গঠনশৈলী বড় সুন্দর। তবে উড়িষ্যায় প্রচলিত মন্দিরের ধাঁচে এ-মন্দির নির্মিত হয়নি। ইংরাজ রাজত্বকালেই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এখানকার অনন্ত-গুহা আর ললাটেন্দু কেশরী গুহা—এ-দুটির খোদাই প্রণালী অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মন্দির চত্বর থেকে দেখা যায় বহুদূরে—শহর ভুবনেশ্বর।

মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে একটি মূর্তি—জৈন তীর্থংকরের। কুচকুচে কালো পাথরের। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র এই খণ্ডগিরি।

জৈনদের একটি ধর্মশালা আছে এখানে। এই পাহাড়ের পাদদেশেই আছে একটি যুব-হোটেল, বৈষ্ণব মঠ আর ডাকবাংলো একটি।

এখানে ভ্রমণসূচী অনুসারে নির্ধারিত সময় শেষ হলো। সকলেই ফিরে এলো—বসলো যে যার আসনে। বাস ছাড়লো। এখন বেলা দুটো। একদিনের বাস ভ্রমণ। ভ্রমণ সূচীর শেষ দর্শনীয় স্থানটি এবার নন্দনকানন।

উদয়গিরি থেকে নন্দনকানন—২১ কি. মি.। একটানা বাস চলার পর থামলো—একেবারে নন্দনকাননের দোর গোড়ায়।

সুন্দর নাম—নন্দনকানন। আসলে এটি একটি পশুশালা। বিস্তির্ণ বনাঞ্চলকে নিয়ে উড়িষ্যা সরকারের উদ্যোগে রচিত একটি সুন্দর মনোরম উদ্যান। প্রবেশ মূল্য এখানে দু টাকা। আরও দু টাকা লাগে 'লায়ন সাফারী'র জন্য। একটি ঘেরা জায়গায় সিংহ ছাড়া আছে—তার মধ্যে গাড়ীতে করে নিয়ে যাবে। একেবারে কাছ থেকে দেখা যাবে সিংহ। এরজন্যই অতিরিক্ত টাকাটা লাগে। যারা এটা দেখবে না—তাদের লাগবে না। বাধ্যবাধকতা কিছুই নেই।

নন্দনকাননে আছে বহু দুষ্প্রাপ্য জন্তু—যা ভারতের অন্য কোন পশুশালায় থাকলেও তা নামমাত্র—কোথাও নেই-ই। যেমন এখানে আছে ১৯ ফুট লম্বা কুমীর, ৩২টা সাদা বাঘ, ৩৪টা সিংহ, ৬ ইঞি বানর, ৪০ কেজি ওজনের ইঁদুর—এমনতর অনেক প্রাণী। সুন্দর একটি কুমীর প্রকল্পও আছে এই কাননে।

এ-সবই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন বাসের গাইড। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশও চমৎকার। এমন পরিবেশে, এমন পশুশালা—নন্দনকাননের পর গৌহাটির স্থান। বাচ্চা থেকে বুড়ো—সকলেরই ভালো লাগবে উড়িষ্যার এই নন্দনকানন। সবচেয়ে বেশী ভালো লাগবে শিশুদের। ভালো লাগবে না তাদের—যাদের ভালো লাগে না শিশুদের।

ভ্রমণকারীদের জন্য এখানে নির্ধারিত সময় মাত্র দেড়ঘণ্টা। সম্পূর্ণ দেখা যায় না এ-টুকু সময়ে। বিশেষ বিশেষ আকর্ষণীয় প্রাণীগুলি দেখিয়ে দেন গাইড—স্বল্প সময়ের মধ্যে। তাতেই মন ভরে যায়। তাছাড়া সারাদিনের ক্লান্তিও একটা এসে যায়—দেহ মনে। অত ঘোরার প্রবৃত্তিও থাকেনা শেষটায়।

বিকেল ৫টা। শেষ হলো একদিনের ভ্রমণসূচী। বাস ছাড়লো নন্দনকানন

থেকে। চলতে লাগলো বাঁধা গতিতে। পথে দাঁড়ালো না কোথাও। টানা চললো আড়াই ঘণ্টা। পেরিয়ে এলাম ৯৩ কি. মি.। এবার আর স্বর্গদ্বার নয়। বাস এসে থামলো সমুদ্রের কাছেই—হরিহর চকে। ঢুকতে দেয়া হয় না স্বর্গদ্বারে। থেমে যায় একটু আগেই। বিকেলে ভ্রমণকারীতে ভরে যায় স্বর্গদ্বার—পথ ঘাট। অসুবিধে হবে তাই।

সাধুসঙ্গ—সাধুদের কু-অভ্যাস প্রসঙ্গে

একবার ভুবনেশ্বরে ছিলাম তিনদিন। গেছি লিঙ্গরাজ মন্দিরে। দেখি মন্দিরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন এক সাধুবাবা। একেবারে আপন-ভোলা হয়ে। তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করছে। কারও দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। যাত্রীরা যেমন —সাধুবাবাও তেমন। কেউই কাউকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। যে যার নিজের মতো আছে।

এই সাধুবাবা ফরসা তো নয়ই—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও নয়। কালচে তামাটে বললেই ঠিক বলা হবে। অস্থিচর্মসার দেহ বলবো না। সামান্য মাংসের উপর চামড়া লাগানো। না দোহারা—না ছিপছিপে। এর মাঝামাঝি চেহারাটা যেমন দাঁড়ায—তেমনই সাধুবাবার দেহটা। লম্বায় প্রায় পৌনে ছ-ফুট—এটা আন্দাজ। ছোট্ট এক টুকরো কাপড় পরা। কাপড়টা বড় কাপড়েরই একটা ফালি। নেমে এসেছে হাঁটুর প্রায় আট আঙুল উপর পর্যন্ত। তবে ছেঁড়া নয়। ময়লা—বেশ ময়লা। বহুদিন জলের মুখ দেখেনি। পাশেই আছে ছোট্ট একটা ঝুলি। বাইরে থেকে বোঝা যায়—ভিতরে কিছুই নেই। বাজারে যাওয়ার সময় ব্যাগের যেমন চেহারা।

লম্বাটে মুখের গড়ন। ভাঙা চোয়াল। কমনীয় চোখদুটো বসে গেছে। মাঝারী আকারের চোখ। অসম্ভব আকর্ষণীয় মুখমণ্ডল। উজ্জ্বল। এমন উজ্জ্বলতা কোন প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহারেও হয় না। বেশ বড় জটা আছে মাথার মাঝখানে। টোপরের মতো—বাঁধা। দাড়ি নেমে এসেছে পেটের কাছাকাছি। পাশে চিমটে বা কমণ্ডলু—কিছুই নেই। বয়েসে বৃদ্ধ। বয়েসের আন্দাজ করতে পারলাম না। যদি কথা হয়—কথায় কথায় জেনে নেবো সাধুবাবার বয়েসের কথা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। দাঁড়ালাম সামনাসামনি। সাধুবাবা বসেছিলেন এক-পায়ের উপর আর এক পা তুলে। আধমোড়া করে। ঝট্ করে প্রণাম করতেই টেনে নিলেন পা-দুটো—একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে। তাকালেন মুখের দিকে। এবার হাতদুটো জোড় করে মুখে বললেন—নমো নারায়ণায়।

বসলাম সাধুবাবার সামনে। বেশ কাছাকাছি—মুখোমুখি হয়ে। কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু করবো—ভাবতে ভাবতেই বলে ফেললাম,

—বাবা, এখানে কি কোথাও ডেরা আছে আপনার—না তীর্থদর্শনে এসেছেন ?
কোন উত্তরই দিলেন না। বসে রইলেন চুপ করে। শুধু আমার মুখের দিকেই তাকাচ্ছেন। কাটলো এইভাবে মিনিট খানেক। আবার ওই একই প্রশ্ন করলাম। এবার মুখ খুললেন,
—নেহি, মেরা কাঁহি ডেরা নেহি হ্যায়। শিউজীকা দর্শন করনে আয়া হুঁ।
সাধুবাবার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলাম—কতদিন আছেন এখানে ?
কোন উত্তর দিলেন না। বসেই রইলাম—চাতকের মতো। কাটলো আরও মিনিট পাঁচেক। আবার বললাম। কথাটা শুনেও শুনলেন না। তাকিয়ে রইলেন অন্যদিকে। মনেই হলো, কথা বলতে অনিচ্ছুক। তীর্থযাত্রীরা আসছেন অনেকেই। পাশ থেকে এক নজর দেখে নিয়ে চলেও যাচ্ছেন। আবারও জিজ্ঞাসা করলাম ওই একই কথা,
—বাবা, কতদিন আছেন এখানে ?
এবার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন। মনেই হলো—অনিচ্ছায়,
—পাঁচ রোজ।
এ-কথার পর ভাবলাম, এঁদের বিরক্ত করার অধিকার আমার নেই। অথচ না করেও তো উপায় নেই। নইলে জানবো কেমন করে ? বসে রইলাম। দেখি, সাধুবাবা নিজের থেকে কিছু বলেন কিনা ? কাটলো আরও মিনিট পনেরো। একটা কথাও বললেন না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন একবার—আবার আমার মুখের দিকে। ভাবে মনে হলো, তিনি যেন জানতে চাইছেন—আমার উদ্দেশ্য কি ? কেটে গেল আরও কিছুটা সময়। একইভাবে বসে রইলেন সাধুবাবা। স্থির হয়ে। দেহের কোন অংশই নড়ছে না। দুম্ করে বললেন,
—ভাগ্, ভাগ্ হিঁয়াসে। সাধুর হাঁড়ির খবর নিতে এসেছে ? সারাজীবন ধরে কি করলাম—এখন তাই বলো ওনাকে—কি জন্যে বলবো তোকে আমার জীবন-কথা ?
একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম এ-কথায়। অন্তর্যামী সাধুবাবা। ধরে ফেলেছেন আমার মনের কথা। তবে মোটেই আমল দিলাম না। বসেই রইলাম। বোকার মতো। কাটলো আরও মিনিট দশেক। এবার একটু ক্ষুব্ধভাবেই বললেন,
—কিরে, উঠলি না এখনও। কোন কথাই বলবোনা তোকে। যা—যা—এখান থেকে।
মাথাটা নীচু করেই বসে রইলাম। একটা কথাও বললাম না। দেখি না শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়। কেটে গেল আরও কিছুটা সময়। হঠাৎ গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন,
—কি রে, কি ভাবছিস্ ?

মাথাটা তুললাম। 'কিরে কি ভাবছিস্'—কথাটায় এমন একটা সুর—আগের সুরের সঙ্গে কোন মিলই নেই। বিরক্ত মা শিশুর উপর রাগ করার পর যে সুরে আদর করেন—ঠিক তেমন সুরেই বললেন। একেবারে অবাক, অভিভূত হয়ে গেলাম। এবার বললেন,

—রাগ করলি ? তুই সাধুসঙ্গ করতে এসেছিস—দেখছিলাম, তোর ধৈর্য আছে কি না ? দেখলাম, ঠিকই আছে। এবার বলতো বেটা, কি জানতে চাস্ তুই ?

ভাবলাম, কত ভাবের—কত বিচিত্র মনের মানুষ আছে—তার ইয়ত্তা নেই। বাইরে এক ভাব—অন্তরে আর এক। দেখে বোঝার কোন উপায়ই নেই। খুব কম সাধুকেই দেখেছি—যাঁরা প্রথমেই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন আমাকে—কোন রূঢ় কথা না বলে। অধিকাংশই চেয়েছেন সরিয়ে দিতে—বুঝেছেন, বিরক্ত করবো তাঁদের। পরে ভাবতেই পারিনি—এমন সুন্দর উদার অন্তর মানুষের হতে পারে ! প্রথম অবস্থায় বিরক্তই হতাম সাধুদের আচরণে। পরে বুঝেছিলাম, ক্রোধ বা গালাগাল তাঁদের অন্তরের নয়। এড়িয়ে যাওয়ার একটা ছল-মাত্র। তাই আর বিরক্ত তো হতামই না—বরং বুঝে যেতাম, জানতে পারবো অনেক কথা। পেয়ে যাবো জিজ্ঞাসার অনেক উত্তর। পেয়েছিও তাই। দার্শনিক এমেরসন বলেছেন, 'ধৈর্য তিক্ত হলেও তার ফল মিষ্ট।' কথাটা সত্য—একেবারে সত্য। তবে এত বেশী তিতো যে, কালমেঘও হার মেনে যায়। ধরা যায় না। এ-সব কথা ভাবতে ভাবতেই বললাম সাধুবাবাকে,

—বাবা, জানতে চাই তো অনেক—অ-নে-ক কথা। আপনি কি বলবেন দয়া করে ?

মুখে হাসি ফুটে উঠলো সাধুবাবার। সাজানো দাঁত। ফুটফুটে সাদা। হাসিভরা মুখখানা যেন দয়ায় ভরে উঠলো। বললেন,

—দয়া বলছিস্ কেন ? দয়া কি মানুষ করতে পারে ? ভগবান ছাড়া মানুষের সাধ্য কি যে সে দয়া করে ! তোর কি জিজ্ঞাসা আছে বল্—সাধ্যমতো চেষ্টা করবো উত্তর দিতে।

মনে কিছুটা জোর পেয়েই বললাম,

—আপনার কথাটা ঠিক। সব সাধুরাই বলেন, ভগবান কাউকে স্বরূপে এসে দয়া করেন না। তাঁর দয়া প্রকাশের মাধ্যমই মানুষ। তিনি মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষ শুধু নয়—সমস্ত জীবেই দয়া করেন।

কথাটা শুনে মাথাটা নাড়লেন। এবার প্রথমেই জানতে চাইলাম,

—বাবা, সংসার ছেড়ে এক আনন্দময় জীবন-যাপন করছেন আপনি। আমরা যারা গৃহী—সংসারে আছি—তাদের শান্তি পাওয়ার উপায় কি কিছু বলতে পারেন ?

সাধুবাবা মাথাটা বেশ দোলাতে লাগলেন। তারপর একটু সোজা হয়ে বসে বললেন,

—বেশ জবর প্রশ্ন করেছিস্। সাধুরাও তো শান্তির খোঁজেই বেরিয়ে পড়ে সংসার ছেড়ে। ভগবানকে তো ঘরে বসেও পাওয়া যায়—তাহলে আর বেরোয় কেন! তবে শোন বেটা, সংসারে সুখ-দুঃখ থাকবেই—থাকবে। কোন না কোনভাবে দুঃখ বিচলিত করবেই—করবে। কোন মানুষই এর থেকে একেবারে মুক্তি পেতে পারে না। সুখ-দুঃখ—এর মধ্যে জীবনব্যাপী দুঃখের ভাগটাই বেশী। মানুষের যে-টুকু সুখ—যা কিছু দুঃখ, তা জানবি ভগবানেরই ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাত নেই কারও। এটা রোধও করা যায় না। এটাই সত্য। এটাই যখন সত্য—তখন তাঁর উপরেই সব ছেড়ে দে। যখন যেটা হচ্ছে, যা হচ্ছে—মেনে নিতে চেষ্টা করবি। এই চেষ্টাই অভ্যাসযোগ। খুব কঠিন। এই অভ্যাস ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকলে মন ধীরে ধীরে হবে নির্বিকার। দেখবি, সংসারের কোন আবিলতা, কোন অশান্তিই তোকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোন অবস্থাতেই। সুখ-দুঃখ—সব অবস্থাতেই মন থাকবে সদানন্দময়। এ-ছাড়া বেটা, সংসারে শান্তি পাওয়ার আর কোন পথ আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

কথাটা শেষ হতে না হতেই বললাম,

—'সব ছেড়ে দে' কথাটা তো বললেন বেশ সহজভাবেই। দেরী হলো না এতটুকু। কিন্তু সংসারীদের পক্ষে তা কি সহজেই সম্ভব?'

একটু গম্ভীর ভাবেই বললেন,

—হাঁ বেটা, কথাটা বললাম সহজভাবেই। সংসার ছেড়েও অনেক সাধুই তো তা পারেনি। সংসারীদের পক্ষে এ-কাজ তো আরও কঠিন। তবুও চেষ্টা থাকলে মন একদিন না একদিন নির্বিকার হবেই—হবে। তবে একদিন বা এক মাসের চেষ্টাতে তা হবে না। সব সময়েই মনে রাখবি, কোন কিছু পেতে হলে—সেই বিষয়ে লেগে থাকতে হবে। হচ্ছে না বা হবে না বলে ছেড়ে দিলে হবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের এই চাওয়াটুকু পূরণ হবে না—এ-কথায় আমি অন্তত বিশ্বাস করি না।

এই কথাটুকু বলেই থামলেন। মুখে হালকা হাসি ফুটে উঠলো এবার। বললেন,

—বেটা, সংসারে মেয়েরা মানসিক অশান্তিভোগ করে বেশী। পুরুষ রোপণ করে সৃষ্টির বীজ। তা ধারণ এবং যত্নের সঙ্গে পালনে—নারীই তো সব। বাগানের মালী হয়ে যায়। ফলে মায়া আর আসক্তিও জন্মায় বেশী। আর সংসারী মেয়েরা সন্দেহমনা হয়। স্বামীর উপরে সন্দেহের ভাব একটা এদের সারাজীবনই থেকে যায়। কেন জানিস্? দেহ-মন সবদিয়ে স্বামীকে অবলম্বন করে বলে। তাই সংসারে এদের মানসিক কষ্ট আর অশান্তিও ভোগ করতে হয় পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী।

কথার মাঝেই একজন যাত্রী এসে দাঁড়ালেন সামনে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন সাধুবাবা। একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে যেতেই শুরু করলেন,

—প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু চাইবি না—ভাববিও না কিছু। তা হলেই শান্তি

আসবে। নইলে অশান্তিকে রোধ করতে পারবি না। খাওয়া পরার বিষয় নিয়ে মনে কখনও অশান্তি রাখবি না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও-দুটো যে কোনভাবে জুটবেই—জুটবে। তবে প্রয়োজনীয় যে কোন দ্রব্য বা বিষয় পাওয়ার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখতে নেই। তাতে ভোগ কাটে। পেলে ভালো—না পেলেও ভালো। এই ভাবটা রাখবি। অশান্তি কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না তোকে।

ভাবলাম, সংসারে হাজার রকম সমস্যা। সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে নির্বিকার হওয়া—এ এক কল্পনাতীত ব্যাপার। নির্বিকার হতে চেষ্টা করাটাই তো একটা সমস্যা। যার কালকের সংগ্রহ নেই—সে আজ না ভেবে থাকবে কেমন করে! এবার জানতে চাইলাম,

—সারা জীবনটাই তো কাটিয়ে দিলেন সাধন ভজনে। মন স্থির করার কায়দাটা নিশ্চয় জানেন। ঈশ্বর চিন্তার সময় সারা দুনিয়ার চিন্তা এসে ঢোকে মাথার মধ্যে। অনুগ্রহ করে বলবেন বাবা, কি করলে মনটা স্থির না হোক—অন্তত অস্থিরতাটা যাতে কমে।

এ-প্রশ্নে বেশ চিন্তার একটা ভাব ফুটে উঠলো সাধুবাবার চোখে মুখে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়েই বললেন,

—বেটা, সংসার জীবনেই বল্ আর সাধুজীবনেই বল্—মানুষ মাত্রেরই মন চঞ্চল থাকবেই—থাকবে। সংসারে থাকলে একটু বেশী। এ-জীবনে একটু কম—পার্থক্য এই যা। তবে মনকে স্থির করতে কোন কায়দা বা কৌশল নয়—অভ্যাসই প্রধান। এর পথ একটাই—বীর্যধারণের অভ্যাস। ওটা ধারণ করতে না পারলে মন কিছুতেই স্থির হবে না। দেহরাজ শুক্র চঞ্চল হওয়া মানেই—মন চঞ্চল অস্থির হওয়া।

কথায় এবার ছেদ পড়লো। একদল তীর্থযাত্রী এসে উপস্থিত হলেন আমাদের সামনে। এরা বাঙালী নয় কেউই। ঝপাঝপ্ প্রণাম শুরু করে দিলেন সাধুবাবাকে। আশীর্বাদের সময়টুকুও পেয়েছিলেন কিনা সাধুবাবা—বলতে পারবো না। কয়েকজনের প্রণাম পেয়ে গেলাম আমিও। চুল দাড়ির দৌলতে। জোর করে একজনকেও আটকাতে পারলাম না? না পারলেন সাধুবাবা—না আমি। প্রণামীও পড়লো কিছু। শেষ হলো প্রণামপর্ব। এরা বিরক্ত করলেন না কেউই। একে একে এগিয়ে গেলেন—যেমন এসেছিলেন। মহিলা পুরুষ নিয়ে তাও জনাপনেরো হবে। সকলে চলে যেতেই দুজনে হাসলাম—মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে। পয়সাতে হাত দিলেন না তিনি। কুড়িয়ে রাখলাম এক জায়গায়। আবার বলতে শুরু করলেন নির্বিকার সাধুবাবা,

—যে সব কুমার বা বিবাহিত পুরুষের মন বড় বেশী অস্থির—একেবারে নিশ্চিত জানবি—শুক্রক্ষয় হচ্ছে তার অতিমাত্রায়। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় ছাড়া মন কারও অত অস্থির হতে পারে না। তবে কৈশোরের শেষ থেকেই এর শুরু।

সাধুবাবা এবার চোখ বুজে বলতে লাগলেন,

—তবে একটা কথা আছে বেটা। বীর্যধারণ করলেই যে রেহাই হয়ে গেল — মন স্থির হয়ে যাবে—তা নয়। বীর্যধারণ করলেই বেড়ে যাবে কাম। অসম্ভব বেড়ে যাবে। বীর্যের বড় তেজ। কাম বাড়লেই বেড়ে যাবে ক্রোধ। ফলে মন আরও চঞ্চল—আরও অস্থির হয়ে উঠবে। এ-সব উপসর্গ আসবে বীর্য ধারণের প্রথম অবস্থাতেই। কিছুদিন সংযমে থেকে বীর্য ক্ষয় না করলেই তা স্থির হয়ে যাবে। দেহ মনের শক্তি যাবে বেড়ে। মনের অস্থিরতা একেবারেই চলে যাবে। তখন মন হয়ে উঠবে আনন্দময়। সংযমের প্রথম অবস্থায় শুক্র চঞ্চল করে মনকে—পতনের জন্য। বীর্যধারণ করতে না পারলে বেটা, ধর্মজগতে কেউই এগোতে পারবে না—পারেও না। ও পথে এগোতে গেলে এটা করতেই হবে।

কথাগুলো শুনলাম—প্রশ্ন এলো মনে। জানতে চাইলাম,

—বাবা, সংসার মানেই নারীপুরুষের সম্যক যোগাযোগ। কুমার কুমারীকে দেখে কামের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। কু-অভ্যাসে ক্ষয় করছে শুক্র। বিবাহিত যারা —সংসারে থেকে তাদের পক্ষেই বা বীর্যধারণ করা কি করে সম্ভব? তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, ভগবানের রাজত্বে কেউই এগোতে পারবে না।

কথাটা শুনে এতটুকু দেরী করলেন না। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়েও গম্ভীর কণ্ঠে সাধুবাবা বললেন,

—সংসারে অসম্ভব কিছুই নয়। বীর্যধারণ করতে হলে প্রথমেই সংযমে রাখতে হবে মনটা। এরজন্য চাই সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ আর সদ্‌গ্রন্থপাঠ। এ-গুলো মনের উপর ক্রিয়া করে দারুণভাবে—যা বীর্যধারণের সহায়ক। তবে হাজার কাজের মধ্যেও সময় করে এ-কাজগুলো নিয়মিত করা চাই। নইলে কোন ফল হবে না। মনকে বাঁধার দড়ি হলো ওই তিনটে কাজ।

এবার হাসতে হাসতেই বললেন রসিকতার সুরে,

—নারীই বল্ আর পুরুষই বল্—ভোগের জন্যে মন তো ছুকছুক করবেই। তাই মনে বিপরীত ভাবের সৃষ্টি হয়—এমন যে কোন বিষয় আর একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারীর সংস্পর্শ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। এটাও অভ্যাস করতে হবে। এড়িয়ে চলার অভ্যাসটাই তো একটা যোগ—অভ্যাস-যোগ, সংযমতা। গীতায় ভগবান বলেছেন—'বহ্নির যেমন উষ্ণতা, চঞ্চলতাই মনের ধর্ম। যোগ ও অভ্যাসের দ্বারা মনকে সংযম করতে হয়।' অভ্যাস-যোগ ছাড়া কিছুতেই—কোনভাবেই বীর্য-ধারণ করা সম্ভব নয়।

কথাটা শুনে ভাবলাম, একজন গৃহত্যাগী সাধুর পক্ষে যে কাজটা সহজে সম্ভব—সেটা কি সংসারীদের পক্ষে…। এতটুকুই ভেবেছি-মাত্র। ভাবনার ছেদ টেনে সাধু-বাবা বললেন,

—চুটিয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গ করবো—আবার ভগবানের কোলেও শোব—তা তো হয় না। ইন্দ্রিয়ের ভোগ-লালসা মেটে না কখনও। তার তৃপ্তিও নেই—চাহিদাও অনন্ত। শুধু সংযমেই-এর নিবৃত্তি।

এতক্ষণ পর এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বিড়ি খাবেন বাবা, আছে আমার কাছে।

হাত নেড়ে মুখেও বললেন,

—বিড়ি-টিড়ি খাই না, তবে বললি যখন—দে একটা।

দুটো ধরালাম, একটা দিলাম সাধুবাবার হাতে। বার কয়েক ফুক্ ফুক্ করে টেনে তিনি বললেন,

—এবার তোর প্রশ্নের উত্তরে বলি, বিবাহ করে ভোগ করবো না—সংসারে থেকে এ-কথা চলতে পারে না। সম্ভবও নয়। তবে ভোগটা অবশ্যই হতে হবে অতি পরিমিত। কখনও কোনভাবেই যেন ইন্দ্রিয়ের লালসাকে অতিক্রম না করে। ঠিক এইভাবে চলতে থাকলে পুরুষের বীর্য-ধারণ আর মেয়েদের সংযম ক্ষমতা যাবে বেড়ে। ক্রমে ক্রমে মন থেকে সরে যাবে কামচিন্তা, ভোগবাসনা আর বিষয়ে আসক্তি। বীর্যধারণ আর সংযমে ইন্দ্রিয়ের বিপরীতমুখী ক্রিয়া রুদ্ধ হয়। ফলে মনের উপর ওগুলোর আর ক্রিয়াই হবে না।

মনে মনে বললাম, সংসারে থাকলে বুঝতে পারতেন—কত ধানে কত চাল হয়। হেসে ফেললেন সাধুবাবা। বললেন,

—ভাবছিস্ কঠিন। মোটেই না। একটু অভ্যাস করলে সকলেই পারবে। আসলে কি জানিস্, সংসারীদের আর সব বিষয়ে চেষ্টা থাকলেও এ-বিষয়ে নেই মোটেই। কয়েকদিন দু চারটে ধর্মের বই, সাধকের জীবনী পড়ে, দু চারদিন সংযমে থাকে। তারপর কাম ঠেলা মারলে ভাবে—'দূর শালা, ওসব আমার দ্বারা হবে না।' মানুষ যখন—তখন মানুষের দ্বারা হবে না তো কি কুকুর বিড়ালের দ্বারা হবে?

সাধুবাবা বসে আছেন একইভাবে—স্থির হয়ে। চোখদুটো লক্ষ্য করছে তীর্থ-যাত্রীদের আনাগোনা। মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছেন আমার মুখের দিকে। এবার জানতে চাইলাম,

—একটু আগেই বললেন, বীর্য অস্থির হয়। সেটা কি এবং কেমন করে হয়?

মুখ-মণ্ডলটা একটু গম্ভীর হয়ে এলো সাধুবাবার। আমার চোখের উপর তাঁর দৃষ্টি স্থির রেখে বললেন,

—সাধারণভাবে কোন নারীকে দর্শন বা চিন্তা করলে মনে একটা প্রতিক্রিয়া হয়। সেটা ভালো বা খারাপ। অনেক সময় নাও হতে পারে। নারীর বয়েস যাইহোক না কেন। মনে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হলে শুক্র কোনভাবেই চঞ্চল হয় না। কোন নারীকে দেখে বা স্পর্শ করে অথবা না দেখেও যদি তার রূপ কিংবা দেহ নিয়ে মনে কোন চিন্তা আসে—তা-হলে বাহ্যত প্রায়ই দৈহিক কোন উত্তেজনা আসে না। তবে তা না আসলেও জানবি—ভিতরে বীর্য চঞ্চল হয়ে ওঠে সৃষ্টির জন্য। দর্শন, স্পর্শ এবং চিন্তা থেকেই এটা হয় অজ্ঞাতেই। কারণ শুক্রই সৃষ্টির বীজ। বপনের চেষ্টায় সে উন্মুখ হয়ে বসে আছে। ক্ষেত্র পেলে ভালো।

নইলে অলক্ষ্যেই উত্যক্ত করবে। পতনেই যে তার স্বস্তি। তাতে সৃষ্টি হোক বা না হোক।

বিড়িটা নিভে গেছে। ধরা আছে সাধুবাবার হাতেই। দু-আঙুলের ফাঁকে। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। আমিও কোন প্রশ্ন করলাম না। এদিক ওদিক তাকালেন বার কয়েক। তারপর বললেন,

—বেটা, সংসার বা সাধুজীবনে সত্যিই যদি কেউ আধ্যাত্মিক উন্নতি আর মনকে আনন্দময় অবস্থায় রাখতে চায়—তাহলে তাকে বীর্যধারণ করতেই হবে। সাধনভজন করলাম আবার সমানে শুক্রক্ষয়ও করলাম—তাতে লাভ হবে না কিছু। ভগবানের নামগানে কল্যাণ হবে। তবে মনের ব্যাধি যাবে না।

এবার হাতজোড় করে খুব বিনীতভাবেই বললাম,

—বাবা, অপরাধ যদি কিছু না নেন তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

এইভাবে বলায় সাধুবাবা মুখের দিকে তাকালেন তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে। যেন বুঝতে চেষ্টা করলেন আমার মনে কথা। কিছু বুঝলেন কিনা—বুঝতে পারলাম না। মুখে নয়, ইসারায় সম্মতি জানিয়ে বললেন—কি জানতে চাই? অভয় পেয়ে বললাম,

—বিয়ে তো নিশ্চয়ই করেননি আপনি?

ঘাড় নেড়েই জানালেন—না, করেননি। প্রশ্ন করলাম,

—সাধু জীবনে আসার আগে বা এই জীবনে এসে আজ পর্যন্ত কি কখনও কু-অভ্যাসে লিপ্ত হয়েছেন?

কথাটা ধরতে পারলেন না। বুঝিয়ে বলতেই মুখের ভাবে কেমন যেন একটা পরিবর্তন হলো। ভাবতেই পারেননি—এমন একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। মনে হলো—বিব্রত হলেন তিনি। পর মুহূর্তেই কাটিয়ে উঠলেন 'কেমন যেন' ভাবটা। তারপর নিঃসংকোচেই বললেন,

—শংকরজীর কোলে বসে তোকে মিথ্যা বলবো না। জীবনে একদিন—একবার মাত্র লিপ্ত হয়েছিলাম কু-অভ্যাসে। তাও এই সাধুজীবনে আসার পর। তারপর আর নয়।

সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বিষয়টা কিভাবে, কার কাছে, কেমন করে অবগত হয়েছিলেন আপনি?

মিনিটি পাঁচেক চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। দেখেই মনে হলো—খুব চিন্তা করছেন। হাতের পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে বললেন,

—একদিন এক সাধুবাবার সঙ্গে আমার আলাপ হয় প্রয়াগে। দু-জনে একসঙ্গে ছিলাম তিনদিন। বিয়ের পর দুটো বাচ্চা আর বউ রেখে সাধু হয়েছিলেন তিনি। নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। সাধুদের সঙ্গে সাধুদের যেমন হয়। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারি কৌশলটা। মাত্র ১৪/১৫ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছি। ও-সব বিষয়ে তখন কিছুই জানতাম না—বুঝতামও না কিছুই।

একটু থেমে আবার বললেন,
—ফলে মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেল। গুরুজীর কাছে জানালাম আমার কু-কর্মের কথা। সত্যি কথাই বললাম। রাগ করলেন না তিনি। আমাকে শুধু বললেন, 'এ্যায়সা কাম অউর কভি না করনা। বেটা, ইসি অভ্যাস মে সাধুজীবন তেরা পুরা বরবাদ হো যায়গা।' ব্যস, আর কখনও কোনভাবে ও-কাজে লিপ্ত হইনি কোনদিন।
খুশী হলাম সাধুবাবার স্বীকারোক্তি শুনে। অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে কু-অভ্যাস প্রসঙ্গে কথা হয়েছে আমার। জিজ্ঞাসা করেছি—কখনও তাঁরা ওই অভ্যাসে লিপ্ত হয়েছিলেন কি না? প্রায় সব সাধু-সন্ন্যাসীরাই উত্তর দিয়েছেন আন্তরিকতার সঙ্গে—একেবারে দ্বিধাহীন হয়ে।
এই প্রসঙ্গে যা জেনেছি—তা থেকে প্রথমেই আসি পাঁচ থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যে গৃহত্যাগ করেছেন—এমন সাধুদের কথায়। এদের মধ্যে প্রায় কেউই কু-অভ্যাসের বিষয়ে কিছুই জানেন না। প্রশ্ন করে নিজেই লজ্জায় পড়েছি বহুবার। চলে গেছি অন্য প্রসঙ্গে—বুঝতে না দিয়ে। সাধু-মন যদি কলুষিত হয়—এই ভেবে। আবার ওই বয়সের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক গৃহত্যাগী সাধু পেয়েছি—যাঁরা পরবর্তীকালে কু-অভ্যাসের কথা জ্ঞাত হয়েছেন। লিপ্ত হয়ে—পরে পরিত্যাগও করেছেন।
সাধুদের মধ্যে তেরো থেকে সতেরো—এমন বয়সের মধ্যে যাঁরা গৃহত্যাগ করে এসেছেন অধ্যাত্ম-জীবনে—তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাধু বিষয়টি জানেন। কু-অভ্যাসে কেউ সাময়িক, কেউ লিপ্ত ছিলেন বেশ কিছুদিন—সাধু-জীবনে এসেও। পরে কু-ফল উপলব্ধি করে সংযমতার মাধ্যমে তা থেকে মুক্ত হয়েছেন। আর উক্ত বয়সের মধ্যে এমন কিছু সাধুসন্ন্যাসী পেয়েছি—যাঁদের ও বিষয়ে কোন ধারণাই নেই। গৃহত্যাগের আগেও না—পরেও না। তবে এঁদের সংখ্যা—অতি নগণ্য।
এবার বলি, আঠারো থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে গৃহত্যাগী—এমন সাধুদের কথা। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিয়ে করে অথবা কুমার অবস্থায় গৃহত্যাগ করেছেন—তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই সম্যক ধারণা আছে এই বিষয়টি সম্পর্কে। কেউ দীর্ঘদিন, কেউ স্বল্পকালের জন্য—কেউ গৃহত্যাগের পূর্বে, কেউ পরে লিপ্ত হয়েছিলেন কু-অভ্যাসে। পরপর ধীরে ধীরে নিজেকে বেঁধেছেন সংযমতার বাঁধনে। হয়েছেন সংযমী। তবে অতি সামান্য সংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসীদের পেয়েছি—যাঁরা সংসার ত্যাগের পরও লিপ্ত হয়েছেন কু-অভ্যাসে। পূর্বে লিপ্ত ছিলেন—সাধুজীবনে কখনই নয়—এমন সাধুর সংখ্যাই সর্বাধিক। এঁরা প্রায় সকলেই বলেছেন—অধ্যাত্ম-জীবনে আসার পর সংযমেই কাটিয়েছেন সাধু-জীবন। তখন কখনও কখনও সংযমতার বাঁধ ভেঙেছে প্রাকৃতিক নিয়মে।
এবার প্রসঙ্গ পাল্টে গেলাম অন্য প্রসঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, সৎপথে যারা আছে—তারাই তো দেখছি সংসারে বড় কষ্টে আছে।

প্রায় সর্বদিক থেকেই বলতে পারেন। অসৎপথে জীবন যাপন করছে যারা—সংসারে তারা যথেষ্ট ভালো আছে—সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যেও আছে। দেখুন বাবা, সংসারে দুঃখ কষ্ট অশান্তি কমবেশী সৎ অসৎ—সকলেরই আছে। আপনি বলবেন, এ-সব পূর্বজন্মের কর্মফলেই হয়। তাই যদি হয়—পার্থিব জীবনে সৎপথে থেকে কষ্ট পেয়ে ভগবানকে ডেকে পরজন্মে সুখ পাওয়া—অথবা অসৎভাবে জীবনযাপন করে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন কাটানো—কোন্‌টা সংসারী মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য? যে জন্মটা চোখে দেখা যায় না—সে জন্মের কথা এখন ভেবে লাভ কি?

কথাটা মন দিয়েই শুনলেন সাধুবাবা। তবে কথা বললেন না একটাও। মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছেন আমার মুখের দিকে—আবার চোখ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন অন্যদিকে। এইভাবেই কেটে গেল প্রায় মিনিট দশেক। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আমার কথাটা কি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি?

কোন কথা বললেন না মুখে। ঘাড় নেড়েই জানালেন—বুঝেছেন। কাটলো আরও প্রায় মিনিট সাতেক। তারপর বললেন,

—বেটা, প্রশ্নটা করেছিস্ বেশ সুন্দর। তবে যুক্তিতর্ক দিয়ে তোর এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না।

কথাটুকু বলে চুপ করে রইলেন। চোখটা আমার মুখের উপরেই। আমি কি ভাবছি—এটাই যেন বোঝার চেষ্টা করছেন সাধুবাবা। দৃষ্টিতে এমন একটা ভাব।

প্রায় সব সাধুদের কাছেই এই প্রশ্নটা করেছি—সাধুসঙ্গের সময়। এক একজন সাধু উত্তর দিয়েছেন এক এক রকমের। কোনটাই মনোগ্রাহী হয়নি আমার। এখন তাদের কথাই ভাবছি মনে মনে। হঠাৎ বললেন সাধুবাবা,

—বেটা, পরমাত্মার সংসার এটা। এখানে মানুষের বিচারে এমন কোন বিষয় বা বস্তুও নেই—যাকে সৎ বলা যায়। আবার অসৎ বলতে পারি—এমন কোন বিষয় বা বস্তুও নেই। তোর আমার বিচারে যেটা ভালো বা সৎ—সেটা অন্যের কাছে না-ও হতে পারে। আবার অন্যের কাছে যেটা সৎ বলে বিবেচিত—সেটা তোর আমার কিংবা অন্য কারও কাছে অসৎ বলে মনে হতে পারে। আসলে সৎ বা অসৎ ব্যাপারটাই মানুষের বিবেচনা এবং সম্পূর্ণ মনের অধিকারপ্রসূত। এটা যার যার ব্যক্তিগত চিন্তা আর মনের বিষয়—যেটা একান্তভাবে নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের দয়া মায়া ত্যাগ তিতিক্ষা ধৈর্য সংযমতা পৌরুষ আস্তিকতা ইত্যাদি গুণগত বিচারের উপর। অতএব বাহ্যদৃষ্টিতে কোন মানুষের কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে সৎ বা অসৎ বলাটা কারও নিজের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। বলার অধিকারও নেই। অথচ আমরা সকলেই এটা বলে থাকি।

একটু থামলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললেন,

—আসলে বেটা, ভগবানের বিচারটাই আলাদা। তোর আমার চিন্তা-ভাবনা.

বিচারের সঙ্গে তাঁর বিচারের কোন মিল বা হদিশ খুঁজে পাবি না। সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার জন্য কিছু কিছু বিষয়কর্মকে সৎ বা অসৎ বলে একটা সংজ্ঞা তৈরী করেছে মানুষ। সৎ অসৎ-এর প্রকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। এর বিচার মানুষ করতে পারে না। কালের গতি যাকে যে-ভাবে নিয়ে যাচ্ছে—সে সেইভাবেই চলছে। বিচার ভগবানের হাতে।

আমার প্রশ্নের উত্তরে এ-টুকুই বললেন সাধুবাবা। এ-প্রসঙ্গে আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, মানুষের জীবনে মনে পূর্ণতা আসে কিসে?

একটুও চিন্তা না করেই বললেন,

—সংসার বা সাধু-সন্ন্যাস জীবনে ত্যাগ ছাড়া মানুষ কখনও পূর্ণতা-প্রাপ্ত হয় না। মনের পূর্ণতা ত্যাগেই—সর্ববিষয়ে, সর্বক্ষেত্রে। যার ত্যাগ যত—সে তত বেশী পূর্ণ—মনে।

প্রশ্ন করতে যাবো—দুজন তীর্থযাত্রী এসে দাঁড়ালেন সামনে। দেখে মনে হলো স্বামী-স্ত্রী। আধাবয়সী। চেহারায় বাঙালী। মহিলাটি সাধুবাবার সামনে একটা টাকা রেখে প্রণাম করলেন। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর চলে গেলেন দুজনে। আবার শুরু করলাম কথা,

—বাবা, মানুষের সুখ বা দুঃখভোগ—এটা যদি পূর্বজন্মেরই কর্মফল-ভোগ হয়—তা-হলে যে-কোন অবস্থাতেই ভগবানকে ডেকে লাভ কি?

কথাটা শুনে হেসে ফেললেন সাধুবাবা। হাসতে হাসতেই বললেন,

—বেটা, ভগবানে মন দেয়া, তাঁকে ডাকা, তাঁর শরণাগত হওয়া—তোর বা আমার, কোন মানুষের সাধ্য কি আছে রে! তাঁর যদি ইচ্ছা না হয়—তাঁকে ডাকার মনটাই হবে না। এমন পাঁকে ফেলে রাখবে—তাঁর কথা মনেই আসবে না। 'নিমক' ছাড়া রান্না করা 'সবজী'র মতো জীবন। তাঁর দয়া হলে মানুষ তাঁকে সুখেও ডাকে—দুঃখেও ডাকে। ভগবানকে স্মরণ করার ক্ষমতাটুকুও তোর আওতায় নেই। আর সেটা যখন নেই—তখন লাভ লোকসানের হিসাবটা করবি কেমন করে? সংসারে সুখ বা দুঃখভোগটা স্থির হয়ে আছে—নিয়মে। তাঁকে ডাকলে দরিদ্রের ধন হবে না। না ডাকলে ধনবান ভিখারীও হবে না।

সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পাল্টে এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনার সাধুজীবনে আসার পরের কথাই বলছি। এমন কোন স্মরণীয় ঘটনা কি কখনও ঘটেছে—যার কথা সারাজীবনই আপনার মনে থাকবে। যেমন ধরুন, কোন অলৌকিক দর্শন, কোন বিপদ কিংবা অবিশ্বাস্য কোন ঘটনা?

কথাটা শোনামাত্রই একটা অন্ধকার-ভাব ফুটে উঠলো চোখেমুখে। আগের হাসির রেশটাও মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। কোন কথা বললেন না সাধুবাবা। মনেই হলো, কিছু একটা ঘটেছে—নইলে এমন হাসিমাখা মুখখানা হঠাৎ এমন হয়ে এলো কেন? তাই আর খোঁচালাম না। বলবার হলে আপনিই বলবে। বসে রইলাম উত্তরের

আশায়। কাটলো মিনিট সাত আট। ধীরে ধীরে ফিরে এলো স্বাভাবিক ভাবটা। চোখ-দুটো বুজিয়ে বললেন,

—হাঁ বেটা, স্মরণীয় ঘটনা একটা আছে। গুরুজীর অভিশাপ বাক্য সফল হয়েছিল আমার জীবনে। যা আজও আমার মনে আছে—থাকবে, যতদিন এই দেহটা থাকবে।

এইটুকু বলে—ঘটনার কথা আর কিছুতেই বলতে চাইছিলেন না সাধুবাবা। অনেক অ-নে-ক অনুরোধ করে—হাতে পায়ে ধরলাম। এইভাবে মিনিট কুড়ি কাটার পর শুরু করলেন তাঁর সাধুজীবনের একটি অধ্যায়ের কথা,

—তখন ছিলাম উত্তরাখণ্ডে—ভবিষ্যবদরীতে। যোশীমঠ থেকে যেতে হয় তপোবন হয়ে। সে সময় ওখানে কোন লোকই যেত না বলতে পারিস্। এখনও যে খুব বেশী যায়—তা ও নয়। একে ঘুর পথ—নামডাকও নেই। সে কি আজকের কথা। তাও কম করে ধর ৬০/৬৫ বছর হবে। তখন আমরা পাঁচজন গুরুভাই থাকতাম একসঙ্গে। সাধন ভজনও চলতো একইসঙ্গে। আমাদের গুরুজী ছিলেন পাহাড়ীয়া।

ভুরুটা একটু কোঁচকালেন। একটু ভেবে বললেন,

—ঘর ছাড়ার পর বছর দুয়েক আজ এখানে, কাল ওখানে—এই করেই কাটলো। তারপর গুরুর সন্ধান পেলাম হরিদ্বারেই। তিনিই আমাকে নিয়ে গেলেন হিমালয়ে—ভবিষ্যবদরীতে। রয়ে গেলাম ওখানেই। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—কোন সময়েই সমতলে নামতাম না আমরা। থাকতাম সাধন ভজন নিয়েই। নিত্যকর্মের মধ্যে একটা ছিল—প্রতিদিন শিবলিঙ্গে বেলপাতা চড়িয়ে জল ঢালা। এটা ছিল গুরুজীর আদেশ। নিয়মিত করতামও তাই। বহুকাল চললাম এই নিয়মেই। তারপর একটা সময় কি মনে হলো—বন্ধ করে দিলাম শিবলিঙ্গে জল ঢালা আর বেলপাতা চড়ানো। আর সব গুরুভাইরা কিন্তু বন্ধ করলো না তাঁদের নিত্যকর্ম। কি মতিচ্ছন্ন হলো—আমিই বন্ধ করে দিলাম। চলতে লাগলাম এইভাবেই। একদিন কথায় কথায় গুরুভাইরা আমাকে উদ্দেশ্য করে গুরুজীকে বললেন,

—বাবা, ও সাধনভজন সবই করে কিন্তু শংকরের মাথায় জল বেলপাতা চড়ায় না। কথাটা শোনামাত্রই ক্রোধে ফেটে পড়লেন গুরুজী। অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন আমাকে,

—শালা, শুয়ার কা বাচ্চা, হিমালয়ে বসে আছিস্ মানে ভগবান শংকরের কোলেই বসে আছিস্। তাঁর আশ্রয়ে থেকে তাঁর সেবাই করিস্ না। অথচ প্রতিদিন আহার গ্রহণ করিস্। এত বড় তোর ধৃষ্টতা!

বলে অভিশাপ দিলেন গুরুজী,

—জীবনে একটা সময় আসবে—যখন তোকে সমতলে নেমে যেতেই হবে। তারপর পাবি কোন এক শিবমন্দিরে নিত্যপূজার দায়িত্ব। সেখানে প্রতিদিন জল বেলপাতা দিয়েই তোকে করতে হবে শংকরের সেবা। তুই চুরি করবি না—কিন্তু বিনা কারণে

তোকে একদিন চোর বলে সন্দেহ করবে সকলে। তারপর মেরে, অপমান করে তাড়িয়ে দেবে মন্দির থেকে। গুরুর আদেশ অমান্য করে, শংকরের সেবা করিসনি —তারজন্যে এইভাবেই কষ্ট করে তোকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত।

করুণমুখে এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সাধুবাবা। চোখ খুললেন। তাকালেন আমার মুখের দিকে। এ-দৃষ্টিতে কৌতূহল ছিল—কিছু জিজ্ঞাসা করি কি না? কোন কথাই বললাম না। তিনিই বললেন,

—এরপর পাহাড়ে যতদিন ছিলাম—শংকরের মাথায় জল বেলপাতা না দিয়ে নিজে জলগ্রহণ করতাম না কখনও। এই ঘটনার বহুকাল পর দেহরক্ষা করলেন গুরুজী। তারপর চার গুরুভাই-এর মধ্যে দুজন চলে গেলেন তিব্বতে—মানস-কৈলাসে। একজন গেলেন গোমুখে। আর একজন রয়ে গেলেন ভবিষ্যবদরীতে। সেই সময় মনটা আমার কেমন যেন হয়ে গেল। ওখানে থাকতে আর ভালো লাগল না। নেমে এলাম সমতলে।

এবার কৌতূহলী হয়েই বললাম,

—তারপর কি হলো বাবা, গুরুজীর অভিশাপবাক্য কি কার্যকরী হয়েছিল আপনার জীবনে?

প্রসন্ন মনেই বললেন,

—তারপর আর কি! এ-তীর্থ সে-তীর্থ করেই দিন কাটতে লাগলো আমার। ঘুরতে ঘুরতে একদিন উপস্থিত হলাম এক আশ্রমে। অদ্ভুত যোগাযোগ। আশ্রমেই রয়েছে শিবমন্দির। শিবের নিত্যপূজার দায়িত্ব দিতে চাইলো কর্তৃপক্ষ। রাজী হয়ে গেলাম বিবশভাবে। তারপর চললো শংকরের নিত্যসেবা। চললো কয়েকবছর ধরে। হঠাৎ একদিন কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করলেন, নিত্যভোগের জন্য দেয়া টাকা থেকে চুরি করি আমি। শুনলাম নির্বিকার হয়ে। কোন প্রতিবাদই করলাম না। কারণ তো আমি জানি। গুরুজীর বাক্য সফল হয়ে এখন তা শেষ হতে চলেছে। প্রতিবাদ না করাতে সকলেই চোর ভাবলো আমাকে। একদিন আশ্রমের লোকেরা মেরে তাড়িয়ে দিল আশ্রম থেকে। পরমানন্দে বেরিয়ে পড়লাম পথে। যেদিন মন্দিরে শংকরের সেবা-পূজায় লেগেছিলাম—সেদিন কাছে একটা পয়সাও ছিল না। যেদিন তাড়িয়ে দিল—সেদিনও ফকির। একটা কানাকড়িও ছিল না সঙ্গে। পথ আর মানুষের দয়ার অন্নই আমার সব। তাতেই চলে যায়। কার জন্যে চুরি করবো বলতো? গুরু ছাড়া কে আছে আমার? তাঁর আদেশ অমান্য করেছিলাম। প্রায়শ্চিত্ত করলাম ফলভোগ করে।

সাধুবাবা থামলেন। ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। ভাবতে থাকলাম আমি। অনেক কথা। গুরুবাক্যের কি তীব্র শক্তি! অভিশাপবাক্য কি অদ্ভুতভাবে ঘটনায় রূপান্তরিত হলো সাধুবাবার জীবনে। আজ একেবারে মুক্ত—অবধূত সাধুবাবা। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—এই ঘটনায় গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা আর যারা চোর বলেছিল আপনাকে—তাদের

প্রতি কোন ক্রোধ বা ক্ষোভ হয়নি আপনার ?

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন শান্ত ধীর কণ্ঠে,

—না না বেটা, তা হবে কেন! মনে ওসব কিছুই আসেনি—বরং লাভ হয়েছে আমার। অনেক অ-নে-ক লাভ হয়েছে। বাইরে প্রকাশ না করলেও গুরুবাক্য অবহেলা করলে শিষ্যের প্রতি যে গুরু অপ্রসন্ন হন—এ-ঘটনা না ঘটলে বুঝতেই পারতাম না। আমার ক্ষেত্রে তাঁর অপ্রসন্নতা প্রকাশ পেয়েছিল বলেই ভুগে মুক্ত হয়েছি। যারা গুরুবাক্য ঠিক ঠিক মেনে চলে না—বাহ্যিক প্রকাশ না পেলেও অন্তর্যামী গুরু তাদের প্রতি অপ্রসন্নই থাকেন। ফলে জীবনের দুর্ভোগ তাদের কাটেনা কিছুতেই—শান্তিও পায় না। অভিশাপ না দিলে গুরুবাক্যের যে কি আমোঘ শক্তি—তা কখনও কল্পনাতেও আসতো না। আর গুরুকৃপায় শংকরের নিত্যসেবার সুযোগও তো পেয়েছি—এটাই বা কম কি! বেটা, এই ঘটনাটা ঘটেছিল বলেই গুরু, গুরুবাক্য এবং গুরুশক্তির উপর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা অটুট হয়েছে আমার। এমনটা না হলে হয়তো বিশ্বাসে ঘাটতি থেকে যেতো। গুরু যে কত করুণাময়—কত যে তাঁর দয়া—কোন পথে, কি-ভাবে তিনি যে তাঁর শিষ্যের কল্যাণ করেন—তা কারও বোঝারই উপায় নেই। আর অভিমানটা গুরুজী একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তাই ক্ষোভ বা ক্রোধ হয়নি কারও উপর।

সাধুবাবার কথাগুলো শুনে অবাক হলাম না। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সামান্য ঘটনার পিছনে অনেক সময় যে কত মহৎ—কত বড় কারণ ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে—তা সচরাচর কেউ ভাবিই না। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, পথই আপনার আশ্রয়, না ডেরা কোথাও আছে ?

একটু উদাসীনতার সুরেই বললেন,

—পথই আমার সব। জীবনকে জানা আর বেঁচে থাকা—সবই আমার পথ সম্বল করেই। আর ডেরার কথা বলছিস্—ওটা করবো ভগবানের কাছেই।

এখন সাধুবাবার মুখটা বেশ স্বাভাবিক লাগছে। অনেকক্ষণ পর এবার একটু নড়েচড়ে বসলেন—সোজা হয়ে। জানতে চাইলাম,

—সংসার না করে এ-পথে এলেন কেন ? কেউ কি জোর করে এনেছে ?

এতক্ষণ পর কথাটা শুনে হাসিতে ভরে উঠলো মুখটা। হাসতে হাসতেই বললেন,

—বেটা, এই পৃথিবীতে জোর করে কি কেউ কিছু করতে পারে—না পেরেছে কখনও! আমি বাপু অশিক্ষিত মানুষ। ভুল হলে ক্ষমা করে দিস্। তোরা বলিস্, এটা করলাম—ওটা করলাম। শিল্পী বলছে, নতুন ভাবনায় সে শিল্প সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যিক বলছে, সে সাহিত্য সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞানী বলছে, সে কিছু আবিষ্কার করেছে। না না বেটা, এ-জগতে কেউ কিছু সৃষ্টিই করছে না—আবিষ্কারও নয়। তুইও কিছু করছিস্ না—আমিও না। জোর করে কিছু হবারও নয়—হয়ও না।

আসলে বেটা, সৃষ্টির নিয়মে সবকিছু সৃষ্ট হয়েই আছে। নতুন করে কেউ কিছু

করছে না—করতে পারছে না—পারবেও না। ভগবানের বিধানে সেই সৃষ্ট বস্তু বা বিষয় কারও মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে—হচ্ছে বিকশিত—এই যা। না থাকলে হতো কেমন করে! আছে বলেই তো প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। মনে হয়েছে নেই। জ্ঞাত হওয়ার পর মনে করছি—আমরা করলাম। যেমন ধর্—ভাবনা। কেউ যখন নতুন কোন বিষয় নিয়ে কিছু করছে বলে শুনবি—তখন জানবি, সৃষ্টি—তার সৃষ্ট ভাবনা কারও মাধ্যমে প্রকাশ করতে চলেছে। মনে রাখবি—যা নেই—তা নেই-ই। যা প্রকাশিত হচ্ছে—তা ছিলই। কেরামতি সব তাঁরই।

এর পর্যন্ত বলে থামলেন কিছুক্ষণ। কোন কথা বলে আর ছেদ টানলাম না কথায়। সাধুবাবা বললেন,

—সংসার না করে সাধু হলাম কেন? আমি তো বেটা সৃষ্টির নিয়মের বাইরে নই। তার নিয়মে জীবনটা আমার এইভাবে কাটবে বলেই তো এ-পথে আসতে হয়েছে। চেষ্টা বা জোর করে কি এ-পথে আসা যায়? অন্য পথেও যাওয়া যায় না। নিয়মে যার যে পথ বাঁধা আছে—সেই পথেই সে চলবে।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—তবে বাবা একটা কথা আছে। সৃষ্টির নিয়মে ঘর ছাড়ার লৌকিক কারণ তো একটা আছে—সেটা তো বলতে পারেন—তা তো জানা আছে আপনার।

ঘাড় নাড়লেন সাধুবাবা। তারপর মুখে বললেন,

—হাঁ বেটা, লৌকিক কারণ তো একটা আছেই। সংসারে মানুষ বেঁচে থাকে কারও সঙ্গে কোন না কোন সম্পর্ক নিয়ে। সে সম্পর্ক কোথাও গভীর—কোথাও ঠুনকো, আবেগমূলক। সম্পর্ক যেখানে গভীর—বিশ্বাসটাও সেখানে প্রবল। তখন বয়সে ছোট হলেও সেই বিশ্বাসের উপর সম্পর্ক যাচাই করার সময় সব ভেঙে গেল। বেরিয়ে পড়লাম। আমার সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন আবেগ ছিল না। তা থাকলে হয়তো বেরোতে পারতাম না। মূল-কথা বেটা, সৃষ্টির নিয়মেই সংসার ছিল না—হলোও না।

খোলাখুলি কিছু বললেন না সাধুবাবা। তাই জানতে চাইলাম,

—কারণটা তো বললেন বাবা, এবার ঘটনাটা বলুন।

মুহূর্ত দেরী না করেই বললেন,

—না বেটা, এ-ব্যাপারে আর কিছু বলবো না আমি। অনুরোধ করিস্ না।

এ-কথার পর আর জিজ্ঞাসা করা চলে না। তাতে বিরক্ত করা হয়। কথায় 'অনুরোধ' কথাকে যুক্ত করায় আবার বললে অপমানই করা হবে। তাই ও প্রসঙ্গে আর গেলাম না। এতক্ষণ যে কথা বলেছেন এটাই আমার ভাগ্য। এবার উঠতে হবে—যেতে হবে আমাকে। প্রণাম করে শেষ প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, জীবন-পথে অনেকটা পথই তো পাড়ি দিলেন। এলেন জীবনের শেষ প্রান্তে। কথায় যতটুকু বুঝেছি—তাতে পাথেয় আপনার গুরুতে বিশ্বাস আর

ভক্তি। এই পাথেয় নিয়ে পথ চলে সাধুজীবনের ঝুলি কি পূর্ণ হয়েছে—না অপূর্ণই রয়ে গেল? ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার মতই বা কি—তাঁর দর্শন কি পেয়েছেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আবেগে ভরে উঠলো সাধুবাবাব কণ্ঠস্বর। মুহূর্তে জলে ভবে উঠলো চোখদুটো। নেমে এলো কয়েক ফোঁটা। প্রসন্নতায় ভরে উঠলো মুখখানা। সংসারে সব কিছু আছে—এমন অনেক মুখ দেখেছি আমি। তাদের মুখেও এমন প্রসন্নতা দেখিনি কখনও। হয়ও না বোধ হয়! অথচ সহায় নেই—সম্বল নেই—সমাজের অবহেলিত এক আশ্রয়হীন-মুখ কেমন করে যে ভরে ওঠে এমন অপার্থিব প্রসন্নতায়—তা না দেখলে কারও বিশ্বাসই হবে না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সাধুবাবা। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। অস্ফুট স্বরে বললেন,

—বেটা, আমি ফকিব।

এই বলে পাশে রাখা খালি ঝুলিটা দেখিয়ে বললেন,

—ঝুলিটা আমার বড্ড ছোট। মনের ঝুলিও তাই। ফকিরের ঝুলি যে! তা-ও ভরে উপছে গেছে। কেমন করে জানিস্? ঈশ্বর—মনের এক বিশেষ অবস্থা যে!

রামায়ণের চিত্রকুট এবং এখন

দিন কয়েক কাটালাম এলাহাবাদে। প্রয়াগের কাছে দেখলাম মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রম। একদা যে আশ্রমে এসেছিলেন স্বয়ং রাম লক্ষ্মণ সীতা—এসেছিলেন ভরত শত্রুঘ্ন, অসংখ্য অযোধ্যাবাসী। এখন আমি।

পবিত্র হিন্দুতীর্থ—প্রয়াগ। এই তীর্থের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল মোঘল সম্রাট আকবরের। তাই একদা প্রয়াগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নগর স্থাপন এবং একটি দুর্গ নির্মাণও করেছিলেন তিনি। এ-কথা জানা যায় 'আকবর নামা' থেকে। 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজলও লিখেছেন, পবিত্র গঙ্গার জলধারা আকবরের মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, সর্বদাই গঙ্গার জল পান করতেন তিনি। গঙ্গার জলকে মানুষের জীবনের স্রোত হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। তাই গঙ্গার এই জলধারাকে 'অমরত্বের স্রোত' বলেও উল্লেখ করেছেন। শুধু গঙ্গা নয়—একই স্থান যমুনাও লাভ করেছিল বাদশা আকবরের মনে। পবিত্রতায় সমান ছিল যমুনার জলও। তাই তো তাঁর কাজে যমুনা বা অন্য কোন পুষ্করিণী থেকে আনা জলে মিশিয়ে দেয়া হত গঙ্গার জলও। বাদশার এই নির্দেশের বাইরে কাজ হয়নি কখনও।

স্টেশন এলাহাবাদ। এখান থেকেই যাবো চিত্রকুট। একটু দূরেই বাস স্ট্যাণ্ড। সোজা চলে এলাম। সমস্ত দূরপাল্লার বাসই ছাড়ে এখান থেকে। আগেই টিকিট কেটে নিলাম বাস গুমটি থেকে। সিট নম্বরের কোন বালাই নেই। যে যেখানে খুশী—বসে যাও। বাসের নম্বরটা দেওয়া আছে টিকিটে। অনেক বাস দাঁড়িয়ে আছে বাস স্ট্যাণ্ডে। যাত্রীরা যাতে গুলিয়ে না ফেলে। সেইজন্যেই বাস নম্বর। বেনারস, মোঘলসরাই, মির্জাপুর—বিভিন্ন জায়গার বাস ছাড়ে এখান থেকে।

স্ট্যাণ্ডেই বাস দাঁড়িয়েছিল। দেরী করলাম না। টিকিট হাতে পেয়েই উঠে পড়লাম বাসে। আমার মতো আর সব যাত্রীরাও টিকিট কাটছে—উঠে পড়ছে বাসে। জানালার পাশে বসার ঝোঁক একটা আছে সব যাত্রীরই—তাই। তবে সকলের কপালে তো আর জোটে না—তবুও চেষ্টা করতে কেউ ছাড়ে না। বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত। সঙ্গে রয়েছে বন্ধু সুজিত সরকার।

বম্বে মেল—ভায়া এলাহাবাদ। এই ট্রেনেই এসেছিলাম এলাহাবাদে। হাওড়া থেকে। ট্রেন পথেও যাওয়া যায় চিত্রকুটে। সাতনার আগের স্টেশন মানিকপুর জংশন। সেখানে নেমে কারভি হয়ে যাওয়া যায় চিত্রকুট। পথের দূরত্ব মাত্র ৮ কি. মি.। বাস, রিক্সা, টাঙ্গা—সবই যায়। সেন্ট্রাল রেলের ঝাঁসি মানিকপুর শাখায় পড়ে চিত্রকুটধাম স্টেশন। স্টেশন থেকে ৫ কি. মি.। কোন যানবাহন

নেই। হাঁটা পথ। এখন হয়েছে কিনা বলতে পারিনে। তবে এলাহাবাদ থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে। যাওয়া আসার প্রোগ্রাম করলে প্রাইভেট গাড়ীও আপত্তি করে না।

ধীরে ধীরে যাত্রীরা উঠে এলো বাসে। অতিরিক্ত একটা যাত্রীও নেয়া হলো না। এটা এক্সপ্রেস বাস। থামবে কম—চলবে বেশী। বাস ভর্তি হলো তবে ছাড়লো না। ছাড়বে বেলা দশটায়। আর একটু বাকি।

বাঙালী বলতে এই বাসের সম্বল আমি আর আমার বন্ধু। আর সব দেশওয়ালী, উত্তরপ্রদেশবাসী। অধিকাংশই বয়স্ক। পঞ্চাশের উপরেই মহিলা পুরুষ। বুড়ো-বুড়িও আছে অনেক। মাঝ বয়সী অল্প। কম বয়সের—একেবারেই নেই। আমরা দুজন ছাড়া। দুজনেই ক্রনিক ব্যাচেলার।

এই বাসের যাত্রী যারা—সকলেই চিত্রকূটের যাত্রী। চেহারায় পোশাকে আভিজাত্যের কোন ছাপই নেই। দেখলেই মনে হয়, অত্যন্ত সাধারণভাবেই জীবন নির্বাহ করে এরা। অধিকাংশেরই পোশাক-আশাক ময়লা। টিনের সুটকেশ আর পোটলাপুটলি আছে সকলের কাছে। রামের উপর ভরসা করেই হয়তো জীবন এদের। শত দুঃখ কষ্ট, সংসার জীবনের বেহাল তরীতে বসেও রামকে ভোলেনি—ছাড়েনি তাঁকে অন্তরে। তাই হয়তো কিছু সম্বল বাঁচিয়ে চলেছে চিত্রকূটে। রামের লীলাভূমি দর্শন করতে। এই বাসের বয়স্ক নারীপুরুষ যারা—লক্ষ্য করছি বার বার প্রণাম করছে কপালে হাতজোড় করে। বিশ্বাসে ভরপুর মন। কোথায় চিত্রকূট—কোথায় এলাহাবাদ। এদের এ-সব দেখে মনে হয়—বাসে বসে থেকেও যেন পৌঁছে গেছে চিত্রকূটে—কোন রাম মন্দিরে প্রণাম করছে বিগ্রহ দর্শন করে। এমন নিঃসঙ্কোচ প্রণাম—অর্থ আর আভিজাত্যের গরিমা থাকলে হয় না। অভিমানমুক্ত সরল মনের মানুষ যারা—তাদের দ্বারাই সম্ভব এটা।

আমার সামনের আসনেই বসে আছেন দুজন—একজন বৃদ্ধ, সঙ্গে বৃদ্ধা স্ত্রী। এদের দেখে কষ্ট হয় আমার। কিছুতেই পারছি না ওদের-মতো হাতদুটো কপালে তুলতে। অভিমানের ভারী পাথর বসানো রয়েছে মনে। চেষ্টা করেও পারলাম না।

বেলা ঠিক দশটা। ড্রাইভার স্টার্ট দিল বাসে। পিছনের আসন থেকে উদাত্ত কণ্ঠে একজন বলে উঠলো—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কি···। সকলের মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—জয়। অপদার্থ আমি। এবারও পারলাম না। কে যেন গলাটাকে চেপে ধরে রেখেছে। ক্ষীণ স্বরেও বলতে পারলাম না—জয়।

সামনের বৃদ্ধ বৃদ্ধা—হাতদুটো উপরে তুলে এমনভাবে 'জয়' ধ্বনি দিল—দেখে মনে হলো, রাম অযোধ্যায় নেই—নেই চিত্রকূটে, কোথাও—কোন মন্দিরে। রাম কখনও ছিল কিনা—তা বলতে পারিনে। রাম আছে কিনা—তা-ও জানা নেই আমার। তবে এই মুহূর্তে নিশ্চিত হলাম—রাম এদের অন্তর-মন্দিরে—রাম এদের প্রাণের

মাঝেই—রাম এদের সহায়, সঙ্গী। চিত্রকূটে চলেছে শুধু রামের লীলাক্ষেত্রের মাটি স্পর্শ করে ধন্য হতে।

অনেকক্ষণ হলো বাস ছেড়েছে। শহর ছেড়ে চলেছে শহরতলীর পথে। গতি এখনও বাড়েনি। ছোট ছোট বাজার হাট, লোকালয়কে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে সামনে। পীচের রাস্তা। কোথাও খানাখন্দ নেই। তাই বাস লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে না। কষ্টও হয় না দেহের।

অস্থির হয়ে ওঠে মনটা। একটু কথা বলতে পারলে হতো। আর পারলাম না। বৃদ্ধাকে বললাম—মাইজী, আপনি কি চিত্রকূট দর্শনে চলেছেন ?

অবাক হয়ে তাকালেন মুখের দিকে। উত্তর দিলেন না। নারীসুলভ লজ্জায় হয়তো ! এবার তাকালেন বৃদ্ধ স্বামীর চোখের দিকে। উত্তর দিলেন বৃদ্ধ—হ্যাঁ বেটা, অনেকদিনের আশা। রামজী পূর্ণ করতে চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাকেন—কি করেন ?

স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দিলেন বৃদ্ধ—গোরক্ষপুরে থাকি। এক জমিদারের জমিতে চাষ করি। একটা মেয়ে—বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে একটা। সে কাজ করে একটা দোকানে। বহুদিনের ইচ্ছা। অর্থের সংকুলান হয় না।

এবার বৃদ্ধাকে দেখিয়ে বললেন—এ-আমার 'জানানা' আছে। ওর জন্যেই আমার রামের দর্শন হবে আজ। অভাবের সংসার। খরচা বাঁচিয়ে কিছু কিছু করে জমিয়েছে দুজনের পথ খরচা। ভাবলাম, আর দেরী করলে রামজীর দর্শন 'মিলবে' না। কখন কি বিপদ হবে—পয়সাটা খরচা হয়ে যাবে। তাই বেটা এবার বেরিয়েই পড়লাম। যা হয় হবে।

বলে হাত দুটো জোড করে কপালে ঠেকালেন বৃদ্ধ। অস্ফুট স্বরে বললেন—'জয় সীযারাম'। বৃদ্ধার উজ্জ্বল মুখ যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কোন এক পারমার্থিক উজ্জ্বলতায়। হাসির রেখা ফুটে উঠলো সারা চোখে মুখে। স্বামীর কথায় সে-ও যেন একমত। স্বামীর দেখাদেখি বৃদ্ধাও হাতদুটো ঠেকালেন কপালে।

এবার জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে—কোথায় থাকি, কোথায় এসেছি, যাবো কোথায় এবং কি করি ? সবই বললাম। কলকাতা নামক কতদূরের এক জায়গা থেকে যাচ্ছি শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন—বেটা, বহু বছর ধরে চেষ্টা করে আজ যাচ্ছি রামকে দর্শন করতে। তোর কত ভাগ্য ! এত অল্প বয়সে তোর রামের দর্শন হবে। আসলে কি জানিস্ বেটা, রামজীর ইচ্ছা ছাড়া তো কিছু হবার নয়—হয়ও না। তবুও আমার ভাগ্যটাও কত ভালো—বল্, আজ তাঁর দর্শন পাবো। সে যদি দয়া না করতো—তাহলে তো আমাদের যাওয়াই হতো না। ঠিক কিনা—বল্ ?

'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বললাম না। বিশ্বাসের কিছু ঘাটতি আছে বলেই হয়তো কথা সরলো না মুখ থেকে।

পাশে বসা বৃদ্ধা স্ত্রী। কথাগুলো শুনছেন। আর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সায় দিচ্ছেন স্বামীর কথায়। 'ভাগ্যের কথা' আর 'এত অল্প বয়সে তোর রামের দর্শন হবে'—কথাটা ভেবে হাসলাম—মনে মনে।
বাস এবার ছাড়লো শহরতলী। বাড়লো গতিবেগও। ছুটলো বান্দা রোড ধরে। দু-পাশে ফাঁকা মাঠ। সবুজ ধান ক্ষেত। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বাড়ীঘর—গ্রাম।
উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের সীমানায় চিত্রকূট। এর একটা অংশ পড়েছে সাতনা জেলায়। আর একটা অংশ পড়েছে উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলাতে।
পথের বর্ণনায় কোন নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য কিছু নেই। গ্রাম বাংলার মধ্যে দিয়ে পীচের রাস্তা। এমন একটা পথ ধরে চললে দু-ধারে যেমনটি দেখায়—ঠিক তেমনই আজকের এলাহাবাদ থেকে চিত্রকূটের পথ।
ঘণ্টা-তিনেক চলার পর বাস থামলো। চায়ের দোকান। যাত্রীরা সকলেই নামলেন একে একে। প্রত্যেকেই খেলেন কিছু না কিছু। চা, পকোড়া, বিস্কুট। আর কিছুই নেই দোকানে। মিনিট পনেরো বিশ্রাম। শুরু হলো আবার চলা। গতিও বাড়লো ধীরে ধীরে।

ভাবছি রামায়ণের কথা। নৌকায় করে নদীর মাঝামাঝি এলেন সীতা। কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, গঙ্গা, মহারাজ দশরথের এই পুত্র তোমার প্রসাদেই পালন করবে তাঁর কর্তব্য। আমাদের সঙ্গে নিয়েই নিরাপদে ফিরে আসবেন চৌদ্দ বছর পর। হে দেবী—সর্বকামপ্রদায়িনী, আবার এসে প্রফুল্ল মনে তোমার পুজো করবো আমি। নরশ্রেষ্ঠ রাম ফিরে এসে রাজ্যলাভ করলে তোমার প্রীতি কামনায় দান করবো শতসহস্র গো আর অশ্ব। দেবো সহস্র ঘট সুরা, মাংস আর অন্নের ভোগ। এ-ছাড়াও তোমার তীরস্থ সকল দেবালয়ের দেবতা আর তীর্থে দেবো পুজো। গঙ্গার অপর তীরে এলো নৌকা। রাম বললেন—লক্ষ্মণ, সর্বত্রই তুমি রক্ষা করো সীতাকে। সবার আগে চলো তুমি। সীতা তোমার অনুগমন করুক। আমি তোমাদের দুজনকেই দেখবো পিছন থেকে। এইভাবেই আমাদের রক্ষা করতে হবে একে অপরকে।
সারথী সুমন্ত্র। এতক্ষণ দেখছিলেন তার প্রাণপ্রিয় রাম লক্ষ্মণ সীতাকে। ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন তাঁরা। এখন আর দেখতে পেলেন না কাউকে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে গেলেন শৃঙ্গবের-পুর (বর্তমানে মির্জাপুরের কাছে গঙ্গার উত্তর তীরে।) থেকে।
কিছুক্ষণ চলার পর তাঁরা উপস্থিত হলেন বৎসদেশে। (বর্তমানে প্রয়াগের কাছে যমুনার উত্তর তীরে।) সেখানে বধ করলেন বরাহ, কৃষ্ণসার আর শম্বর জাতীয় চারটি পশু। এদের পবিত্র মাংস নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় প্রবেশ করলেন বনে।
সন্ধ্যার বন্দনা করলেন রাম। তারপর লক্ষ্মণকে বললেন, জনপদের বাইরে আজ

আমাদের এই প্রথম রাত্রি। আজ নিশ্চয়ই দুঃখে আর্ত হয়ে আছেন মহারাজ। কৈকেয়ীর কামনা সিদ্ধ হয়েছে—তুষ্টিলাভ করেছেন তিনি। আমি চলে আসায় অনাথ হয়েছেন বৃদ্ধ পিতা। এখন কি করবেন সেই কামাত্মা? পিতার এই কামজ ও কোপজ দোষ আর মতিভ্রম দেখে মনে হচ্ছে—ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। কোন মূর্খ লোকও কি নারীর প্ররোচনায় ত্যাগ করতে পারে তার আজ্ঞানুবর্তী সন্তানকে—যেমন করেছেন আমার পিতা? সস্ত্রীক ভরতই সুখী। একাকীই ভোগ করবে সমগ্র কোশল রাজ্য। অত্যন্ত নীচমনা কৈকেয়ী। বিদ্বেষবশে আমার মা-কেও পারেন বিষ দিতে। লক্ষ্মণ, আমি ক্রুদ্ধ হলে একাকীই পারি শরবর্ষণে অযোধ্যা—এমনকি পৃথিবী শত্রুশূন্য করতে, কিন্তু অকারণে বল প্রয়োগ করা কখনই উচিত নয়। রাজ্য পরিত্যাগ করেছি অধর্ম আর পরলোকের ভয়ে।
এইভাবেই বিলাপ করলেন রাম।
পরদিন সূর্যোদয় হলো। তিনজনেই যাত্রা করলেন গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের দিকে। পথ চললেন সারাদিন ধরে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাম বললেন—লক্ষ্মণ, দেখো ধোঁয়া উঠছে প্রয়াগের কাছে। বোধ হয় কোন মুনি বাস করেন ওখানে। আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে পৌঁচেছি। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দও শোনা যাচ্ছে।
কিছুটা যাওয়ার পর তাঁরা উপস্থিত হলেন মুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে। শিষ্য পরিবৃত হয়ে বসে আছেন ভরদ্বাজ। রাম প্রণাম করলেন। পরিচয় দিলেন নিজের।
নানাবিধ আহার্য দিয়ে স্বাগত জানালেন ভরদ্বাজ। তারপর বললেন—তোমাদের নির্বাসনের সমস্ত কারণই আমার জানা আছে। দুই মহানদীর মিলন হয়েছে এখানে। স্থানটি অতি নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়। তুমি সুখে বাস করো এখানে।
ভরদ্বাজের এ-কথায় রাম বললেন—ভগবান, আশ্রমের কাছেই নগর। বাস করে অসংখ্য নগরবাসী। তারা সীতা আর আমাকে আসবে দেখতে। সে কারণে এখানে থাকতে ইচ্ছা করি না। এমন কোন নির্জনস্থান বলে দিন, যেখানে সীতা সুখে বাস করতে পারে।
ভরদ্বাজ বললেন—বৎস, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে একটি পর্বত আছে। সেই পর্বতের চূড়া দেখলে কল্যাণ ও মোহমুক্তি হয়। সেখানে বহু ঋষি তপস্যা করে গেছেন শতবর্ষ ধরে। আমার মনে হয়, চিত্রকূটে তুমি সুখেই বাস করতে পারবে। আজকের রাত্রি আমার সঙ্গে তুমি এখানেই বাস করো।
রাম রাত্রিযাপন করলেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। পরদিন চিত্রকূট যাবার ইচ্ছা জানালেন মুনিকে।
পুত্রের যাত্রাকালে পিতা যেমন করেন—সে রকম স্বস্ত্যয়ন করলেন ভরদ্বাজ। তারপর রামকে বললেন—সংগম স্থান থেকে যমুনার পশ্চিমস্রোতের বিপরীত দিকে তুমি যাত্রা করো। পথে উপস্থিত হবে একটি তীর্থে। সেখানে ভেলার দ্বারা নদী পার হবে। অপর পারে দেখতে পাবে সবুজ পাতা ভরা একটি বটবৃক্ষ। বৃক্ষটির

নাম শ্যাম। সীতা যেন প্রণাম করে। সেখান থেকে এক ক্রোশ গেলেই দেখবে নীল-বর্ণের একটি বাগান। এটাই চিত্রকূটের সুগম পথ। এই পথে আমি নিজেও গেছি বহুবার।

তিনজনেই প্রণাম করলেন মুনি ভরদ্বাজকে। তারপর যাত্রা করলেন তাঁরই নির্দিষ্ট পথে।

হাঁটতে হাঁটতে এলেন যথাস্থানে। তারপর শুকনো কাঠ আর বেনার মূল দিয়ে তৈরী করলেন একটি ভেলা। প্রথমে সীতাকে উঠিয়ে দিলেন। পরে লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম উঠলেন নিজে। মাঝ যমুনায় নদীকে প্রণাম এবং স্তুতি করলেন সীতা। ধীরে ধীরে ভেলা ভিড়লো ঘাটে। অপর পারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন শ্যাম বট। সীতা প্রণাম করলেন সেই বটবৃক্ষকে।

আবার শুরু হলো চলা। এক ক্রোশ গিয়ে দু-ভাই বধ করলেন একটি মৃগ। আহারাদি শেষ করলেন যমুনা তীরে—বনে। তারপর সুন্দর সমতল নদীতীরেই রাত কাটানোর জন্য নিলেন আশ্রয়।

খুব ভোরেই উঠলেন সকলে। স্পর্শ করলেন যমুনার পবিত্র জল। শুরু হলো আবার চলা—চিত্রকূট অভিমুখে।

পথ চলতে চলতেই রাম বললেন—শীত ঋতুর শেষ হয়েছে। পলাশ ফুলের গাছগুলি ফুলে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর সব গাছগুলি অবনত হয়ে আছে ফল-ভারে। ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠেছে বনভূমি। কলসীর মধ্যে মধুর চাক ঝুলছে গাছে। ডাকছে পাখি আর ময়ূর। ওই দেখো চিত্রকূট পর্বত। ওরই মাঝে রমণীয় বাগানে আছে সমভূমি। আমরা সুখেই বাস করবো ওখানে।

রাম একটানা হাঁটা-পথে আসেননি চিত্রকূটে। রাত্রিবাস করতে হয়েছে পথে। আমাদের বাস পথে সামান্য বিশ্রামটুকু ছাড়া চললো একটানা। আর থামলো না কোথাও। এলাহাবাদ থেকে ১৩৯ কি. মি. পথ পেরিয়ে এলাম। বেলা তিনটে পনেরোতে বাস এসে থামলো চিত্রকূটে। সময় লাগলো পাঁচঘণ্টা পনেরো মিনিট।

নেমে এলাম বাস থেকে। নামলেন সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—আর সকলে। গোরক্ষপুর-বাসী বৃদ্ধ বললেন, টিনের বাক্সটা মাথায় তুলে দিতে। মানুষের বোঝা নামাতে পারি না—অথচ তীর্থে এসে বোঝা চাপাতে হলো মাথায়। ধীর পায়েই এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধ—সঙ্গে স্ত্রী। এগিয়ে গেলাম আমিও—সঙ্গীও সঙ্গে।

এখানে—এই চিত্রকূটে আছে অসংখ্য ধর্মশালা। পাওয়া যায় বাড়ী ভাড়াও। আর যাইহোক, যে কেউ এলে থাকার কোন সমস্যাই নেই। তবে কোন বিশেষ তিথি উৎসবে সব তীর্থে যেমন থাকা খাওয়া—সাময়িক সমস্যা দেখা দেয়—সেটা দেখা দিতে পারে এখানেও। অন্য সময় কোন অসুবিধেই হবে না।

উঠলাম সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের এক ধর্মশালায়। রাস্তার ধারে। পাকা দোতলা

বাড়ী। অল্প ভাড়ায় ঘর পেলাম একটা। মধ্যপ্রদেশের অধিকারেই এই ধর্মশালা। তবে উত্তর এবং মধ্যপ্রদেশ—উভয়ক্ষেত্রেই ধর্মশালা রয়েছে অসংখ্য।
ধর্মশালা ছেড়ে আজ আর কোথাও বেরোলাম না। শরীরে ক্লান্তি একটা এসেছে। তাই বেরোলাম না। খাওয়ার জন্যে হোটেলে গেলাম। ঘুরলামও কয়েকটা। ভালো হোটেল বলতে যা—তা একটাও নেই এখানে। তাই ভালোর আশা ছাড়লাম। কোনরকম খাওয়ার মতো হোটেল একটাতে খেলাম। না খেলেই নয়—খেতে হয় তাই খেলাম। একেবারেই অতৃপ্তিকর।

রামঘাট ও তুলসীদাসের জীবন-কথা

চিত্রকূট অরণ্য। ত্রেতাযুগ থেকেই বহন করে চলেছে রামচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি—আজও। তাঁরই পদধূলিতে পবিত্র হয়ে উঠেছে চিত্রকূট—বৃক্ষলতা। তাই-তো ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রী ছুটে আসে দূর-দূরান্তর থেকে। চিত্রকূটের ধূলিস্পর্শে নিজেকে চায় নির্মল, পবিত্র করতে। এমন মনোরম তীর্থ—ভক্তের সঙ্গে রাম যেন একাত্ম হয়ে যায় এখানে এলে। চিত্রকূটের অতিথি—রঘুপতি রাম। রাজা রাম এসেছিলেন তপস্বীর বেশে—পরিবেশও তপস্যার। মনোময় বনভূমি। প্রকৃতি যেন সেইভাবেই সাজিয়ে রেখেছিলেন তাঁর পরিবেশ। জানতেন রাম আসবে। বসেছিলেন রামেরই অপেক্ষায়। এলেনও। মাতৃস্তনের দুধ যেন—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই আয়োজন শেষ।
সকাল থেকেই আনন্দ আর জনকোলাহলে মুখরিত চিত্রকূট। দলে দলে চলেছে তীর্থযাত্রী। চলেছে গান গাইতে গাইতে—সীয়ারাম, সীয়ারাম—জয় জয় সীয়ারাম। বাচ্চা থেকে বুড়ো—আছে সব বয়সের। বয়স্কদের সংখ্যাই বেশী। এসেছে শেষ বয়েসে—পর-পারের পাথেয় সংগ্রহ করতে।
অন্তরে কষ্ট হয়—যখন দেখি, প্রায় উত্থানশক্তিরহিত বৃদ্ধা মাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে চলেছে তার মধ্যবয়স্ক সন্তান। কোন দ্বিধা নেই—নেই সংকোচ, লজ্জা, চলেছে আপন মনে। কোথা থেকে এসেছে এরা—বলতে পারিনে। সাঁওতাল রমণীর পিঠে বাঁধা শিশু যেন। অস্থিচর্মসার দেহ, কোটরগত চোখ—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।
মা-ও তো আমার এমনই বৃদ্ধা। কই, আমি তো পারিনে! কিসের অভিমান—কেন পারিনে? কোথায় যেন বাধে! সন্তান পরিচয় দেয়ার অযোগ্য—যারা আমার মতো বৃদ্ধা মাকে ফেলে তীর্থে বেরোয়—পাহারাদার রেখে।
ধর্মশালা থেকে বেরিয়েছি। দু-পাশে সারি সারি দোকান। চলেছি রাম ঘাটে। সামান্য একটু পথ। একটা পুল পেরিয়ে এলাম। ছিলাম মধ্যপ্রদেশে—এলাম উত্তরপ্রদেশে। এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে আসতে সময় লাগলো না দু-মিনিটও। গেলাম—আরও কিছুটা এগিয়ে।

চিত্রকূটের বুক চিরে তর্-তর্ করে বয়ে চলেছে ছোট্ট নদী মন্দাকিনী। রামপ্রেমিক সাধক কবি তুলসীদাস। তাঁরই স্মৃতিধন্য মন্দাকিনী তীরে—রামঘাট।

তখনও তুলসীদাস চিত্রকূটে আসেননি। যুবক তুলসী। অবস্থান করছেন কাশীতে। নিয়মিত ভজনে কোন আলস্য নেই তাঁর। প্রতিদিন ভোরেই ওঠেন। শৌচকর্ম সারেন। শৌচকর্মের অবশিষ্ট জলটুকু ফেলে দেন না এখানে ওখানে। ঢেলে দেন একটি গাছের গোড়ায়। প্রতিদিনই এমনটি করেন তিনি। এটাও যেন তাঁর নিত্যকর্ম। ভাবেন না কিছুই। রাম ছাড়া তুলসীদাসের আর কাউকে ভাবার অবকাশ নেই।

ওই গাছেই বাস করতো একটি প্রেত। হঠাৎ একদিন আত্মপ্রকাশ করলো তুলসীদাসের সামনে। জানালো, গাছের গোড়ায় প্রতিদিন জল ঢালায় সে বড়ই প্রসন্ন। তাই জিজ্ঞাসা করলো, তুলসীদাসের কোন উপকারে আসতে পারে কিনা?

এক-মন, একচিন্তা—একই ধ্যান তুলসীদাসের রাম। জানতে চাইলেন প্রেতের কাছে, কিভাবে সে পেতে পারে প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত ধন প্রভু রামের দর্শন?

খুশী হয়ে উত্তর দেয় প্রেত—প্রতিদিন রামায়ণ পাঠ হয় দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আসেন মহাবীর হনুমানজী। ভক্তিভরে শোনেন রামায়ণের রাম-গুণ কথা। একমাত্র তিনিই এ-পথের দিশারী। তাঁর কাছে গেলে রামচন্দ্রকে লাভ করার পথ বলে দিতে পারবেন তিনি।

প্রেতযোনির উপদেশে আনন্দিত হলেন ভক্তকবি তুলসীদাস। একদিন গেলেন রামায়ণ পাঠ আসরে। দেখা পেলেন মহাবীর হনুমানজীর। তপোনিষ্ঠ তুলসী জানালেন তাঁর মনের আকুল আকুতি—প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন পেতে চান তিনি।

অর্থের খোঁজে ফেরে মানুষ—রামের খোঁজে ফেরে কই! এমন ভক্তের দেখা পেয়ে নিজেও খুশী হলেন মহাবীরজী। প্রসন্নচিত্তে বললেন—শ্রীরামের অবতার লীলার শুরু হয়েছে চিত্রকূট থেকে। তাঁরই পাদস্পর্শে ধন্য চিত্রকূটের জলমাটি—বৃক্ষলতাদি। সাধনজীবনের পক্ষে সেখানকার পরিবেশও অতুলনীয়। চিত্রকূটের মনোরম বনেই নিত্যখেলা করেন প্রভু রামচন্দ্র। সেখানে কিছুদিন তপস্যা করলেই মিলবে প্রভুর দর্শন।

আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে তুলসীদাসের মন-প্রাণ। প্রণাম করলেন মহাবীরজীকে। ফিরে গেলেন ভজন কুঠিরে। কাশীতে বাস করলেন আরও কিছুদিন। কর্ণঘণ্টা নামক স্থানের এক গুরু আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন তিনি। তখন বয়স তাঁর একত্রিশ। তারপর একদিন কাশী ছেড়ে পদব্রজে গেলেন চিত্রকূটে।

প্রতিদিন সকালে স্নান সেরে ইষ্টপূজা করেন তুলসীদাস। এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না কখনও। রাম-নাম গানে সদাই থাকেন আত্মমগ্ন। তবুও প্রভুর দর্শন পান না তিনি। এইভাবেই কাটতে থাকে প্রেমিক সাধকের একদিন দুদিন করে দিনের পর দিন।

কোন একদিন সকালে—মন্দাকিনীর এই রামঘাটে স্নান সেরেছেন। ঘাটে বসে

আয়োজন করছেন ইষ্টপূজার। ভাবতন্ময় হয়ে চন্দন ঘষছেন মরমীয়া সাধক তুলসীদাস।

এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন সুন্দর দুটি বালক। অপরূপ লাবণ্যময় সুঠাম দেহ। কি অদ্ভুত এক আকর্ষণ এই বালক-দুটির। এমন রূপ কি কোন মানুষের হতে পারে! দেখে তন্ময় হয়ে গেলেন ভক্ত-কবি। কোন কথা সরলো না মুখ থেকে। হঠাৎ বালক-দুটিই বললেন তুলসীদাসকে—চন্দন দিয়ে তিলকসেবা করিয়ে দিতে।

এ কথায় মুহূর্তমাত্র দেরী হলো না তুলসীদাসের। বুঝতে পারলেন, এ-বালক দুটি আর কেউই নয়—তাঁরই প্রাণের ধন, পরম সাধনার বস্তু—স্ত্রী পরিত্যক্ত হওয়ার পর একমাত্র কাম্য ইষ্টদেব রাম লক্ষ্মণ—এসেছেন দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতে।

ভাবাবিষ্ট হলেন তুলসীদাস। পরমানন্দচিত্তে প্রেমিক-ভক্ত বালক-দুটির মুখমণ্ডল সাজিয়ে দিলেন চন্দন দিয়ে। গলায় পরিয়ে দিলেন বনফুলের মালা। তারপর হারিয়ে ফেললেন বাহ্যজ্ঞান। কেটে গেল অনেকটা সময়। জ্ঞান ফিরে এলো। দেখলেন—কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছেন বালক-দুটি। হতবাক হয়ে বসে রইলেন তুলসী। আনন্দে—চোখের জলে বুক ভেসে গেল তুলসীর।

তুলসীদাসের জীবনী থেকেই জানা যায়—চর্মচক্ষে তিনি রামচন্দ্রের স্থূলমূর্তিতে দর্শন পেয়েছেন তিনবার।

চিত্রকূটের মন্দাকিনীর এই ঘাটেই রামচন্দ্রের দর্শন পান তুলসীদাস—তাই ঘাটটি আজও রামঘাট নামেই প্রসিদ্ধ। এই ঘটনার আনুমানিক সময়কাল ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

রামায়ণের কথা। ভরতের মুখে রাজা দশরথের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন রাম লক্ষ্মণ সীতা। কাতর হয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন পর্ণকুটিরে। তারপর সুমন্ত্র মন্দাকিনী তীরে নিয়ে গেলেন রামকে। জলে নেমে অঞ্জলীপূর্ণ জল নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাম বললেন, 'পিতৃলোকগত হে পিতা, আমার এই নির্মল জল গ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ করুন।' প্রথমে তর্পণ, পরে পিণ্ডদান করে সীতা ও ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাম ফিরে এলেন তাঁর কুটিরে।

কথিত আছে—রামচন্দ্র ভ্রাতৃসঙ্গে পারলৌকিক তর্পণাদির কাজ সম্পন্ন করেন এই রামঘাটে।

সুন্দর বাঁধানো রামঘাট। বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। ঘাটের পাশেই বেশ খানিকটা বাঁধানো উঁচু জায়গা। পরপর সারি দিয়ে রয়েছে অনেকগুলি মন্দির। এরই মাঝে—মহাত্মা তুলসী দাসজীর প্রাচীন আশ্রম ও মন্দির। ঘাট থেকে অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দিরে। ভিতরে রয়েছে একটি গুহা। বয়স কম হলো না এই গুহার। তুলসীদাসের আমল থেকে আজও আছে একই অবস্থায়। তখনকার দিনে এত লোক সমাগম ছিল না চিত্রকূটে। নির্জনে—এই গুহাতে বসেই পরমানন্দে ভজন করতেন তুলসীদাস। আত্মহারা হতেন রাম-প্রেমে।

অনেক পরের কথা। এই গুহামন্দিরের সামনেই একটি মন্দির স্থাপন করেন গোয়ালিয়রের মহারাণী শান্তিবাঈ। প্রেমিক তুলসীদাসের স্মৃতিরক্ষার জন্যই রাণীর আন্তরিক অবদান এই মন্দিরটি।

ছোট্ট মন্দির তুলসীদাসের। কোন আড়ম্বর নেই মন্দিরে—মন্দিরের গায়ে—কোথাও। আসলে তুলসীর মন আর মন্দিরে কোন তফাৎ ছিল না যে। রাম লক্ষ্মণ আর সীতার অষ্টধাতুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে মন্দিরে। গোস্বামী তুলসীরও সুন্দর একটি পাথরের মূর্তি রয়েছে—রামচন্দ্রের বাঁ-পাশে।

এই আশ্রম মন্দিরের কাছেই আছে আরও একটি মন্দির। আকারে বড় নয়—মাঝারী। উঠতে হয় সিঁড়ি ভেঙে। চারদিকে খোলা বারান্দা—গম্বুজযুক্ত মন্দির। মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে গর্ভমন্দির। উঁচু বেদিতে আছে রাম সীতার মূর্তি। রামচন্দ্রের পর্ণকুটির নামেই প্রসিদ্ধ এই মন্দিরটি। এর ডানপাশেই আরও একটি ছোট্ট মন্দির—এটি লক্ষ্মণের পর্ণকুঠির নামেই পরিচিত। মন্দিরে স্থাপিত আছে লক্ষ্মণের সুদর্শন একটি পাথরের মূর্তি।

রামায়ণের কথা। চিত্রকূটে প্রথমেই রাম লক্ষ্মণ সীতা উপস্থিত হলেন বাল্মীকির আশ্রমে। কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করলেন মহর্ষিকে। তারপর আনন্দিত হলেন সকলের পরিচয় জেনে। আন্তরিক অভ্যর্থনা ও সৎকার করলেন তাঁদের। এখন বসবাসের জন্য প্রয়োজন আশ্রমের। তাই বাসগৃহ নির্মাণের জন্য কাঠ সংগ্রহের কথা বললেন রাম লক্ষ্মণকে।

অনেক গাছ কেটে আনলেন লক্ষ্মণ। নির্মাণ করলেন একটি সুন্দর পর্ণকুটির। যথা নিয়মে মন্ত্রপাঠ, জপ, হোম, দেবার্চ্চনা এবং বাস্তুশান্তি করলেন রাম। তারপর প্রবেশ করলেন পর্ণশালায়।

রমণীয় চিত্রকূট পর্বত, মাল্যবতী নদী, ফল ফুল, মৃগ পাখীতে সুশোভিত বাগান আর বায়ুপ্রবাহ থেকে সুরক্ষিত পর্ণকুটির—এ-সব লাভ করে ভুলে গেলেন নির্বাসনের দুঃখ। আনন্দে দিনযাপন করতে লাগলেন সকলে।

চিত্রকুটে পর্ণকুটির—রাম ভরতের মিলন

দুদিন পরে সন্ধ্যায় ফিরে এলেন সুমন্ত্র। নিরানন্দ নিঃশব্দ অযোধ্যায়। শত সহস্র অযোধ্যাবাসী ছুটতে লাগলো তাঁর রথের পিছনে। ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞাসা করতে থাকলো—রাম কোথায়?

দুঃখিত সুমন্ত্র উত্তর দিলেন, রামের সঙ্গে গেছিলাম গঙ্গাতীর পর্যন্ত। তারপর তাঁরই আজ্ঞায় ফিরে এসেছি।

গঙ্গা পার হয়ে গেছেন রাম। এ-টুকু জেনেই শোকে আকুল হলো নগরবাসীরা। জানলায় দাঁড়িয়ে বিলাপ করতে লাগলো অযোধ্যার নারীরা। মুখ ঢেকে সুমন্ত্র

গেলেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

আটমহলের প্রাসাদ। অল্প আলোর ঘরে বসে আছেন রাজা দশরথ—দীন, আতুর হয়ে। রাজাকে অভিবাদন করলেন সুমন্ত্র। জানালেন রামের সকল সমাচার। রামের সংবাদ শুনে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন দশরথ। স্বামীকে সুমিত্রার সাহায্যে উঠালেন কৌশল্যা।

তারপর কাতর দশরথ নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন সুমন্ত্রকে। সবিস্তারে উত্তর দিলেন সারথি। রাজা বললেন, পাপকুলজাতা কৈকেয়ীর কথায় অঙ্গীকারবন্ধ হয়েছিলাম আমি। মন্ত্রকুশল বৃদ্ধ অমাত্য, সুহৃদ্ বা নাগরিকগণের কারও সঙ্গে পরামর্শ করিনি। কৌশল্যা, রামের বিরহে আমি যে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছি—বেঁচে থাকতে তা থেকে উদ্ধার পাবো না।

শোকাতুর রাজা দশরথ। এইভাবে বিলাপ করতে করতেই প্রাণত্যাগ করলেন মাঝরাতে। সকালে অযোধ্যার দূতগণ যাত্রা করলেন কেকয়রাজপুরে। রাজগৃহে এসে কেকয়রাজকে প্রণাম করে উপহার দিলেন বস্ত্র, আভরণ। তারপর জানালেন কুলগুরু বশিষ্ঠের দেয়া সংবাদ।

মাতামহের অনুমতি নিয়ে প্রণাম করলেন ভরত। শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন রথে। ফিরে এলেন শ্রীহীন নিরানন্দ অযোধ্যায়। উদ্বিগ্নচিত্তে ঢুকলেন রাজভবনে। পিতার গৃহে দেখতে পেলেন না পিতাকে। এলেন কৈকেয়ীর কাছে। প্রণাম করলেন। সোনার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কৈকেয়ী। আনন্দিত মনে আলিঙ্গন করলেন ভরতকে। পরে কুশল প্রশ্ন করলেন। মাতুলালয়ে কুশল সংবাদ জানিয়ে ভরত জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজের দূতেরা এত তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এলো কেন আমাকে? তোমার পালঙ্ক শূন্য কেন? পিতাকে দেখছি না কেন এখানে? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার ঘরে আছেন?

সু-সংবাদ দিচ্ছি মনে করে কৈকেয়ী বললেন, প্রাণীমাত্রেরই যে গতি—তেজস্বী যজ্ঞপরায়ণ সজ্জনপালক তোমার পিতাও সেই গতি পেয়েছেন।

এই সংবাদে শোকাতুর ভরত বললেন, মহারাজ রামের অভিষেক অথবা যজ্ঞ করবেন—এই ভেবেই যাত্রা করেছিলাম আনন্দে। কিন্তু এখন তার বিপরীত দেখে অন্তর আমার ব্যথিত হচ্ছে। কোন্ ব্যাধিতে মৃত্যু হলো পিতার? রামকে শীঘ্রই আমার আগমন সংবাদ দাও। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য। আমি তাঁর পদযুগল বন্দনা করবো।

কৈকেয়ী বললেন, রাম গাছের বাকল পরে সীতা আর লক্ষ্মণের সঙ্গে গেছে মহাবনে।

রামের চরিত্রদোষের আশংকায় আশংকিত হলেন। মুহূর্ত দেরী না করেই ভরত বললেন, রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধনহরণ করেছেন? কোন ধনী বা দরিদ্র ব্যক্তিকে হিংসা করেছেন? কোন পরস্ত্রীতে লোভ হয়নি তো?

খুশী মনে নিজের কুকর্ম জানিয়ে কৈকেয়ী বললেন, কোন অপরাধই রাম

করেনি। তার অভিষেক হবে শুনে দুটি বর চেয়েছিলাম রাজার কাছে। তোমার জন্য রাজ্য আর রামের জন্যে বনবাস। তোমার পিতা সত্যনিষ্ঠ, তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করেছেন। সীতা আর লক্ষ্মণের সঙ্গে নির্বাসিত হয়েছে রাম। প্রিয়-পুত্রকে দেখতে না পেয়ে শোকে মৃত্যু হয়েছে মহারাজের। এ-সব ঘটিয়েছি তোমার জন্যেই। এখন তুমি শোক ত্যাগ করো। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

কৈকেয়ীর কথা শুনে দুঃখে সন্তপ্ত হলেন ভরত। তিরস্কারও করলেন রূঢ়ভাষায়। দশরথের অন্ত্যেষ্টির পর কেটে গেল চৌদ্দদিন। এবার রাজপুরুষগণ ভরতকে বললেন, এখন এই রাজ্যের পরিচালক কেউ নেই। আপনিই আমাদের রাজা হন। পৈতৃক রাজ্য নিয়ে রক্ষা করুন আমাদের।

অভিষেক সামগ্রী প্রদক্ষিণ করলেন ভরত। তারপর বললেন, আমাদের কুলের নিয়ম—জ্যেষ্ঠই রাজা হবেন। অতএব কোন অনুরোধ করবেন না আপনারা। অভিষেকের সমস্ত উপকরণ নিয়ে বনে যাবো আমি। সেখানে অভিষিক্ত করবো রামকে। ফিরিয়ে আনবো অযোধ্যায়। তাঁর জায়গায় আমিই বনে থাকবো চৌদ্দ-বছর। যিনি নামেমাত্র আমার মাতা—কিছুতেই পূর্ণ হতে দেবো না তাঁর কামনা। বনযাত্রার জন্য এখনই মহতী চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত করুন। আমার মাতা যে পাপ করেছেন—তা আমার বাসনা নয়। কৃতাঞ্জলী হয়ে বনবাসী রামকে প্রণাম করছি এখান থেকে। নরশ্রেষ্ঠ রামই রাজা। তাঁরই অনুসরণ করবো আমি। তিনি ত্রিলোকেরও রাজা হবার যোগ্য। যদি রামকে না আনতে পারি তবে আমিও বাস করবো সেখানে।

ভরতের কথায় আনন্দিত হলেন রামের অনুরক্ত সভাসদ্‌গণ। জলে চোখ ভরে উঠলো সকলের। ভরত বললেন, সুমন্ত্র, শীঘ্রই আমার রথ প্রস্তুত করো।

সকাল হলো। যাত্রা করলেন ভরত। বহুদূর গিয়ে উপস্থিত হলেন গঙ্গাতীরে—শৃঙ্গবের পুরে।

সুমন্ত্র ভরতকে বললেন, দেখো, রামের সখা নিষাদপতি গুহ আসছেন। দণ্ডকারণ্যের সমস্ত সংবাদই রাখেন এই বৃদ্ধ। রাম লক্ষ্মণ কোথায় আছেন—নিশ্চয়ই ইনি জানেন।

নিষাদরাজের অতিথি হলেন ভরত। সসৈন্য রাত্রিযাপন করলেন সেখানে। রামের চিন্তায় বিষণ্ণ ভরত। আশ্বাস দিলেন গুহ। জানালেন শৃঙ্গবের পুরে রাম সীতা লক্ষ্মণের অবস্থা-বৃত্তান্ত।

সকালে গুহের আজ্ঞায় বহু নৌকা নিয়ে এলো নিষাদরা। ভরতের বাহিনী উপস্থিত হলো প্রয়াগে। এক ক্রোশ গিয়ে উপস্থিত হলেন ভরদ্বাজ-আশ্রমে।

ভরত বশিষ্ঠকে আগে রেখে প্রবেশ করলেন আশ্রম কুটিরে। কুশল বিনিময় হলো। এবার ভরতকে বললেন ঋষি ভরদ্বাজ—তুমি তো রাজ্য শাসন করছিলে, এখন এখানে

আসার কারণ কি? পত্নীর কথায় দশরথ যাঁকে বনে পাঠিয়েছিলেন—সেই রামের রাজ্য নিষ্কণ্টক ভোগ করার অভিপ্রায়ে কি তুমি এখানে এসেছো কোন পাপ কার্য করতে?

এ-কথায় অত্যন্ত ব্যথিত হলেন ভরত। বললেন, ভগবান আপনিও যদি আমাকে এমন মনে করেন—তবে মরণই আমার ভালো। আমার মাতা যা করেছেন—তা আমার অভিপ্রেত নয়। আমি এসেছি রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। দয়া করে বলুন—কোথায় আছেন তিনি?

প্রীত হলেন ভরদ্বাজ। বললেন, রঘুবংশীয়গণের যোগ্য তোমার চরিত্র—তা আমি জানি। তোমার সংকল্প দৃঢ় করার জন্যই প্রশ্ন করেছিলাম। রাম লক্ষ্মণ সীতা এখন বাস করছেন চিত্রকূটে। কাল সেখানে যেয়ো। আজ আমার অতিথি হও।

সকাল হলো। ভরদ্বাজকে বন্দনা করলের ভরত। বললেন, ক্লান্ত দূর হয়েছে আমাদের। এখন যেতে চাই রামের কাছে। অনুগ্রহ করে পথ বলে দিন।

ঋষি ভরদ্বাজ বললেন, গভীর অরণ্যের মধ্যে আছে চিত্রকূট পর্বত। এখান থেকে আড়াই যোজন দূরে, তার উত্তর পাশেই মন্দাকিনী নদী। তারই কাছে একটি পর্ণকুটিরে বাস করছেন তোমার দুই ভ্রাতা। দক্ষিণদিকের পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে তুমি বাঁ-পাশের দক্ষিণমুখী শাখা-পথে যাও। ওই পথই চলে গেছে চিত্রকূট।

ভরদ্বাজকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন ভরত। সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন আশ্রম ছেড়ে।

বহুদূর গিয়ে ভরত বললেন, চিত্রকূটের যে বর্ণনা শুনেছি—তাতে মনে হচ্ছে এখন সেখানেই উপস্থিত হয়েছি আমরা। দূরে নীলমেঘের মতো বন—ওটাই চিত্রকূট পর্বত।

এবার ভরত এলেন এক মনোরম পর্ণকুটিরের কাছে। ভিতরে দেখলেন, তৃণে ঢাকা বেদীতে বসে আছেন জটাবল্কধারী মহাবাহু রাম। সঙ্গে সীতা লক্ষ্মণ। ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলেন ভরত। আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, প্রজারা যাঁকে রাজসভায় উপাসনা করতে চায়, আমার সেই অগ্রজ এখন বাস করছেন বন্যমৃগের সঙ্গে। যে অঙ্গে মাখানো হতো মহার্ঘ চন্দন—এখন তা মলিন হয়েছে। আপনি দুঃখ পেয়েছেন আমারই জন্যে। ধিক্, আমার এই লোকনিন্দিত জীবন।

এই বলে রামের পায়ের উপরে পড়লেন ভরত। এবার ভরত শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন রাম।

ভরতকে কোলে বসিয়ে রাম বললেন, কেন তুমি বনে এলে—পিতার কি কিছু হয়েছে? তিনি জীবিত রয়েছেন। তাঁকে ছেড়ে এখানে আসা কিন্তু তোমার উচিত হয়নি।

এবার অযোধ্যার সমস্ত সংবাদ জানতে চাইলেন রাম। ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আর্য, আমার জননীর প্ররোচনায় দুষ্কর কর্ম করেছেন পিতা। ফলে পুত্রশোকে

পীড়িত হয়ে স্বর্গে গেছেন তিনি। রাজ্য পেলেন না কৈকেয়ীও। পতিহীনা শোকার্তা হয়ে ঘোর নরকে পতিতা হবেন তিনি। বিধবা মাতৃগণ আর প্রজারা এসেছেন আপনার কাছে। প্রসন্ন হয়ে রাজপদে অভিষিক্ত হোন আপনি।

রাম বললেন, রাজ্যের কারণে পাপাচরণ করতে পারিনা আমি। কোন দোষই নেই তোমার। অজ্ঞানবশে জননী যা করেছেন তার জন্য নিন্দা করো না তাঁর। পিতা তোমাকে যা দিয়ে গেছেন—তা নিঃসঙ্কোচেই ভোগ করো তুমি।

ব্যথিত ভরত বললেন—যে রাজ্য পিতা আমাকে দিয়েছেন, তা আপনাকেই দিচ্ছি আমি। নিষ্কণ্টক ভোগ করুন আপনি। বর্ষাকালে জলপ্রবাহে ভাঙা সেতুর মতো এই রাজ্য আপনি ছাড়া কে রক্ষা করবে? গর্দভের গতি অশ্বের সমান নয়, পাখীর গতি গড়ুড়ের সমান নয়—সে-রকম কোন শক্তিও আমার নেই যে, আপনাকে অনুসরণ করি। আপনার তুল্য পৃথিবীতে কে আছে—দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করেনা, সুখ হৃষ্ট করেনা। জীবন ও মৃত্যু. সৎ ও অসৎ—সবই সমান আপনার কাছে। রাজা দশরথ আমাদের গুরু, পিতা এবং দেবতা। তাঁর নিন্দা আমি করছি না। প্রবাদ আছে, অন্তিমকালে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। রাজা যা করেছেন—তাতে সত্য হয়েছে এই প্রবাদ। মোহবশে পিতা যে অন্যায় করেছেন—আপনি তার প্রতিকার করুন। আমি হীনবুদ্ধি। বয়সে কনিষ্ঠ। আপনি থাকতে কি করে রাজ্য পালন করবো আমি? রাজ্য গ্রহণ করে সকলকে তুষ্ট করুন।

শ্যামবর্ণ পদ্মপলাশলোচন রাম। মত্ত-হাঁসের মতো কলকণ্ঠে বললেন—বৎস, চন্দ্রের শোভা দূরীভূত হতে পারে, হিমালয় হিম ত্যাগ করতে পারেন, সাগর বেলা অতিক্রম করতে পারেন—কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারবো না আমি।

বিনীতকণ্ঠে ভরত বললেন—আর্য, আপনার পদধূলিযুক্ত পাদুকা-দুটি দিন। জটাচীরধারী ফলমূলাশী হয়ে থাকবো আপনারই প্রতীক্ষায়। নগরের বাইরে বাস করবো চৌদ্দ-বছর। আপনার পাদুকাকে নিবেদন করেই করবো সমস্ত রাজকার্য সম্পাদন। চৌদ্দ-বছর পূর্ণ হলে যদি আপনাকে না দেখি—তবে আগুনে প্রবেশ করবো আমি।

রাম আবার আলিঙ্গন করলেন ভরত শত্রুঘ্নকে। তারপর বললেন—তাই হবে। আমার আর সীতার শপথ—মাতা কৈকেয়ীর উপর রুষ্ট থেকো না তুমি।

সেই অলংকৃত উজ্জ্বল পাদুকা-দুটি সুন্দর একটি হাতির মাথায় স্থাপন করে ভরত প্রদক্ষিণ করলেন রামকে। গুরুজনদের প্রণাম করে মন্ত্রী, প্রজা এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদায় দিলেন রাম। কণ্ঠরোধ হয়ে গেল মাতৃগণের। কিছুই বলতে পারলেন না তাঁরা। রাম তাঁদের প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করলেন কুটিরে।

রাম-ভরতের মিলন হলো চিত্রকূটে। দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ এতক্ষণ দেখছিলেন প্রচ্ছন্ন থেকে। ভ্রাতার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন তাঁরা।

চিত্রকূট থেকে সদলবলে যাত্রা করলেন ভরত। পথিমধ্যে সকল বৃত্তান্ত জানালেন ঋষি ভরদ্বাজকে। তারপর শৃঙ্গবের পুর হয়ে উপস্থিত হলেন অযোধ্যায়।

কথিত আছে, চিত্রকূটের এই পর্ণকুটিরের স্থানটিতেই একদা মিলন হয়েছিল রাম-ভরতের।

পর্ণকুটির দেখে এলাম চিত্রকূটের তীর্থদেবতা মত্তগজেন্দ্রনাথ মন্দিরে। মাঝারী আকারের মন্দির। প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে সারা গায়ে। এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে চারটি লিঙ্গমূর্তি। জানা যায়, প্রাচীন এই মন্দিরটির বয়স প্রায় সাড়ে তিনশো বছর।

এখান থেকে গেলাম—ভরত মন্দিরে। এক মন্দির থেকে আর একটির দূরত্ব বেশী নয়। ঘুরে ঘুরে দেখা যায়। সব মন্দিরেই রাম। রামকে বাদ দিয়ে কোন মন্দিরই নেই। তবে একটু পরিবর্তন ঘটেছে এখানে। রাজা দশরথকে বাদ দিয়ে সপরিবারে রাম অবস্থান করছেন এই মন্দিরে। মহর্ষি জনক, বশিষ্ঠ, মাতা কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, রামের সঙ্গে তিন ভ্রাতা, সারথী সুমন্ত্র পর্যন্ত। হনুমানের অধিষ্ঠান সব মন্দিরেই—মন্ত্রীদের পি. এ.-র মতো।

রামঘাটে এবং পাশেই রয়েছে বেশ কিছু মনিহারী দ্রব্যের দোকান। বিক্রি হচ্ছে বাসনপত্র, কাচের চুড়ি, পাথরের নানা রকম জিনিষ-পত্র। তবে ভালো খাবারের দোকান—অভাব আছে এই চিত্রকূটে। কিছুতেই মন ভরবে না কোন দোকানে খাবার খেলে। আরও ছোট ছোট অনেক মন্দিব আছে এখানে—তেমন কোন আকর্ষণীয় নয়। আর সব তীর্থে যেমন থাকে—এখানেও তেমন।

সাধুসঙ্গ—স্বার্থান্বেষী গৃহী—উপেক্ষিত সাধু-সমাজ

বয়েসটা এই মুহূর্তে আন্দাজ করতে পারলাম না। তবে বয়স্ক যে—তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথার চুলগুলো সোজা সোজা। নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। দোহারা চেহারা। সুন্দর চোখ। নাকটাও সুন্দর—টিকালো। কপালে চন্দনের তিলক। সাধুবাবা বৈষ্ণব। আপন-ভোলা হয়েই বসেছিলেন। মন্দাকিনী গঙ্গা-তীরে—রামঘাটে। চিত্রকূটের মন্দাকিনী মোটেই খরস্রোতা নয়। বয়ে চলেছে ধীরে। যেন কোন তাড়া নেই। রামের মতোই ধীর স্থির অচঞ্চল। পাশেই ছোট্ট ঝোলাটা তাঁর। একটা কমণ্ডলুও। একটা সাদা কাপড়ের দুটো ফালি। পরনে এক টুকরো। গায়েও এক টুকরো জড়ানো। বেশ ময়লা। বসনটা গেরুযা বা কোন রঙ করা নয়। সাদা কাপড় বহু ব্যবহারে যেমন ময়লা হয়—তেমনই। বেলা প্রায় দশটা। একটু দূরে—ঘাটে স্নান করছে অনেকেই।

কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম হুট্ করে। একটু থতমত খেয়েই বললেন সাধুবাবা,

—ঠিক হ্যায় বেটা—ঠিক হ্যায়। রামজী আনন্দে রাখুক তোকে।

জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা কি চিত্রকূটেই থাকেন, না অন্য কোথাও ভজন কুটির আছে?
তাকালেন আমার মুখের দিকে। কৌতূহলী দৃষ্টি। দাঁড়িয়ে আছি। বসতেও বললেন না। কোন উত্তরও দিলেন না। ভাবে বুঝলাম—সহজে মুখ হয়তো খুলবেন না সাধুবাবা। নিজেই বললাম,
—আমি কলকাতায় থাকি। শ্রীরামের লীলাক্ষেত্র চিত্রকূট। দর্শনে এসেছি। দূর থেকে দেখতে পেলাম আপনাকে। তাই কাছে এলাম। আপনার 'ভাব'-এর কি কোন ব্যাঘাত ঘটালাম?
এবার উত্তরে সাধুবাবা বললেন,
—না না বেটা, সে-সব কিছু হয়নি। বোস্ বোস্। আমার আবার ভাব কোথায়?
পাশেই বসলাম। ঘাটের সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে। আবার সেই একই প্রশ্ন করতে বললেন,
—চিত্রকূটেই থাকি আমি। রয়েছি প্রায় বছর ত্রিশ। স্থায়ী ভজনকুটির বা ডেরা কোথাও আমার নেই।
কথাটা শুনেই কৌতূহল বেড়ে গেল। জানতে চাইলাম,
—শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতে কি করেন—কোথায় থাকেন? আশ্রয় তো একটা কোথাও আছে?
হাসতে হাসতেই বললেন,
—রামজীই আমার আশ্রয়। অসুবিধে হয় না। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরি ফিরি। সন্ধ্যের পর কখনও কোন গাছতলায়—কখনও ধর্মশালায়, নইলে কোন মন্দিরের বারান্দায় রাতটা কাটিয়ে দিই। রাতটুকু তো—কোন না কোন ভাবে কেটেই যায়।
মনে মনে ভাবলাম—থাকার ব্যাপারটা কোন ব্যাপারই না সাধুবাবার কাছে। সমস্যা তো নয়ই। প্রশ্ন করলাম,
—এত বছর রয়েছেন এখানে—থাকার জন্যে অন্তত ডেরা তো একটা করতে পারতেন?
হালকা হাসিতে ভরা প্রসন্ন মুখ সাধুবাবার। বললেন,
—এখানে যদি ঘরই বানাবো—তাহলে রামজী আমাকে ঘর থাকতে ঘরছাড়া করলেন কেন?
সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,
—আপনি ঘর ছাড়লেন কেন বাবা?
চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সাধুবাবা। কাছাকাছি নেই কেউই। তবে দেশওয়ালী তীর্থযাত্রীরা চলেছে দলে দলে—তুলসীদাসের আশ্রমে। চেয়ে রইলাম মুখের দিকে। লক্ষ্য করলাম—কোন চঞ্চলতা নেই সাধুবাবায়। দৃষ্টি

ফেরালেন বয়ে যাওয়া স্রোতের দিকে। এবার তাকালেন আমার মুখের দিকে। মুহূর্তে উদাসীনতায় ভরে গেল মুখখানা। তারপর খুব শান্ত কণ্ঠেই বললেন,
—বেটা, বিত্ত আর স্ত্রী—এর কোনটা থাকলে সাধারণত সংসার ত্যাগ হয় না। আমি ঘর ছেড়েছি মনের গ্লানিতে।
জানতে চাইলাম,
—মনে কি এমন গ্লানির সৃষ্টি হয়েছিল যে, আপনাকে সংসার ত্যাগ করতে হলো—আপনি কি বিয়ে করেছিলেন?
উত্তর দিলেন নিঃসঙ্কোচেই,
—হাঁ বেটা, সংসার করেছিলাম। টিকলো না। রামজীর ইচ্ছা নেই। বউটা মারা গেল অসুখে। রেখে গেল দুবছরের একটা বাচ্চা। তারপর মনের গ্লানিতেই একদিন বেরিয়ে পড়লাম।
বাচ্চার কথাটা শুনে মনটা ছ্যাৎ করে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলাম,
—কার কাছে রেখে এলেন বাচ্চাটাকে? ওর ওপরে কি এতটুকুও মায়া হলো না আপনার?
নির্বিকার উত্তর দিলেন অথচ মলিন মুখে,
—সংসারটা মায়ার বন্ধনেই আবদ্ধ। ওটা কাটাতে না পারলে মুক্তি কোথায়? আবার ঘুরে আসতে হবে যে! আর ছেলেটার ওপর মায়া তো আমার ছিলই। কিন্তু সংসার থেকে যে মনটা একেবারে উঠেই গেল। সন্তানের মায়া আমাকে আটকাতে পারলো না। কেটে গেল। বেরিয়ে পড়লাম। আর বাচ্চাটাকে ভগবান কোন না কোন ভাবে তো রক্ষা করবেনই।
খুব সাধারণ ভাবেই কথাটা বললেন সাধুবাবা। কিন্তু আমার ভালো লাগলো না। এটা কি কোন কথা! জিজ্ঞাসা করলাম,
—গৃহত্যাগের পর বাড়ীতে গেছেন কখনও—ছেলেটা দেখার জন্য মনটা ছটফট্ করেনি আপনার?
কথাটা শুনে ভুরুটা সামান্য কুঁচকে উঠলো সাধুবাবার। পরমুহূর্তেই তা মিলিয়ে গেল। এবার মুছে গেল মলিনতার ছাপটুকু। সহজভাবেই উত্তর দিলেন,
—না বেটা, আর কখনও বাড়ীতে যাইনি। তবে ঘর ছাড়ার পর প্রথম প্রথম একটু চিন্তা হতো ছেলেটার জন্যে। এখন আর কিছুই হয় না।
মনে মনে বললাম—অপদার্থ। একটা ছোট্ট শিশুকে ফেলে রেখে এলো—অথচ মনে কিছুই হয় না। একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বললাম,
—একটা শিশুর জীবন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই ভাবলেন না। এটা কি সত্যিই মানুষের মতো কাজ করেছেন? শিশু তো কোন অপরাধ করেনি। তবে কেন তাকে পৃথিবীতে এনে এইভাবে পরিত্যাগ করলেন? আপনি যেমন শিশুরূপী নারায়ণকে পরিত্যাগ করেছেন—আপনার উপাস্য রামজীও তো আপনাকে পরিত্যাগ করতে পারেন?

এ-কথা সাধুবাবার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করলো বলে মনে হলো না। তিনি বললেন,
—বেটা এই সংসারে কেউ কাউকে গ্রহণ করে না—করে না পরিত্যাগও। অনেক সুন্দর সংসার তো ভেঙে যায়—কেন বলতে পারিস্? অথচ ভাঙার তো কথা নয়—তবুও ভাঙে। আমি কি চেয়েছিলাম—বউটা মরুক, ছেলেটাকে ফেলে আসি—সাধু হই? কিন্তু এ-সবই তো হলো। তুই সংসারী। আমার মতো অবস্থা না হলে—আমার জায়গায় না এলে তুই বুঝবি না। তোর জীবন-ভাবনা এক রকম—আমার আর এক। আরও একটা কথা জানবি, ভগবান কাউকেই পরিত্যাগ করেন না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ-সব তিনি করান। এর রহস্য-ভেদ তুইও করতে পারবি না—আমিও না। অনেক চেষ্টা করেও তো মানুষ অনেক বিষয়েই ব্যর্থ হয়—কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তো তা হওয়া উচিত ছিল না—অথচ হয়। এর প্রকৃত উত্তর কি কেউ দিতে পারবে? আবার অনেকের অনেক কিছুই তো হয়—যা সে ভাবা তো দূরের কথা—কল্পনাও করেনি কখনও। কেন এমন হয়—এর উত্তর কি তোর বা কারও জানা আছে? এর উত্তরটা পেলে তুই আমাকে যে প্রশ্ন করেছিস্—তার উত্তরটাও তুই সহজে পেয়ে যাবি।
এ-কথার কি উত্তর দেবো এই মুহূর্তে—কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। চুপ করে বসে রইলাম প্রায় মিনিট দশেক। ভাবলাম অনেক কথাই। কোনটাই যথাযথ মনে হলো না। শেষে অনেক ভেবে—ভাবলাম, এর উত্তর আমার জানা নেই। প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,
—বাড়ী কোথায় ছিল আপনার? কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু আপনি?
এবার একটা বিড়ি ধরালাম। দিতে গেলাম সাধুবাবাকে। মাথা নাড়িয়ে জানালেন—চলে না। নিজেও টানলাম না। ফেলে দিলাম। উত্তরে বললেন,
—বাড়ী ছিল এলাহাবাদে। 'শ্রীসম্প্রদায়'-এর সাধু আমি।
—গৃহত্যাগ করেছেন কত বছর বয়সে?
এ-কথায় সাধুবাবা যেন একটু বিরক্ত হলেন মনে হলো। বললেন,
—কি হবে তোর এ-সব কথা জেনে?
চুপ করে রইলাম। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইলেন সাধুবাবা মন্দাকিনীর দিকে। কেটে গেল বেশ কিছুটা সময়। তারপর নিজের থেকেই বললেন,
—প্রায় বছর ত্রিশেক হলো সংসার ছেড়েছি।
উত্তর যখন পেয়ে গেলাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন,
—বাবার বয়স কত হলো এখন?
একটু ভেবে নিয়েই বললেন,
—৬০/৬৫ হবে।
সাধুবাবার বয়সটাকে ধরেই প্রশ্ন করলাম,
—ধরে নিলাম আপনার বয়েস ষাট। এদিকে ত্রিশ বছরের সাধুজীবন আর ওদিকে

সংসার জীবন আপনার ত্রিশ বছরের—দুই জীবনের স্বাদই আস্বাদন করেছেন আপনি। এখন কি বলতে পারেন—কোন জীবনটা আপনার কাছে ভালো বলে মনে হচ্ছে ?

সাধুবাবার মুখমণ্ডলটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এ-কথায়। ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,

—এ-জীবনের কথা তোকে বলে বোঝাতে পারবো না বেটা। বড় আনন্দময় এ জীবন। কোন কষ্ট নেই—নেই কোন দুঃখ। আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ—সদানন্দ। কোন বিষয়েরই কোন চিন্তা নেই। পেলে খাই—না পেলে খাই না। থাকার রাতটুকু—কোন না কোনভাবে কেটেই যায়। আর পরার চিন্তা—তাও নেই। দরকার তো শুধু এক টুকরো কাপড়ের—তাও জুটে যায়। না জুটলেও কোন ক্ষতি নেই। তুই সংসারে আছিস্—আমিও ছিলাম। দেখছিস্ না—কত সুখে আছিস্ ?

এক নিঃশ্বাসেই শেষ করলেন কথাগুলো। বললাম,

—এ-তো বললেন বাহ্যিক বিষয়ে পাওয়ার কথা। এ-সব জানতে চাইছি না। জানতে চাই অন্তরের কথা। ওখানে পাওয়ার কোন বাসনা কি এতটুকুও নেই ?

তীর্থ যাত্রীদের আনাগোনা দেখে নিলেন একবার। দেখলেন একবার আমার মুখের দিকে। একটু ভাবলেন। তারপর বললেন বেশ গম্ভীরভাবে,

—বেটা, সংসার আছে বলেই তো বাসনা আছে সংসারীদের। আমার সংসারও নেই—বাসনাও নেই। তবে সাধুদের যে বাসনা একেবারেই নেই—তা নয়। ভগবানকে পাওয়ার বাসনা তো অন্তরে একটা আছেই। আগে ছিল না। এ-জীবনে আসার পর ওটা এসেছে।

কথাটা শেষ হতে না হতেই বললাম,

—তিনি যে আছেন, তাঁকে যে পাবেন—এমন কোন নিশ্চয়তা আছে ? বছরের পর বছর ধরে কল্পনার পিছনে ছুটছেন—এমনও তো হতে পারে !

এবার সাধুবাবার শান্ত কণ্ঠে ফুটে উঠলো দৃঢ়তার সুর। বললেন,

—বেটা, জগতের সমস্ত সন্তানই অন্ধ। পিতৃ পরিচয়—বিশ্বাসের উপরেই। অথচ দেখ্, জন্মদাতা পিতা সত্য হয়েও তার ঔরসজাত সন্তানের কাছে বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দুটো চোখ নষ্ট হলেই অন্ধ হয় না। মানুষ অন্ধ—বিশ্বাসেই। বিশ্বাসটাই অন্ধ। অন্ধত্বের নামান্তরই বিশ্বাস—যার ওপরে এই বিশ্বসংসারই প্রতিষ্ঠিত। আর এটাই যখন অনন্তকালের সত্য—তখন এ-পথ—এ-জীবনে আমার আর সংশয় রইলো কোথায় ?

নির্বিকারভাবেই উত্তর দিচ্ছেন সাধুবাবা। খুশী মনেই করে যাচ্ছি আমার প্রশ্ন। বললাম,

—বাবা, অধিকাংশ মানুষই সাধুদের বিশ্বাস করে না। দেখেছি, শ্রদ্ধারও বড় অভাব। ভণ্ড বলেই মনে করে। তাঁদের দেখলে বা আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে

কটূক্তিও করে। চলার পথে এটা আপনিও লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। আমার বিশ্বাস—আপনিও এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন কোন না কোন সময়ে। এতে আপনার মনে কোন ক্ষোভ বা ক্রোধের সঞ্চার হয়নি—হয় না?

হেসে ফেললেন সাধুবাবা। বললেন,

—বেশ সুন্দর কথা বলেছিস্ বেটা। ভণ্ড কথাটা তো শুনতে হয় হামেশাই। তবে এতে কোন ক্ষোভ হয় না মনে। ক্রোধের রেখাপাতও করে না। কেন জানিস্? এ-সব থাকলে কি সাধু হওয়া যায়? গাছ আর পৃথিবী—এদের ধর্মই তো সহ্য করা। ডাল কাটলেও নির্বিকার। প্রতিবাদ নেই। সাধু মানে গাছ হতে হবে। সাধু ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ—কখনও কু-বাক্য সহ্য করে না। যে গৃহী গাছের মতো—সাধু না হয়েও সে সাধুর মতো আনন্দময় জীবনলাভ করতে পারে—সংসারে থেকেও। এ-আমার উপলব্ধির কথা।

দু-জনেই কথা বলছি মন্দাকিনীর পাড়ে বসে—রামঘাটে। ঠিক মহাত্মা তুলসীদাসের প্রাচীন আশ্রমের কাছাকাছি। এতক্ষণ পর সাধুবাবা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি কাজ করি, বাড়ীতে কে কে আছেন ইত্যাদি। সবই বললাম। শুনলেন মন দিয়ে। বললেন না কিছুই। এইভাবেই কাটলো মিনিট খানেক। জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনি এখন সাধু। আমার ধারণা, সাধুদের একমাত্র লক্ষ্যই—আত্মমুক্তি। তাই যদি হয়, তাহলে তো বলতে পারি—সমাজে সাধু-নামক একশ্রেণীর মানুষ স্বার্থপর জীব। সংসারীদের সাহায্যেই এদের জীবনধারণ অথচ এই জীব-সকল তাদের কোন উপকারেই আসে না।

কথাটা শুনে একটা অদ্ভুতভাব ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখে। মনে হলো—এ-প্রশ্নে তিনি বেশ খুশী হলেন। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিলাম। বললাম,

—বাবা, একটু অপেক্ষা করুন, এখনই আমি আসছি।

বলেই এক দৌড়ে চলে গেলাম দোকানে। সকালবেলায় কিছুই খাইনি। বেশ খিদে পেয়েছে। গরম গরম কিছু পুরী আর তরকারী কিনে আনলাম। আলাদা করে। একটা ঠোঙা দিলাম সাধুবাবার হাতে। একটা নিলাম নিজে। আপত্তি করলেন না। আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন তিনি। খুব খুশী হলাম আমি। খাওয়া শেষ হলো। মন্দাকিনীতেই হাত ধুয়ে নিলাম। সাধুবাবাও ধুলেন। এবার আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন,

—বেটা, তোর একটা কথাও অস্বীকার করি না আমি। আত্মমুক্তির চিন্তা সাধুদের আছে—এটা যথার্থই বলেছিস্। তবে এটাও জানবি—নদী, গাছ আর প্রকৃত সাধু—এ-তিনের স্বভাব সমান—একই। কেমন জানিস্, জল সঞ্চয় করা নদীর স্বভাব নয়—জল দানই করে। গাছ নিজের জন্য কিছুই রাখে না—দান করে ফল ফুল। আর সাধুরা বলেন সৎ-কথা। দেখিয়ে দেন সত্যকে।

এই পর্যন্ত বলে একটু চুপ করে রইলেন। কোন কথা বললাম না। মিনিট কয়েক পর বললেন,

—তাই বলে তো আর সাধুরা লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সৎ-কথা বলতে পারে না। সত্যকে কোন দোকানেও পাওয়া যায় না যে—গৃহীকে ঠিকানা দিয়ে দেবে। বেটা, সাধুসঙ্গ না করলে—সংসারীদের জীবনে সাধুরা সর্বদাই মূল্যহীন।

বাধা দিলাম না কথায়। নির্লিপ্তভাবেই বলে চললেন,

—আসলে বেটা গৃহীরাই আপন করে নেয় না সাধুদের। ত্রিশটা বছর ধরে দেখেছি, ধনী দরিদ্র—প্রায় সকলেরই ধারণা, সাধুদের কাছে গেলে, কথা বললে যদি কিছু সাহায্য অথবা টাকা চায়—এই 'যদি কিছু চায়'—ভাবটাই মনের উপর কাজ করে প্রকটভাবে। আরও দেখেছি—উপযাচক হয়ে কারও কাছে গেলেও ওই একই ভাব। তাই সাধুদের সংস্রব এড়িয়ে চলে গৃহীরা। সুতরাং, সাধুরা কখনই কোন উপকারে আসবে না সংসারীদের।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—সমাজে কিছু ভণ্ড এবং লম্পট······

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সাধুবাবা বললেন,

—লাম্পট্য দোষে দুষ্ট বা ভণ্ড কিছু সাধু যে নেই—তা নয়। কিছু কিছু গৃহী যে প্রতারিত হতে পারে বা হয়—এ-কথাও অস্বীকার করি না। তবে তার মানে এই নয়—সব গৃহীই সব সাধুদের কাছে প্রতারিত হয় বা হবে। তুই হয়তো বলবি, কে ভালো আর কে মন্দ—বুঝবো কেমন করে? কোন ভালো মন্দের বিচারে যাচ্ছি না আমি। প্রতারক, প্রতারণার প্রশ্নেও আসছি না। একটাই কথা বলি, গৃহীদের 'কিছু দেবার ভয়'—'যদি কিছু চায়'—এই ভাবটা পরিত্যাগ করলেই দেখবি—সাধুসঙ্গ সহজ হবে। সাধুরা গৃহত্যাগী হয়েও অশেষ কল্যাণে আসবে গৃহীদের—সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে—যে কোন ভাবেই।

চুপ করেই রইলাম। সাধুবাবা থামলেন না,

—বেটা, গৃহীদের আরও একটা ধারণা হলো, সাধুদের কাছে গেলে 'তুকতাক্' করে—যদি কোন ক্ষতি করে—এমন একটা ভয়েও তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে। সংসার ছেলে মেয়ে বউ থাকলে না হয় কারও ক্ষতি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন হতো সাধুদের। তা তো নেই—কি উদ্দেশ্যে গৃহীদের ক্ষতি করবে? প্রকৃত সাধুরা কখনও ক্ষতি করে না কারও। গাছ কখনও নিজে ফল খায় না। সাধুর শরীরও জানবি ঠিক তেমনই। নিজের জন্য নয়—সাধুর শরীর, সাধুজীবন পরের উপকারের জন্য—আত্মমুক্তির চিন্তা থাকলেও। তবে যুগের পরিবর্তন হয়েছে—আরও হবে। তাই আমার এ-সব কথায় বিশ্বাস হবে না কারও—আস্থাও স্থাপন করতে পারবে না। তবে কিছু গৃহী আছে, যারা সাধুসঙ্গ করে—তারা আসে আত্মিক উন্নতির জন্য নয়, আর্থিক পরশমণির খোঁজে।

এবার একটু রূঢ়ভাবেই বললাম,

—অনেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আছে—যারা দুর্গতদের সেবা করে। ভালো কথা। তবে ভেক ছেড়ে, গতরে খেটে উপার্জিত অর্থেও তো তা করতে পারে। তা না করে সাধুর ভেক গায়ে দিয়ে কেন ?

একটু বিরক্ত হয়েই বললেন সাধুবাবা,

—সেবা করছে—এটাই বড় কথা। নিজের উপার্জ্জিত না হয়ে গৃহীদের কাছ থেকে সাহায্য বা ভিক্ষে নিয়েই যদি গৃহীদের সেবা করে—ভেক ধারণ করেই হোক আর না করেই হোক—তাতে তোর কি যায় আসে ? ভেকটা ধারণ করে বলে তো গৃহীরা কিছু দেয়—নইলে তো তাও দিত না। আর এই সেবাটাও তো ধর্মোপাসনারই একটা অঙ্গ। সাধুদের এই উপাসনাতেও দোষ খুঁজছিস্ ? যারা প্রত্যক্ষভাবে সেবায় যুক্ত নয়—তাদের বলবি স্বার্থপর। যারা কিছু কবছে--তাদেরও সমালোচনা করবি—বেশ! নিজের কোন মুরোদ নেই—কোনটাতে শান্তিও নেই।

প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—এক সময় আপনি সংসার করেছিলেন—সাংসারিক অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট। সেই সুবাদেই প্রশ্নটা করি। সমাজে একশ্রেণীর নারী আছে যারা—পুরুষশাসিত প্রচলিত নিয়ম নীতির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চায়। নারী কি সত্যিই পুরুষের শিকলে বাঁধা আছে ?

কথাটা বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনলেন সাধুবাবা। শূন্যদৃষ্টিতে একবার এদিক ওদিক তাকালেন। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন,

—বেটা, প্রকৃতি এই বিশ্বসংসার এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, পুরুষের সাহচর্য্য ছাড়া কোন নারীর একটা পা-ও চলার উপায় নেই। কারণ স্বয়ং প্রকৃতিই (বিশ্ব-জননী) যে পুরুষে আবদ্ধ। প্রকৃতি তো নিজেই পুরুষমুক্ত নয়। যেখানে প্রকৃতি নিজেই মুক্ত নয়—সেখানে নারী মুক্ত হবে কি করে ? তাই প্রকৃতির নিয়মেই নারী নিজেই শৃঙ্খলিত। এরা পুরুষের কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। মহর্ষি মনু বলেছেন, শিশুকাল থেকে কুমারীকাল পর্যন্ত প্রকৃতির নিয়মেই নারীজাতি রক্ষিত হয় পিতার মাধ্যমে। যৌবনে রক্ষা করে তার স্বামী। আর বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করে পুত্র। প্রকৃতির নিয়মেই এটা হয়ে আসছে শত শত বছর ধরে। এই নিয়মটাকে মেয়েরা মনে করে পুরুষের শৃঙ্খল। প্রকৃতির এটাই গতি-প্রবাহ। একে কখনও রোধ করা যায়নি—অপ্রতিরোধ্য। সুতরাং পুরুষের শিকলে বাঁধা নারী মুক্তি চায়—চায় স্বাধীনতা—ওসব কথার কথা—কোন কথা নয়।

এখানেই থামলেন না সাধুবাবা,

—ধর্, কোন মেয়ে চাকুরী করলো কিংবা বড় ব্যবসা ফেঁদে বসলো। প্রচুর উপার্জনও করলো। যা খুশী তাই কিনলো। যেখানে খুশী—যখন খুশী কোথাও গেল। তার স্বাধীন ইচ্ছায় ধর কেউ বাধাও দিল না। তাতেই কি নারী মুক্ত বা স্বাধীন হলো ? এতে খুব বেশী হলো মানে

স্বাবলম্বী হলো। বিনা প্রতিরোধে ইচ্ছার নিবৃত্তি হলো। কিন্তু মুক্ত হলো কোথায়? মৃত্যু পর্যন্ত যে কোন পুরুষই প্রাকৃতিক নিয়মে একা পথ চলতে—একা জীবন-যাপনও করতে পারে। সবক্ষেত্রে না হলেও একটা নারী পুরুষের পাশাপাশি প্রায় সমানতালেই পা ফেলে চলতে পারে। কিন্তু স্ত্রী-জাতীর পক্ষে প্রকৃতির নিয়মেই তা সম্ভব নয়। ওদের দেহের গঠনই এমন যে—ওদের দেহটাই ওদের কাছে একটা শৃঙ্খল। পুরুষ নতুন করে আর বাঁধবে কি দিয়ে? নারীর পূর্ণতা আসে পুরুষের জন্য। নারীর পূর্ণ প্রকাশই হয় পুরুষের মাধ্যমে। তাই নারীর মুক্তি নেই—মুক্তও নয়।

তবে একটা কথা মানতেই হবে বেটা, প্রকৃতি এমন কিছু গুণাবলী দিয়ে নারী সৃষ্টি করেছেন—যে গুণের প্রভাবে অপদার্থ পুরুষ—উচ্ছৃঙ্খল বিপথগামী পুরুষও পারে সুন্দর সুস্থ হতে। এমনটা নারীজাতির ক্ষেত্রে হয় না। সংসারে নারী উচ্ছৃঙ্খল হলে কোন পুরুষ সাহচর্যই তাকে সুস্থ-জীবন দিতে পারে না। ওরা পুরুষের কাছে থেকে পুরুষের পোষ মানতেই ভালোবাসে। তবে অবহেলিত হতে ভালোবাসে না। যেখানে স্ত্রীজাতি অবহেলিত—সেখানেই প্রকৃতি তার পক্ষে। তার নিয়মেই অবহেলায় বাধ সেধে পুরুষকে আচ্ছা করে শায়েস্তা করবেই। এই নিয়মেই চলবে। নারীদের শৃঙ্খলের কথা, মুক্তির কথা—আর কিছুই নয়—সাংসারিক কোন কষ্ট, ক্ষোভ, দুঃখ বা বেদনা থেকে উদ্ভূত একটি পর্যায়ে নারীর এক বিশেষ সংলাপ—বুঝলি। এমন অবস্থা সংসারে অনেক পুরুষেরও—তবে তারা শৃঙ্খলিত বা পুরুষমুক্তি চাই বলে না।

কে কোন্ জাত এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কতদূর—এই দুটো প্রশ্নই অত্যন্ত অবমাননাকর। কাউকে এ-প্রশ্ন করলে তাকে অপমানই করা হয়। এ-কথা জেনেও জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনি পড়াশুনো করেছেন কতদূর?

হাসলেন সাধুবাবা। দারুণ হাসলেন কথাটা শুনে। হাসি দেখে ভাবলাম, সাধুদের মুখে এতো হাসি আসে কোথা থেকে! বলেই ফেললাম,

—এতো হাসেন কেমন করে?

হাসির রেশটা তখনও থামেনি। হাসতে হাসতেই বললেন,

—সাধুদের কিছু নেই বলেই তো হাসিটা আছে। সংসারীদের কিছু আছে বলেই তো হাসিটা নেই। সাধু আর গৃহীর তফাৎটা তো এখানেই। নিঃস্বের হাসিই তো সম্বল।

একটু থেমেই আবার বললেন,

—ইস্কুলের মুখই আমি দেখিনি কখনও। চাষীর ছেলে। ছোটবেলা থেকে চাষ-বাস নিয়েই ছিলাম। সুতরাং পড়াশুনো হয়নি আমার।

অম্লান মুখমণ্ডল সাধুবাবার। একের পর এক দিচ্ছেন প্রশ্নের উত্তর। খুশীতে মন আমার ভরে উঠেছে। চট্ করে ছেড়েও উঠতে পারছি না। অসংখ্য প্রশ্ন

কিলবিল করছে মাথার মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম,
—শুনেছি, বাপ-মায়ের জীবিতকালে গৃহত্যাগ করলে নাকি তাঁদের অনুমতি নিতে হয়? অনুমতি ছাড়া সাধু-জীবনে এলে নাকি অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না?
মানসিক প্রসন্নতায় সাধুবাবার মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কথাটা শুনে 'না' সূচক হাত নাড়িয়েও মুখে বললেন,
—না না বেটা, ওটা ঘোর সংসারী বাপ-মায়ের স্বার্থসিদ্ধির কথা। গুরুজীর মুখে শুনেছি, এমন কথা কোন শাস্ত্রেই লেখা নেই। বৈরাগ্য উপস্থিত হলে কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। অনুমতি মনের একটা ভেক ব্যাপার। মানুষ কি বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে মরে? সংসারে মন মরে গেল। মৃত্যু হলো পার্থিব জীবনের। অপার্থিব জীবনে প্রবেশ করবে—এতে অনুমতির কি আছে। বিয়ের পর কি কোন ছেলে বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে স্ত্রী সঙ্গম করে? দেহ মন আত্মা—এ তিনের কল্যাণ ও তৃপ্তিতে যে কোন কর্ম বা সাধনায় কারও অনুমতির প্রয়োজন হয় না।
কথাটা বলে সাধুবাবা যেন একটা আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। এবার প্রশ্ন করলাম,
—বাবা, সত্যিই যদি কেউ গৃহত্যাগ করে, তবে তার বিবাহ এবং সাংসারিক সব ভোগ করে, পরে গৃহত্যাগ করা ভালো—না, প্রথম থেকেই কোন ভোগের মধ্যে না গিয়ে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়া ভালো? আপনার দুই জীবনের অভিজ্ঞতা কি বলে?
এ-প্রশ্নে মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। তারপর বললেন,
—দেখ্ বেটা, সাধু-সন্ন্যাসীদের চলার পথটা খুব একটা মসৃণ নয়। পতনের ভয় রয়েছে সর্বদাই। ক্রোধটাকে তত গুরুত্ব আমি দিই না। কাম আর লোভ—ভয়টা এ-দুটোর জন্যেই। সব ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী সাধু আর সংসারে সব ভোগ করে পরে সাধু—আসতে হচ্ছে তাকে সাধুজীবনেই। একজনের অনাস্বাদিত আর একজনের আস্বাদিত জীবন—গুরুত্ব এবং ভয়টা উভয়পক্ষেরই সমান সমান। তার মধ্যে বাল্যকাল থেকে ব্রহ্মচারীদের পতনের ভয়টা একটু বেশী বলেই মনে হয়। তবে যত সংযমী সাধুই হোক না কেন—কে কখন পড়বে—বলা মুশকিল। একটা ঘটনার কথা বলি শোন্। এটা আমার নিজের চোখেই দেখা।
মুখমণ্ডলটা গম্ভীর হয়ে উঠলো সাধুবাবার। চুপ করে বসে রইলেন। ভাবটা দেখে মনেই হলো—চলে গেছেন অতীতে। তারপর শুরু করলেন এইভাবে,
—সংসার ত্যাগ করে সাধুজীবন শুরু আমার চিত্রকূটেই। আজ থেকে বছর পাঁচেশেক আগের কথাই বলছি। সেই সময় আমার এক গুরুভাই-এর ছোট্ট একটা কুঠিয়া ছিল এখানে। বয়স তখন তাঁর বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। খুব ভালো সাধু। সাধনজীবনে অনেক উচ্চাবস্থায় পৌঁচেছে। মাথায় বিশাল বিশাল জটা। আহার নিদ্রা বলে তখন ওর কিছুই ছিল না। প্রায়ই তাঁর সঙ্গ করতাম। বিভিন্ন শাস্ত্র আর সাধনজীবনের নানা কথা শুনতাম। বিদ্যের দৌড় আমার অক্ষর পর্যন্ত

পোঁছায়নি। তুলসীদাসজীর রামায়ণ আমি ওর মুখে শুনে শুনেই মুখস্থ করেছি। বেশ আনন্দেই দিন কাটতো ওর সঙ্গে।
এই পর্যন্ত বলে থামলেন। পরের কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন,
—গুরুভাই-এর মুখেই শুনেছি, ও বারো বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করেছিল। পূর্বাশ্রমে থাকতো প্রতাপগড়ে। আমার গুরুজী ওকে অক্ষর পরিচয় করিয়েছিলেন। আমি যখন সাধুজীবনে আসি—গুরুজীর বয়স তখন অনেক। শেষ অবস্থা। তাই অক্ষরজ্ঞান লাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি। চেষ্টাও করিনি। দীক্ষার পর কাটলো বছরখানেক। দেহরক্ষা করলেন গুরুজী। বেটা, লক্ষ্মী আর সরস্বতী—দুজনের কৃপা একসঙ্গে খুব কম লোকেরই লাভ হয়। আর আমার দিকে ওরা কেউ ফিরেও তাকায়নি। আমি চলি গুরুজীর কৃপাতেই।
সাধনজীবনে গুরুভাই-এর যখন উচ্চাবস্থা—তখনই এলো ওর পতনের সময়। এই চিত্রকূটের এক দোকানদার—বড় ভালো মানুষ। ভজনপ্রিয়। আমার গুরুভাইকে বিশ্বাস করতো অসম্ভব। আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিরও তুলনা ছিল না। প্রকৃতই সাধু ছিল আমার গুরুভাই।
সাধুসেবায় কিছু দান করলে পুণ্য হবে—অন্তরে এই বিশ্বাস ছিল দোকানদারের। অনুমতি নিয়েই কিছু মিষ্টি আর দুধ পাঠিয়ে দিত প্রতিদিন। পাঠাতো তার মেয়েটিকে দিয়ে। বয়স তখন তার বছর ষোল সতেরো। মেয়েটির আসা যাওয়াটাই হলো কাল। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক গুরুভাই। এত বছরের সংযমী জীবনের বাঁধ ভাঙতে শুরু করলো এবার। ভিতরে ভিতরে বাড়তে থাকে দুর্বলতা। ক্রমেই আসক্ত হয়ে পড়লো মেয়েটির দেহের প্রতি—তীব্রভাবে। বেটা, কামের ছোবল এড়াতে পারলো না গুরুভাই।
সাধুবাবা থামলেন। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কৌতুহল সামলাতে না পেরে বললাম,
—তারপর—তারপর কি হলো বাবা ?
একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,
—তারপর আর কি! যা হবার তাই-ই হলো। মেয়েটির সঙ্গে গুরুভাই দিনের পর দিন দৈহিক মিলনে লিপ্ত হতে থাকলো গোপনে। কামের ছোবল আর প্রকৃতির চাবুক—এ-থেকেই মেয়েটির গর্ভে এলো একটি সন্তান। কালের নিয়মেই তা একদিন গেল জানাজানি হয়ে। অগত্যা বিয়ে করতে বাধ্য হলো গুরুভাই। স্থানীয় লোকেরাই জোর করে বিয়ে দিল মেয়েটির সঙ্গে। এখন স্ত্রী সন্তান নিয়েই ও সংসার করছে।
বিস্মিত হয়ে গেলাম সাধুবাবার কথা শুনে। কামের অদ্ভুত মার। কঠোরতপা সাধুকেও ছাড়ে না। এমন ঘটনার কথা গৃহজীবনে শোনা যায় আকছার। বিজ্ঞানের দয়ায় অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় প্রতিদিন—অসংখ্য। শতকরা একটার খবরও

পাওয়া যায় না। সাধুজীবনেও ঘটে। ভাবতে লাগলাম অনেক কথা। কুল-কিনারা কিছুই পেলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম,

—এখন আপনার সেই গুরুভাই-এর সঙ্গে কি দেখা-সাক্ষাৎ হয়?

মাথাটা মৃদু নেড়ে বললেন মলিনমুখে,

—কখনও সখনও দেখা হয়। তবে সংসারী হলেও সাধু-মনটা ওর এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। এখন বুঝতে পারছিস্, সংসারে নারীভোগ করেই সাধু হও—আর না করেই হও—কাম, বাসনা, আসক্তি সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। সংযমতাই সাধনার মূল কথা। আর ওটা যে কার, কখন—কিভাবে ভাঙবে—তা অত্যন্ত সংযমী সাধুও যেমন বলতে পারবে না—তেমনই বলতে পারবে না চুটিয়ে ভোগ করে সংসার ত্যাগ করা সাধুও। নইলে মেয়ের বয়সী মেয়ের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে! আমি তো চিনি ওকে—সত্যিই ওর মধ্যে দেখেছি সংযমী নিষ্পাপ নির্বিকারভাব।

এবার জানতে চাইলাম,

—বাবা, আপনি তো মেয়েটিকে দেখেছেন নিশ্চয়ই। কি এমন দেখে মেয়েটির আকর্ষণে পড়লো আপনার গুরুভাই? এত বছরের সংযম জীবন শেষ হয়ে গেল একেবারে!

গম্ভীরভাবে বললেন,

—এটাও বুঝলি না! প্রতিদিন মেয়েটিকে দেখতো। কথা বলতো। উঠতি বয়সের মেয়ে। যৌবন ফুটছে টগবগ করে। 'বেটা, কিসিকা উপর নজর সে নজর মিলা করকে বাত করনে সে আঁখকে দ্বারা কাম মন্‌মে ঘুস্ যাতা। কাম আঁখমে ভি হোতা হ্যায়—পুরুষোকা। স্ত্রীয়োঁকে কুচমে।' নিত্য অনাস্বাদিত ভোগ্যবস্তু চোখে দেখলে ধীরে ধীরে ভোগের বাসনা তো জাগবেই। পুরুষের কাম দেহে থাকে না—থাকে চোখে। চোখ থেকে বিতরিত হয় মনে—পরে দেহে। স্ত্রীজাতির চোখে কাম থাকে না। তা যদি থাকতো—তাহলে গোটা জগৎ সংসারটাই পতন ঘটে যেতো। 'বেটা, আঁখ মিলানা হ্যায় তো ভগবান সে মিলাও।'

এবার একেবারে হাত দিলাম সাধুবাবার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে,

—বাবা, গৃহীজীবন থেকে এলেন সাধুজীবনে। এই জীবনে আসার পর আপনার মনে কখনও নারীভোগের ইচ্ছা জাগেনি?

উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন সাধুবাবা। একটু চমকে উঠলাম হাসির শব্দে। হাসতে হাসতেই বললেন,

—বেটা, সংসারে থেকে দীর্ঘদিন কামরস আস্বাদন করেছি আমি। স্বামী বৃদ্ধ হলে কোন পত্নীরই প্রবৃত্তি হয় না—ইচ্ছাও করে না স্বামীকে আলিঙ্গন করতে। সাধুজীবনে আমার বৃদ্ধ-স্বামীর পত্নীর মতো মনের অবস্থা।

প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—এমন একটা উপদেশ দিন—যাতে সংসারীদের কল্যাণ হয়।

মিনিটখানেক ভাবলেন। পরে বললেন,

—বেটা, যত অর্থকষ্টেই থাকিস্ না কেন—ঘুষ আর সুদের অর্থ নিবিনা কখনও। এই দুটোর অর্থে পার্থিব প্রতিষ্ঠা আর আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে। তবে একেবারে নিশ্চিত জানবি, এই অর্থ যে গ্রহণ করে—সে স্ত্রী সন্তান অথবা শরীর—এর কোন না কোনটাকে নিয়ে ভুগবে। তার সন্তান—সে-ও পরবর্তীকালে ভুগবে সংসারে সন্তান, স্বামী বা স্ত্রীকে নিয়ে। এখানেই শেষ নয় বেটা, তার সন্তানও ভুগবে ওই একইভাবে। পর-পর এই তিন পুরুষ শান্তি পাবেনা কখনও—মৃত্যু পর্যন্ত। জুটলে খাবি—না জুটলে খাবি না। ভিক্ষে করবি—তবু ঘুষ আর সুদ খাবি না কখনও। একজনের পাপে—ভুগবে তিনপুরুষ। এ-কথা আমার নয়—শুনেছি গুরুজীর মুখেই। উপদেশ চাইলি—মনে পড়ে গেল। তাই বললাম তোকে।

অনেকটা সময় কেটে গেল। উঠতে হবে। প্রণাম করে শেষ প্রশ্ন করলাম এবার ঈশ্বর সম্পর্কে,

—বাবা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কি কিছু উপলব্ধি হলো—তাঁর সন্ধান কি কোথাও কিছু পেলেন ?

উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখ সাধুবাবার। উদাত্তকণ্ঠে বললেন,

—বেটা, তিলের মধ্যে তেল, ফুলের মধ্যে সুগন্ধ, চকমকির মধ্যে আগুন আর দুধের মধ্যে যেমন মাখন নিহিত আছে—তেমনই ঈশ্বর রয়েছেন তোর, আমার আর সকলের প্রাণের মাঝেই।

সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—আপনি তো বাবা কথাটা বললেন সহজ উদাহরণেই। কিন্তু আমাদের তো তা উপলব্ধিতেই আসে না। তাঁকে লাভ বা উপলব্ধি করার উপায় কি ?

মুখে হালকা হাসির প্রলেপ লাগিয়েই বললেন,

—বেটা, প্রথমেই ঈশ্বর আসেন উদাহরণে—পরে উপলব্ধিতে। আর বিরহ বেদনা ছাড়া কি তাঁকে লাভ করা যায় ?

বললাম,

—বাবা, আবার সেই উদাহরণ ?

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

—হাঁ বেটা, উদাহরণেই বলি—তিলকে নিষ্পেষণ করলে যেমন তেল পাওয়া যায়—তেমনই বিরহ-বেদনা দ্বারা প্রাণকে নিষ্পেষণ করলে তবেই পাওয়া যায় তাঁকে।

মুহূর্ত দেরী না করেই বললাম,

—আপনি কি পেয়েছেন ?

হাসিতে ভরে উঠলো সাধুবাবার মুখখানা। বললেন,

—তা তো জানিনে বেটা।

কেমন যেন একটা গোপন করার ভাব ফুটে উঠলো কথাটায়। মনেই হলো—লুকোতে চাইছেন কিছু। আমি এবার কথায় একটু চাপ দিয়েই বললাম,

—তাহলে এ-সব কথা আপনি বলছেন কি করে ?

মুখে চাপা হাসি অথচ গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন,
—বেটা এ-সব কথা বলছি উপলব্ধি থেকেই।
একটু অধৈর্য হয়েই বললাম,
—ঈশ্বর যদি উপলব্ধিতেই—তবে উপলব্ধিটা কি ?
এক ঝলক দেখে নিলেন আমার মুখটা। চোখদুটো ঘুরিয়ে দেখে নিলেন চারপাশে। এবার সোজাসুজি তাকালেন মন্দাকিনীতে—যাত্রী নিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট একটা নৌকার দিকে। তারপর আবার তাকালেন আমার মুখের দিকে। এবার শান্তকণ্ঠে বললেন সাধুবাবা,
—ওটা না আসলে বুঝবিনে !

কামদগিরি

আজ উঠলাম খুব ভোরেই। ঘোরা ছাড়া আর কাজটাই বা কি ! তাই ভাড়া করলাম একটা টাঙ্গা। চললাম কামতানাথ মন্দিরে। টাঙ্গা চললো বাঁধানো পীচের রাস্তা ধরে। কখনও উঁচু—কখনও নীচু। মালভূমির মতো। অসংখ্য বাড়ীঘর। শুধু হোটেল ধর্মশালাই নয়—স্থায়ী বাসিন্দাও আছে এখানকার পাহাড়ী এলাকায়। বছরভোরই লোকের আনাগোনা হয় এই রামতীর্থ—চিত্রকূটে।
মধ্যভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থ এই চিত্রকূট। পথের দুপাশেই রয়েছে সারি সারি সাজানো দোকান। মনিহারী দ্রব্যের দোকানই বেশী। আর আছে তীর্থযাত্রীদের জন্য ফুল আর পুজোপোচারের জিনিষ। দলে দলে চলেছে তীর্থ যাত্রী। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেলাম কামতানাথ মন্দিরের সামনে। পথ মাত্র ৫ কি. মি.।
কামদগিরি পাহাড়। তারই পাদদেশে মন্দির। চিত্রকূটের তীর্থদেবতা কামতানাথজী। দ্বারপাল এবং রক্ষকও বটে। বেনারসে যেমন কালভৈরব—এখানে কামতানাথ। প্রবাদ আছে, চিত্রকূটে এসে প্রথমে প্রার্থনা করতে হয় এই মন্দিরে—কামতানাথের কাছে। নিতে হয় অনুমতি। নইলে তীর্থ-চিত্রকূট ভ্রমণে বড্ড বিঘ্ন হয়।
বেশ বড় আকারের মন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙেই উঠতে হয়। কোন শিল্পী বা শিল্পের ছোঁয়া নেই এই মন্দিরে। একেবারেই সাদামাটা। দুটি অংশে বিভক্ত মন্দির। গর্ভমন্দিরের বাঁ-পাশে প্রথম অংশে স্থাপিত আছে মহাবীর আর কামতানাথ বিগ্রহ। তেলসিঁদুরে রাঙানো মহাবীর। লাল টকটক করছে। কামতানাথ কুচকুচে কালো পাথরের। মাথায় রূপোর মুকুট। চোখদুটি ধবধবে সাদা। অধর-ওষ্ঠ লাল। প্রবাদ আছে, পার্থিব জীবনের সমস্ত কামনা পূরণ করেন বলেই নাম হয়েছে কামতানাথ।
গর্ভগৃহের দ্বিতীয়ভাগে—রাম লক্ষ্মণ আর সীতার বিগ্রহ। সবই শ্বেতপাথরের।

অপূর্ব সুন্দর—দাঁড়ানো মূর্তি। বিচিত্র রঙের পোশাকে সজ্জিত। রূপোর মুকুট মাথায়। সামনে হাতজোড় করে বসে আছে হনুমান—পাথরেরই।
কামদগিরিতে শুধু কামতানাথের নয়—রয়েছে আরও অসংখ্য মন্দির। রাম ছাড়া কোন কথা নেই চিত্রকূটের পাহাড়ে—পথে-ঘাটে। রামময় হয়ে উঠেছে বৃক্ষ-লতাদিও। এখানকার যেকোন জায়গার—যে কোন মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত আছে রাম লক্ষ্মণ সীতার বিগ্রহ। পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরেও দেখা যায় মন্দিরগুলি—সবই প্রায় কাছাকাছি।

চিত্রকুটের উপবন—স্ফটিক শিলা

চিত্রকূট থেকে বাস যায় স্ফটিক শিলা। জীপও যায়। বাসস্ট্যান্ড আছে। সেখান থেকেই বাস ছাড়ে। অন্যান্য তীর্থে যেমন ট্যুরিষ্ট বাস আছে—ঠিক তেমন। এখানকার পার্শ্ববর্তী দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখায়। অসুবিধা হয়না কোন যাত্রীরই। টিকিট কেটে উঠে পড়লাম বাসে। চললো হৈ হৈ করে। বাসভর্ত্তি লোক। আমরা ছাড়া বাঙালী আর কেউ নেই। চিত্রকূট থেকে সাতনা যাওয়ার পথেই পড়ে স্ফটিক শিলা। মূল রাস্তার বাঁ-পাশে। পথের দু-পাশেই বন। কোথাও ঘন, কোথাও হালকা। খুব বেশী দূরে নয়। ফাঁকা রাস্তা। সময়ও লাগে না বেশী। চিত্রকূট থেকে মাত্র ৫ কি. মি.। দেখতে দেখতে এসে গেলাম। নেমে এলাম বাস থেকে। একটুখানি হাঁটা পথ। এসে দাঁড়ালাম একেবারে স্ফটিক শিলার সামনে। বিশাল মসৃণ একটি পাথর। বেশ কয়েকজন শুয়ে বসে থাকতে পারে একসঙ্গে—অনায়াসে। নামে স্ফটিক শিলা তবে স্ফটিকের শিলা নয়। এরই গা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। গতি অতি ধীর। মন্দাকিনীর ওপারে ছায়া ঘেরা মনোরম বনভূমি—আছে পাহাড়। শান্ত নির্জন পরিবেশ। প্রকৃতির রূপে কোন তুলনা হয় না—চিত্রকূটেরই উপবন এই স্ফটিক শিলায়।

বিশাল এই শিলাটির উপরে আছে দুটি পায়ের ছাপ। একটি রামচন্দ্রের অপরটি সীতার। রামচন্দ্রের ছাপটি বড়। আমাদের পায়ের যে মাপ—তার চেয়ে বেশ বড়। আর একটি ছোট—সীতার। সেটিও সাধারণ মেয়েদের তুলনায় বড়। তবে লক্ষ্যণীয়, দেখলে বোঝাই যায়, কোন শিল্পীর ছেনি হাতুড়ির স্পর্শে হয়নি এটা। ঠিক পুরীর মন্দির চত্বরে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মের মতো। প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়েছে। ওই একই পাথরে রয়েছে কাকের পায়ের ছাপ আর চোখের মতো একটি চিহ্ন। খোদাই করার মতো মনে হলেও—তা নয়। কোন এক অজ্ঞাতকাল থেকে আজও স্ফটিক শিলা ধরে রেখেছে রাম সীতার পদচিহ্ন।
এই শিলায় রাম সীতা আর কাকের পদ-চিহ্নের পিছনে রয়েছে রামায়ণের

একটি কাহিনী। কথিত আছে, চিত্রকূটে বসবাসকালে শান্ত নির্জন পরিবেশ এই স্ফটিক শিলায় মাঝে মধ্যেই আসতেন রাম লক্ষ্মণ সীতা। শিলাটির উপরে বসে কখনও বিশ্রাম—কখনও রাম সীতা একে অপরকে ফুল চন্দনাদি দ্বারা করতেন অঙ্গরাগ। কখনও বা মত্ত হতেন শৃঙ্গারাদিতে। এইভাবেই কাটতো তাঁদের বনবাসে থাকাকালীন অধিকাংশ দিনগুলি।

স্ফটিক শিলার একটি গোপন কাহিনী হনুমানকে নিজমুখে বলেছিলেন সীতা—

তখন সীতা অশোকবনে। রামের দেয়া অভিজ্ঞান দেখিয়ে হনুমান বললেন, মা, রামেরই সেবক আমি। আপনি শুধু বিশ্বাস নয়, আস্থাও স্থাপন করতে পারেন আমাব কথায়।

হনুমানের মুখে রামের সমস্ত কথা শুনলেন সীতা। তারপর বললেন অভিমানের সুরে—সত্যিই যদি রাম নিরাপদেই থাকেন, তাহলে কেন তিনি ক্রোধের আগুনে দগ্ধ করছেন না সোনার এই লঙ্কাপুরী। কি উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি আমাকে এই বন্দীদশা হতে মুক্ত করতে? বামের অস্ত্রাঘাতে রাবণ সবংশে নিহত হয়েছে—তা কি দেখতে পাবো আমি? শোন দূত, ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবো আমি—যতদিন রামের সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছাবে।

এই পর্যন্ত বলে কাঁদতে লাগলেন সীতা। করজোড়ে হনুমান বললেন, কাঁদবেন না মা, আপনি যে অশোকবনেই আছেন, আমরা কেউই তা জানি না। জানেন না প্রভু রামচন্দ্রও। আমার কাছে সংবাদ পেলেই তিনি আপনাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন এখান থেকে। আমি নিশ্চিত, আক্রমণও করবেন এই লঙ্কাপুরী। আমার প্রভু বিরহে কাতর, শোকমগ্ন হয়ে আছেন আপনার অদর্শনে। এখন মাংস ভোজনও করেন না। শুধু বনের ফল খেয়েই থাকেন তিনি। আপনার চিন্তায় এত আত্মমগ্ন থাকেন যে—কীটপতঙ্গ, সরীসৃপের দংশনও অনুভূত হয় না তাঁর দেহে।

সীতার ম্লান মুখের কোন পরিবর্তন হলো না। হনুমান বললেন, মা, আপনি সম্মত হলে এখনই আপনাকে পিঠে বহন করে নিয়ে যেতে পারি প্রভুর কাছে। এমন কি, সমগ্র লঙ্কাপুরীকেও এই মুহূর্তে এখান থেকে নিয়ে যাবার শক্তি এবং ক্ষমতা আমার আছে।

এই বলে হনুমান নিজের দেহটাকে ক্রমশ বর্ধিত করতে লাগলেন সীতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য।

ম্লান মুখেই বললেন সীতা, বৎস, রামচন্দ্র বীরশ্রেষ্ঠ এবং মর্যাদাপুরুষ। একা রাক্ষসকুলকে বধ করে জয়লাভ করার শক্তি তোমার আছে। এতে যে তাঁর যশোহানি হবে। তাছাড়া আমি চাই না—আমার রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করি।

এবার অশোকবন ত্যাগ করবেন হনুমান। প্রার্থনার সুরে বললেন সীতাকে—এখন মা আমি ফিরে যাবো প্রভুর কাছে। এমন কোন অভিজ্ঞান দিন—যা দেখলে

বা শুনলে আমার প্রভু রামচন্দ্র বিশ্বাস করতে পারেন যে—সত্যিই আপনার সন্ধান পেয়েছি আমি।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন জানকী—বৎস, আমার প্রাণপ্রিয়তম পতি রামচন্দ্র। তাঁকে তুমি এই অভিজ্ঞান জানিও—বনবাসকালে একদা আমরা গেছিলাম চিত্রকূটেরই এক উপবনে। সেখানে মন্দাকিনীতে জলক্রীড়ার পর সিক্তবসনে একটি শিলার উপর বসেছিলাম দুজনে।

এমন সময় কোথা থেকে এলো একটি কাক। সম্ভোগের বাসনায় ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে চেষ্টা করলো আমাকে। তখন লাঠি দিয়ে তাড়াতে চেষ্টা করি তাকে। কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত হয় না সে।

সেই সময় রামচন্দ্র হাসছিলেন আমার রূপ, যৌবন, দেহ থেকে খসে পড়া সিক্ত-বসন আর দেহ বল্লরী দেখে। তাতে খুব লজ্জিত হই আমি। কাকের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করলেন না তিনি। বুকে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকেন একান্তে। তখন এতে এক আবেশের সঞ্চার হয় আমার দেহে। মোহিত হয়ে যাই আমি। তখন আনন্দেই ঘুমিয়ে পড়ি তাঁর কোলে মাথা রেখে। স্বামীর বাহুডোরে আছি—তাই দেহ থেকে খসে পড়া বসনের দিকে কোন লক্ষ্যই রাখি নি।

তারপর ঘুম ভাঙলে সহসা উড়ে এলো সেই কাক। পলকে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করলো আমার অনাবৃত জলসিক্ত স্তনে। ফলে বিদির্ণ হয়ে গেল আমার স্তন। রক্তে ভেসে গেল বসন।

রাম দেখতে পেলেন সেই দুষ্ট কাকটিকে। অন্তর্যামী বুঝতে পারলেন—এই কাকটি আর কেউই নয়—রাজা দশরথের একদা মন্ত্রী এবং ইন্দ্রের ঔরসে শচীর গর্ভজাত পুত্র ছদ্মবেশী জয়ন্ত—যার গতি বায়ুর তুল্য—যিনি লঙ্কেশ্বর রাবণের স্বর্গাভিযান প্রচেষ্টাকালে যুদ্ধ করেছিলেন। পরাস্ত করেছিলেন রাক্ষস সেনাদের।

ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রাম। দেরী করলেন মুহূর্তমাত্র। একটি তৃণ তুলে নিলেন হাতে। মন্ত্রের দ্বারা করলেন ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা। তারপর জ্বলন্ত তৃণ ছুঁড়ে দিলেন কাককে লক্ষ্য করে। বায়ুর গতি কাকের। সমান গতি তৃণেরও।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—তিন লোকের কোথাও গিয়ে বেহাই পেলেন না জয়ন্ত। কেউই পারলো না তাঁকে রক্ষা করতে—আশ্রয় দিতে। পিতা দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি জানেন রামের অমিত বিক্রমের কথা। মনুষ্যরূপী রাম যে স্বয়ং নারায়ণ। তাই তিনিও আশ্রয় দিলেন না নিজপুত্রকে।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলেন নারদের কাছে। অনুতাপদগ্ধ জয়ন্ত। দেবর্ষির উপদেশে ফিরে এলেন চিত্রকূটের উপবনে। ক্ষমাভিক্ষা চাইলেন অযোধ্যা-কুলনিধি রামের কাছে। অপরাধী হলেও শরণাগতকে রক্ষা করেন ভগবান। জয়ন্তর অপরাধ ক্ষমা করলেন তিনি। কিন্তু নিক্ষিপ্ত তৃণ-রূপ শর তো তাঁর ব্যর্থ হবার নয়। তাই আমার পতি জীবন রক্ষা করলেন জয়ন্তর—তবে তৃণের

আঘাতে নষ্ট হলো তার ডান চোখটি।

এবার হনুমানের মুখের দিকে তাকিয়ে জানকী বললেন—রামকে তুমি এই ঘটনার কথা বললে তিনি বিশ্বাস করবেন—আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের কথা। কারণ আমরা দুজন ছাড়া এই ঘটনার কথা আর কেউই জানে না।

ত্রেতাযুগের কথা। রামসীতার এই কাহিনী স্ফটিক শিলা বহন করে আসছে আজও। এই শিলাটি থেকে একটু এগিয়ে গেলেই বিশ্রাম ভবন। পাশেই মাঝারী আকারের একটি মন্দির। এটি রামেরই মন্দির। সঙ্গে আছে লক্ষ্মণ ও সীতার পাথরের সুদর্শন মূর্তি। স্ফটিক শিলার কাছেই—মন্দিরের পাশে আছে আরও একটি মাঝারী আকারের শিলা—লক্ষ্মণের একটি পায়ের ছাপ আছে এটিতে।

স্ফটিক শিলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এত সুন্দর—এত মনোরম যে, মন স্থির হয়ে যায় এখানে এলে। শুধু রাম কেন—বিশ্রাম, ভ্রমণ আর অবসরবিনোদনের জন্য সকলেরই ভালো লাগবে চিত্রকূটের উপবন এই স্ফটিক শিলা।

সুন্দর ভাবে ঘুরে দেখে নিতে এখানে সময় লাগে মাত্র মিনিট পনেরো।

রামের চিত্রকূট ত্যাগ—অত্রি-অনসুয়া

চিত্রকূট থেকে সাতনা যাওয়ার পথ—এই পথেই অত্রিমুনির আশ্রম। দূরত্ব ১৫ কি. মি.। প্রথম ৫ কিলোমিটারের মাথায় স্ফটিক শিলা। পীচের একই রাস্তা ধরে আরও ১০ কি. মি. এগোলে—অত্রি আশ্রম।

ওই একই বাস—ছেড়েছে চিত্রকূট থেকে। স্ফটিক শিলা হয়ে চলেছে সাতনার দিকে। পথের দুধারেই বেশ জঙ্গল—শাল-সেগুনের। মাঝে মাঝে কখনও পড়ছে ফাঁকা ধানক্ষেত—আবার কখনও জঙ্গল।

চিত্রকূটের বাসগুলি মিনিবাসের মতো নয়। ছোট স্কুল বাসের মতো। তবে একেবারে ঝরঝরে। দেখলেই মনে হয়—বাদশা আকবর কিংবা হুমায়ুনের আমলের। ক্রনিক রুগীর মতো চেহারা। মরে না—ভোগে। কোন রকমে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। এখন যে দশা—তাতে কোন ফল হবে না চিকিৎসায়। এ-গুলো ছাড়া সাধারণ তীর্থযাত্রীদের আর কোন গতিও নেই। মরার আগে অনেক রুগী যেমন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠে—এখন বাসের গতি দেখে তাই-ই মনে হলো।

বাসের যাত্রী যারা—তাদের দেখে আমার ধারণা, পয়সাওয়ালা ঘরের কেউই নয়। একেবারেই সাধারণ—গরীব ঘরের। সবাই এসেছে তীর্থ করতে। প্রায় সকলের পোশাকই ময়লা—মলিন। কারও কারও ছেঁড়া। সঙ্গের সাথী পোটলাগুলো ঠিক সঙ্গেই আছে। গরীবের ধন—একবার গেলে সহজে হয় না। তাই ওগুলো সঙ্গে নিয়েই উঠেছে বাসে।

বাস ছাড়ার পর স্ফটিক শিলা হয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পর এলাম অত্রি আশ্রমে। বাস

এসে যেখানে দাঁড়ালো—সেখান থেকে হেঁটে যেতে হয় আরও কিছুটা। বাঁধানো রাস্তা। পথ চলতে কষ্ট হয় না। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি।

চিত্রকূটের বয়ে যাওয়া মন্দাকিনী এখানেও। বয়ে চলেছে অত্রি আশ্রম প্রাঙ্গণের পাশ দিয়েই। আমার বাঁপাশেই মন্দ-গতির মন্দাকিনী। জল এখানে খুব কম। চওড়াও বেশী নয়। হেঁটেই পার হওয়া যায়। কাচের মতো স্বচ্ছ নীল জল। শান্ত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। নদীর এ-পারে পাহাড়ী পরিবেশে আশ্রম। ওপারে ঘন সবুজ বনভূমি আর পাহাড়। এ-পাড়ের গাছগুলি বেশীর ভাগই ঝাউ। ওপাড়ের বন শাল-সেগুনের। নিবিড় ছায়া ঘেরা বনের মধ্যেই অত্রিমুনির আশ্রম। প্রাচীন ঋষিদের তপস্যা করার মতোই এখানকার পরিবেশ। ভাবি, এখন যদি এই হয়—তখন কি ছিল !

পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই প্রথমে পড়লো পরমহংস পরমানন্দজীর সমাধি মন্দির। ডান পাশে। দোতলা আশ্রম। তারই মধ্যে সমাধি মন্দির। নির্লিপ্ত সাধক ছিলেন পরমানন্দজী। অত্রির এই তপোবনেই তপস্যা করেছিলেন তিনি। শোনা যায়, এই অবলুপ্ত তীর্থ অত্রি আশ্রমকে প্রকটিত করেছেন তিনিই।

এই সমাধি-মন্দির ছেড়ে এগোলাম আরও একটু। চোখ পড়লো ছোট্ট একটা সাইন-বোর্ডের উপর—'অত্রিজী কা প্রাচীন আশ্রম'। পাহাড়ের পাদদেশে। একতলা সমান উঁচু—কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম উপরে। পরপর রয়েছে কয়েকটি ঘর। একেবারেই সাধারণ ঘরের মতো। তবে প্রতিটি ঘরই মন্দির।

প্রথম মন্দিরটিতেই অত্রি অনসূয়া—পাথরের মূর্তি। তার পাশেই আছে আরও কয়েকজন মুনির বিগ্রহ—ছোট ছোট। আরও একটি মন্দির—প্রথম মন্দিরের পাশেই। ভিতরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ—সীতাকে উপদেশ দানরতা অনসূয়া।

প্রবাদ আছে, চিত্রকূট ছেড়ে চলে যাওয়ার পথে অত্রির এই তপোবনে এসেছিলেন রামচন্দ্র। সীতাকে নানা উপদেশ দিয়েছিলেন সতী অনসূয়া।

রামায়ণের কথা। রাম ভরতের মিলনের পর ভরত ফিরে গেলেন অযোধ্যায়। তখন অনেক তপস্বীই বাস করেন চিত্রকূটে। তাঁদের মতোই দিন কাটতে থাকে রামেরও। একদিন রাম দেখলেন, তপস্বীরা সকলেই বেশ উদ্বিগ্ন—ভয়ার্ত। রামকে নির্দেশ করে সভয়ে কথা বলছেন একে অপরের সঙ্গে।

এতে মানসিক দিক থেকে পীড়িত হলেন রাম। দ্বিধাহীন চিত্তে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন তপস্বীদের কুলপতিকে—হে ঋষিবর, এমন কোন কাজ কি আমি করেছি—যা আপনাদের কাছে অপ্রীতিকর ? ভুল করেও কি কোন অন্যায় আচরণ করেছেন লক্ষ্মণ ? আপনাদের সেবায় কি কোন অবহেলা করেছেন জানকী ?

অতি বৃদ্ধ একজন তপস্বী। কাঁপতে কাঁপতে বললেন রামকে—আমাদের সেবা-কার্যে কোন ত্রুটি হয়নি জানকীর। অপরাধ তোমাদেরও কিছুমাত্র নেই। এখানে খর নামে এক রাক্ষস বাস করে। রাবণের কনিষ্ঠ সে। প্রতিদিন উৎপীড়ন করে চলেছে এই তপোবনের তপস্বীদের। আক্রোশ তোমার প্রতিও তার আছে।

তপস্বীরা যখন যজ্ঞে বসেন—খর নষ্ট করে দেয় যজ্ঞসামগ্রী—যজ্ঞকুণ্ড। অনেক দুর্বল তপস্বীদের সে হত্যাও করে। তাছাড়াও দিনের পর দিন আমাদের উপর নিক্ষেপ করে চলেছে সমস্ত অশুচি বস্তু। তাই এই চিত্রকূট ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার জন্য উদগ্রীব হয়েছেন তপস্বীরা। এখান থেকে কিছুদূরেই আছে অশ্ব-মুনির আশ্রম। প্রচুর ফলমূল পাওয়া যায়—পরিবেশও তপস্যার। আমরা চলে যাচ্ছি সেখানেই। তোমাদের যাওয়া উচিত।

এই বলে ঋষিরা চিত্রকূট ছেড়ে চলে গেলেন কুলপতির সঙ্গে। বিষণ্ণ হয়ে ওঠে রামের মন। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মায়েদের কথা। তাঁরা এসেছিলেন ভরতের সঙ্গে—অযোধ্যাবাসীও। তাঁদের শোকের স্মৃতি উতলা করে দেয় রামের মনকে। আবার অস্বস্তিতেও ভরে ওঠে মন। ভরতের শিবির তৈরী হয়েছিল এখানে। ফলে ঘোড়া আর হাতির মলে নষ্ট হয়েছে পরিবেশ। এইসব কথা ভেবে মন আরও অস্থির হয়ে ওঠে রামের।। আর থাকতে ইচ্ছা হলো না চিত্রকূটে।

সীতা আর লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম ত্যাগ করলেন চিত্রকূট। এলেন অত্রিমুনির আশ্রমে। পরম-স্নেহে আতিথ্য করলেন মুনিশ্রেষ্ঠ অত্রি। পত্নী অনসূয়াকে বললেন, সীতাকে গ্রহণ করতে।

তারপর নিজপত্নী অনসূয়া সম্বন্ধে বললেন রামকে—বৎস, একদা টানা দশবছর অনাবৃষ্টি হয় এখানে। ফলে একেবারে দগ্ধ হচ্ছিলো অসংখ্য মানুষ, বৃক্ষলতা। তাদের দুঃখে কাতর হলেন অনসূয়া। শুরু করে দিলেন উগ্রতপস্যা। তপো-প্রভাবে নেমে এলো বর্ষা। সজীব হয়ে উঠলো বৃক্ষলতাদি। ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠলো বনভূমি। প্রবাহিত করলেন জাহ্নবীকে। দীর্ঘ দশ বছরের তপস্যায় বাধা দূর হলো ঋষিদের। রাম, তুমি তোমার মায়ের মতোই জ্ঞান করো অনসূয়াকে।

অত্রি-পত্নী অনসূয়া। অতি বৃদ্ধা। বয়সের ভারে সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে বলিরেখা। সাদাচুলে মাথা ভরা। শিথিল দেহ। হাওয়ায় কলাপাতা যেমন কাঁপে থর থর করে—তেমনি কাঁপছে বৃদ্ধা তাপসীর দেহ।

সীতা প্রণাম করলেন অনসূয়াকে। খুশী হলেন বৃদ্ধা। প্রসন্ন মনে বললেন, প্রকৃতই তোমার ধর্মজ্ঞান হয়েছে জানকী। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে রামের সঙ্গে বনে এসেছো তুমি। স্বামী রাজাই হোক, নগরবাসী কিংবা বনবাসী—মনের মতো অথবা নয়—যাই হোক না কেন, যে স্ত্রী তাঁকে একান্তই প্রিয় জ্ঞান করে—সে মোক্ষ-লাভ করে।

উত্তরে সীতা বললেন—আর্যা, নারীর গুরু যে তার স্বামী—তা আমার জানা আছে। স্বামী যদি আমার নির্ধন, দুঃশীলও হতেন—তবুও তাঁর সঙ্গ ছাড়তাম না। অনুগামিনীই হতাম বিনা দ্বিধায়। স্বামী আমার গুণবান, দয়ালু, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা এবং পিতৃ-মাতৃপ্রিয়। আমার প্রতি অনুরাগও অবিচল। সুতরাং

তাঁর সম্বন্ধে আর কথা কি! গর্ভধারিণী কৌশল্যার মতোই জ্ঞান করেন তিনি দশরথের আর সকল পত্নীকেই। মাতৃভাবে দেখেন সকল নারীকেই। বনবাসে আসার সময় শ্বশুর, বিবাহকালীন, আমার মা অগ্নিদেবের সামনে দাঁড়িয়ে যে উপদেশ দিয়েছিলেন—তা সবই গাঁথা আছে আমার হৃদয়ে।

সীতার কথাগুলি শুনে মোহিত হয়ে গেলেন অনসূয়া। আনন্দিত হয়ে বললেন, জানকী, অত্যন্ত কঠিন নিয়ম পালন করে বহু তপঃসঞ্চয় করেছি আমি। সেই তপোবলে তোমাকে বর দিতে চাই। তোমার প্রিয় এমন কোন কাজ যদি থাকে—বলো, তা করবো আমি।

সীতা বললেন—তা তো করেছেন আপনি। মায়ের মতো আন্তরীকভাবেই তো গ্রহণ করেছেন আমাকে—আমাদের।

এ-কথায় আরও প্রীত হলেন অনসূয়া। প্রসন্ন হয়ে সীতাকে দিলেন দিব্য বরমাল্য, বস্ত্র, আভরণ, অঙ্গরাগ আর মহার্ঘ গন্ধানুলেপন। তারপর বললেন, এ-সমস্ত অঙ্গে ধারণ করে তোমার স্বামীর আরও সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি করো—যেমন লক্ষ্মী করেন বিষ্ণুকে। এইসব দ্রব্যগুলি তোমারই যোগ্য। তপো-প্রভাবে প্রভাবিত এগুলি নিত্যব্যবহার ও উপভোগে ম্লান হবেনা কখনও।

কৃতজ্ঞচিত্তে সীতা এই সকল দান গ্রহণ করলেন অনসূয়ার। তারপর তাঁরই অনুরোধে বর্ণনা করলেন নিজের জন্ম এবং স্বয়ংবরের ইতিহাস।

অতিথি রাম রাত্রিযাপন করলেন চিত্রকূটের এই অত্রি আশ্রমে। সকাল হলো। প্রস্তুত হলেন—যাবেন অন্যবনে। আশ্রমস্থ আর সব তপস্বীরা আশীর্বাদ করলেন রাম লক্ষ্মণ সীতাকে। তারপর যাত্রা করলেন তিনজনেই। ধীরে ধীরে চলে গেলেন নিবিড় অরণ্যপ্রদেশে।

সীতাকে উপদেশদানরত অনসূয়া মন্দিরটি ছেড়ে আরও একটু উপরে টিলার মতো—পাহাড়ের গায়েই ছোট্ট গুহা-মন্দির। গুহা-মুখের সামনে হলেও—একটু পাশেই বিশাল পাথরের চাঁই একটা। একটু পাশ কাটিয়ে গেলেই গুহা-মুখে দাঁড়ানো যায়। এটি বড় তবে গভীর নয়। জনাকয়েক লোক বসতে পারে। ছোট্ট পাহাড়ী গুহা। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরের বালক-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এই গুহায়—সঙ্গে অনসূয়াও। মূর্তিগুলি সব আকারে ছোট—সুদর্শন। এগুলিতে প্রাচীনত্বের কোন ছাপ নেই। তবে গুহাটি দেখলেই বোঝা যায়. বহুকালের প্রাচীন—মানুষের তৈরী নয়।

অত্রি আশ্রমের এই মন্দির গুহাটির পিছনে রয়েছে একটি পৌরাণিক কাহিনী। দক্ষপ্রজাপতি ও প্রসূতির কন্যা অনসূয়া। একদা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ইচ্ছা হলো অত্রির আশ্রমে যাবেন—করবেন মুনিপত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা। ব্রাহ্মণ অতিথির বেশ ধারণ করলেন তিনজনে। উপস্থিত হলেন অত্রির কুটিরে।

এমন সময় এলেন—যখন অত্রি কুটিরে নেই। বেরিয়েছেন যজ্ঞের কাঠ আর ফলমূল.

সংগ্রহে। কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন অনসূয়া। বসতে অনুরোধ করলেন অতিথিদের। তারপর অতিথি সৎকারের উদ্‌যোগ করতেই ব্রাহ্মণ বেশধারী তিন দেবতা বললেন, আতিথ্য গ্রহণ করতে তাঁরা রাজী—যদি পুত্ররূপে তাঁদের সেবার ব্যবস্থা করেন। নইলে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না তাঁরা।

অর্থাৎ তিনজনের স্তনপানের ইচ্ছার কথা—বুঝতে এতটুকু দেরী হলো না অনসূয়ার। প্রমাদ গুণলেন তিনি। একে অতিথি, তার উপর ব্রাহ্মণ—আতিথ্য গ্রহণ না করে ফিরে যাবে—এতে যে অকল্যাণ হবে মুনি পরিবারের। সাধনজীবনের পরিপন্থীও বটে। আবার অতিথি চায় তাপসী মুনিপত্নীর স্তনপান করতে—আসছে সতীত্বের প্রশ্ন। অস্থির হয়ে উঠলেন অনসূয়া। মুহূর্তমাত্র।

তারপর রাজী হলেন দক্ষপ্রজাপতি কন্যা। কুটির থেকে নিয়ে এলেন স্বামী অত্রির পাদোদক। ভাবার অবকাশ দিলেন না অতিথিদের। ছিটিয়ে দিলেন গায়ে। বললেন—'বালো ভব'।

তৎক্ষণাৎ অতিথি তিনদেবতা রূপান্তরিত হলেন ছোট্ট তিনটি শিশুতে। কোলে তুলে নিলেন অনসূয়া। যেমন ছোট্ট শিশুকে কোলে তুলে নেয় মা। কুটিরের পাশেই ছোট্ট গুহা। তিনটি শিশুকে বসালেন গুহায়। বাৎসল্যহেতু দুধের ধারা প্রবাহিত হলো অনসূয়ার স্তনে। সন্তানরূপে আকণ্ঠ দুধপান করে পরম তৃপ্তিলাভ করলেন তিন দেবতা। সতীত্ব রক্ষা পেল সতী অনসূয়ার।

অত্রিপত্নীর এই অপূর্ব মহিমা দেখে মুগ্ধ হলেন অতিথিরা। স্বরূপ প্রকাশ করে চাইলেন বর দিতে। আনন্দিত হলেন তপস্বিনী। পুত্ররূপে কামনা করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে। প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন তাঁরা। পূর্ণও হয়েছিল সতীর ইচ্ছা। ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় এবং মহেশ্বরের অংশে দুর্বাসা—এই তিন পুত্র লাভ হয়েছিল অত্রি-অনসূয়ার—চিত্রকূটের এই অত্রি আশ্রমে।

গুহামন্দির থেকে একটু এগোলেই আরও একটি মন্দির। অনসূয়া, লক্ষ্মী আর পার্বতীর বিগ্রহ আছে মন্দিরে। এর পাশের মন্দিরে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিন দেবতার মূর্তি—তাঁরা খেতে চাইছেন অনসূয়ার কাছে। মন্দিরগুলি সব এক জায়গায়—পাশাপাশি।

অত্রি আশ্রমের সামনেই মন্দাকিনী, পাহাড়ী টিলার উপরে ছোট ছোট মন্দির, গুহা, সুরম্য ঘন সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়, পাখীর ডাক, বনের হরিণ, ময়ূরের বিচরণ, ছায়াঘেরা আশ্রমের পথ, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ—সব মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে এক স্বর্গীয় পরিবেশ—তপোবন। প্রাচীন ঋষিদের তপোবন কাকে বলে—চিত্রকূটের এই অত্রি আশ্রম না দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। জুড়িয়ে যায় চোখ—স্বর্গীয় আনন্দে ভরে ওঠে মন। দুঃখ হয়, আরও আগে কেন আসিনি এখানে। দুঃখ হয় তাদের জন্য—যারা এখানে আসেনি—আসার কথা ভাবে না একবারও।

এলাহাবাদ থেকে আসার পথে—মনে পড়ে যায় সেই বৃদ্ধের কথা। 'বেটা, তোর কত ভাগ্য, এত অল্প বয়সে তোর রামের দর্শন হবে।' সত্যিই আমার ভাগ্য! প্রকৃতির আপন খেয়ালে সৃষ্ট এমন তপোবন—আগে দেখিনি কখনও। প্রকৃতির প্রস্ফুটিত রূপেই রাম—ভগবান। এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হলো এখানে এসে। বৃদ্ধের কথাই সত্য হলো—রামসম দর্শন হলো অত্রির তপোবন। প্রকৃতই কারও রামের দর্শন হলে মনের অবস্থাটা কেমন হয়—তা জানা নেই আমার। তবে এক অপূর্ব আনন্দে ভেসে গেল আমার দেহ-মন—এই তপোবন দর্শনে।

ভাবছি, হিমালয় ভ্রমণকালীন কেদারনাথের এক বৃদ্ধ সাধুর কথা। জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

—এতোগুলো বছর তো কেটে গেল আপনার সাধনভজন আর তীর্থদর্শনে। যাঁর উদ্দেশ্যে এই জীবন আপনার—তাঁর দর্শন কি পেয়েছেন?

উত্তরে বলেছিলেন সাধুবাবা,

—'নেহি বেটা, মুঝে ইতনা সৌভাগ্ প্রাপ্ত নেহি হুয়া। অগর উন্‌কা দর্শন কর লেতা তো মেরি ইয়ে হালত হোতি? তুমহারি তরহ অগর ম্যায় উন্‌হে আপনে সামনে মিল যাতা তো ক্যা ম্যায় উন্‌হে কভি ছোড়তা? ম্যায় তো ব্যস বেটা, ইস্ হিমালয় মে মূর্তিয়ো কা দর্শন করনে আতা হুঁ। ব্যস, ইতনা হি কহ সক্‌তা হুঁ কি, ইয়ে হিমালয় মনুষ্য কো আপনি ওর খিচ্‌তা হ্যায়। একবার আও তো বার বার আনে কা মন্ হোতা। মুঝে তো বেটা ইসি মে ভগবান হ্যায়—এ্যায়সা বিসওয়াস হ্যায়।'

এখানে সাধারণ যাত্রীদের জন্য আছে ধর্মশালা, যাত্রীনিবাস। আলাদা করে দোকান-পাটের কথা না বললেও চলে। সব তীর্থেই আছে—এখানেও আছে। তবে যাত্রীরা সাধারণত রাত্রিবাস করে না এখানে। ঘুরে দেখে, ফিরে যায় চিত্রকূটে। এখানে বাসটা ছেড়ে দিলাম। এখন সকাল সাড়ে দশটা। ফিরবো অন্য বাসে—বিকেলে। আমার পাল্লায় সাধু পড়েছে যে!

সাধুসঙ্গ—ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করা উচিত

ছোট্ট নদী—মন্দাকিনী গঙ্গা। কোন উন্মাদনা নেই। গতি একেবারেই শান্ত। যেন হংস চলেছে প্রেমাভিসারে। ভরা যৌবন মন্দাকিনীর—অথচ উন্মাদনা নেই। এমন নদী আর নারী দেখা যায় না কখনও। মন্দাকিনীও তাই। যেন লক্ষ্মী মেয়ে। যৌবন আছে—উচ্ছ্বাস নেই—প্রকাশ নেই কামনারও। দু-পাড়ের গাছগুলি ঢেকে রেখেছে ছায়া দিয়ে। রোদের মধ্যে মায়ের কোলে যেন ছোট্ট শিশু। আঁচল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে মাথা। মন্দাকিনীর বুকে বয়ে চলেছে যেন কিশোরী প্রেমের স্ফটিকধারা।

এরই পাড়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ সাধুবাবা। একেবারে তন্ময় হয়ে। ঠিক অত্রিমুনির প্রাচীন আশ্রমের সামনের দিকটায়। দূর থেকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে গেলাম। এসে দাঁড়ালাম একেবারে পাশে। দেখলাম, গলা থেকে পা পর্যন্ত একটা ঢলঢলে সেমিজের মতো—পিরানই বলে। শতচ্ছিন্ন। কালো কুচকুচে। কাঁধে রয়েছে পাতলা একটা কম্বল। তাতে ফুটোর সংখ্যাও কম নয়। কয়েক জায়গায় আবার ফেঁসেও গেছে। মাথায় পাগড়ী। পাশেই সরু চোঙের মতো বালতি একটা—পিতলের। ব্যস, আর কিছু নেই। বাথরুমে কেউ আছে কিনা জানার জন্যে যেমন নকল কাশির প্রচলন—তেমনই দিলাম। আওয়াজে তন্ময়তা ভাঙলো সাধুবাবার। তাকালেন। দেখলাম, টানা নাক—উন্নত। চোখ দুটোও বেশ টানা টানা। রোদে জলে একটু মরচে ধরেছে রঙটায়। নইলে এক সময় বেশ ফরসা ছিল বলেই মনে হলো। তাকালেন সাধুবাবা। কথা বললেন না। টুকরো একটা পাথরের উপরেই বসেছিলেন। আমিও বসলাম। পাশেরই একটা পাথরে। আমার আসা এবং বসাটা লক্ষ্য করলেন। তবুও উপযাচক হয়ে একটা কথাও বললেন না। ভাবলাম—দেখি, সাধুবাবা কোন কথা বলেন কি না? কেটে গেল মিনিট দশেক। উসখুস করছি। সাধুবাবা কিন্তু ফিরেও তাকালেন না।

এবার প্রণামের জন্য হাত বাড়াতেই একটু চমকে উঠলেন। হাত দিয়ে বাধা দিতে গিয়েও থেমে গেলেন। প্রণাম করলাম। হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন সাধুবাবা। কথা শুরু করতে হলো আমাকেই,

—বাবা, তীর্থদর্শনে এসেছেন বুঝি?

ঘাড় নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বললেন। মুখে কোন কথা নয়। জিজ্ঞাসা করলাম,

—চিত্রকূট দর্শন হয়ে গেছে?

এবারও মুখ খুললেন না। ওই একই কায়দায় 'হ্যাঁ' বললেন। আমিও ছাড়ছি না। কথা সাধুবাবাকে বলতেই হবে। বললাম,

—কতদিন আছেন এখানে?

আড়চোখে তাকালেন মুখের দিকে। মুখ খুললেন এবার,

—আজ দুদিন হলো এসেছি এখানে।

পাশেই রয়েছে পিতলের সরু বালতি। ভিতরে দেখলাম—কিছুই নেই। ফাঁকা। এবার জিজ্ঞাসা করলেন আমাকেই,

—কোথা থেকে আসছিস্?

মুখে কৃত্রিম হাসির একটা ভাব রেখেই বললাম,

—থাকি কলকাতায়। এলাহাবাদ হয়ে এসেছি চিত্রকূটে। এখন ওখান থেকে এখানে। আজই আবার ফিরে যাবো চিত্রকূটে। আপনি কি আজ থাকবেন এখানে?

মাথা দুলিয়ে বললেন,

—হ্যাঁ, আজ রাতটা থাকবো। কাল রওনা দেবো।

—এখান থেকে যাবেন কোথায়?

—কোই ঠিক্ নেহি হ্যায়। গুরুজী যাঁহা লে যায়গা—ওঁহি পর যাউঙ্গা।
এবার জানতে চাইলাম,
—আপকা সম্প্রদায় ক্যা হ্যায় বাবা ?
—উদাসী। মালুম হ্যায় তেরা—ইস্ সম্প্রদায়কা নাম তু শুনা কভি ?
ঘাড় নেড়েও মুখে বললাম,
—হ্যাঁ বাবা, গুরু নানক প্রবর্তিত সম্প্রদায়ই তো উদাসী।
কথাটা শুনে খুব খুশী হলেন মনে হলো। বললেন,
—হাঁ বেটা, তুই ঠিকই বলেছিস্। ম্যায় ওঁহি সম্প্রদায়কা সাধু হুঁ।
সাধুবাবার মুখটা দেখে মনে হলো—কথা বলায় আর আপত্তি নেই। নিজের ভিতরেও এলো একটা খুশী খুশী ভাব। বললাম,
—চিত্রকূটে আসার আগে কোন্ তীর্থ করে এলেন ?
—মাইহার থেকে সারদা মায়ের দর্শন করে এসেছি এখানে।
আগের প্রশ্নেই ফিরে গেলাম আবার,
—এখান থেকে যাবেন কোথায়—চিত্রকূট ?
সাধুবাবার সেই একই উত্তর,
—আগেই তো বললাম বেটা—ঠিক নেই। গুরুজী যেখানে নিয়ে যাবেন—সেখানেই যাবো।
মুখের দিকে ভালো করে তাকালাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম—আমার কথায় সাধুবাবা বিরক্ত হচ্ছেন কিনা ? দেখলাম—না, তেমন কোন ভাব ফুটে ওঠেনি মুখে। তবুও বললাম,
—আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন না তো বাবা ?
এবার হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখে। বললেন,
—মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যদি বিরক্তই হলাম—তা-হলে এই জীবনে আসার কোন অর্থই হয় না। সাধুজীবনে বিরক্তি আসা মানেই—ভগবানের কাছ থেকে সরে আসা। তবে বেটা, ভোগে বিরক্তি না এলে সাধুর পথ চলা কঠিন।
মনে সাহসটা অনেক বেড়ে গেল। কথা বলা যাবে অনেক। এবার ধীরে ধীরে ঢুকতে হবে সাধুবাবার জীবন-প্রসঙ্গে। বললাম,
—আপনি তো বাবা এক তীর্থ থেকে চলেছেন আর এক তীর্থে। পথ চলায় পথ-খরচা তো কিছু লাগেই। কোথায় পান এই খরচা—দেয়ই বা কে ? সেধে অর্থ দেয়ার মতো লোকের যথেষ্ট অভাব আছে এখন। সাধারণ গৃহীরা তীর্থে এলে দু-চার আনা বা দু-চার টাকা দিয়ে পুণ্য কেনে। ওতে কি-ই বা হয় ?
কথাটা শুনে মাথাটা একটু নেড়ে বললেন,
—বেটা, কোন নেশা নেই আমার। মদ গাঁজা ভাঙ্—কিছুই চলে না। তাই নিত্য কোন খরচার প্রয়োজনও হয় না। আর দেহ ধারণের জন্য যেটুকু খাদ্যের প্রয়োজন —তা গুরুজীই জুটিয়ে দেন। কারও কাছে চাইতে হয় না। দেহকে রক্ষা করার

মালিক তিনি—তিনিই রক্ষা করেন। তীর্থ-ভ্রমণ আর ভ্রমণ পথে কোন খরচাই লাগে না আমার। কারণ গাড়িতে চড়ি না কখনও। তীর্থ পরিক্রমা করি আমি পায়ে হেঁটেই।

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বিস্মিত হয়ে বললাম,

—বলেন কি বাবা!

প্রসন্ন-চিত্তে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতেই বললেন,

—হ্যাঁরে বেটা, ঠিকই বলছি। গুরুজীর কাছে আশ্রয় পেলাম ১৩/১৪ বছর বয়সে। এখন বয়েস ধর্ পঁচাত্তরের কাছাকাছি। এই পর্যন্ত কোন গাড়ী ঘোড়াতেই চড়িনি আমি। দীক্ষার দিন গুরুজী নির্দেশ দিয়েছেন—'পায়ে হেঁটেই তীর্থ পরিক্রমা করবি।' তাঁর নির্দেশ অমান্য করিনি কখনও। তিনিই শক্তি জুগিয়ে চলেছেন। তাঁর বাক্য—তিনিই আমাকে দিয়ে রক্ষা করে চলেছেন। নইলে আমার সাধ্য কি? সাবা ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থদর্শন করেছি এইভাবেই—পায়ে হেঁটে। কখনও কোন কষ্ট পাইনি পথ চলায়।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। সারা জীবন পায়ে হেঁটে সমস্ত তীর্থ দর্শন—ভাবতেই পারছি না। ধন্য সাধু—ধন্য তোমার গুরুজীর দয়া। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এখানে কোন্ আশ্রমে উঠেছেন আপনি?

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

—না না বেটা, কোন আশ্রম ধর্মশালা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করি না আমি। ছাদ আছে—এমন কোথাও রাত্রিবাস করি না কখনও। একমাত্র বৃক্ষতলই আমার আশ্রয়। অন্য কোথাও নয়। মন্দিরে দেব-দর্শনের সময়টুকু ছাড়া—ছাদ আছে, এমন জায়গায় বসি না কখনও। এটাও আমাব গুরুজীরই নির্দেশ।

এমন কথা কোন সাধুর মুখে শুনিনি কখনও। কৌতূহল বেড়ে গেল। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম সাধুবাবার মুখের দিকে। এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর জীবনকথা বলবেন—ভাবতেই পারিনি। বললাম,

—বাবা, আপনার গুরুজী পায়ে হেঁটে তীর্থ ভ্রমণের কথা বলেছেন—এর পিছনে কোন কারণ আছে নিশ্চয়ই। বলবেন দয়া করে?

বললেন সাধুবাবা,

—সাধুজীবন—সাধুর দেহ ভোগবিলাস আর আরাম পাওয়ার জন্য নয়। কঠোরতার সংকল্প নিয়েই তো সাধুদের পথ চলা। পায়ে হেঁটে চলার সাধারণ কষ্ট তো একটা আছেই। তবে পথে চলতে থাকলে জপটা হয় ভালো। অকারণ কোন চিন্তাও আসে না মনে। চলতে চলতে জপ করার আদেশই দিয়েছেন গুরুজী। চলার পথে প্রকৃতির রূপ আর জপ—এ-দুটোই এক অপূর্ব ঈশ্বরীয় আনন্দের সৃষ্টি করে মনে।

কথাগুলো শুনছি আর ভাবছি—কি বিচিত্র সাধু আর সাধু-জীবন। এবার

জিজ্ঞাসা করলাম,
—আপনার কথা শুনে মনে হলো, স্থায়ী ডেরা তো কোথাও নেই-ই—ঘর তো দূরের কথা, কোন ছাদের নীচেও বসেন না আপনি। বৃক্ষতলই একমাত্র আশ্রয় আপনার। এর পিছনেও তো নিশ্চয় কোন কারণ আছে—বলবেন ?
একেবারে অবাক করে দিয়ে সাধুবাবা বললেন,
—কারণ তো বেটা নিশ্চয়ই আছে। আর একটা কথা জেনে রাখ্—কোন গাছের নীচে একরাত্রির বেশী বাস করি না কখনও। যেমন ধর্—কোন তীর্থে বাস করবো তিন রাত্রি। তবে একটা গাছের নীচে এক রাতের বেশী থাকবো না। আজ যেটার নীচে রাত কাটাবো—কাল সেটায় নয়।
অদ্ভুত কথাটা শুনে আর তর সইতে পারলাম না। বললাম,
—কেন বাবা, এর কারণ কি ? এমন কথা তো শুনিনি কখনও !
আনন্দিত মনেই বললেন সাধুবাবা,
—জগৎ সংসারটাই মায়ায় আবদ্ধ। কোন কারণে গাছটার উপর যদি একবার মায়া জন্মে যায়—যেমন তার হাওয়া, তার ছায়াতে যদি মনে মায়া, আকর্ষণ কিংবা আসক্তির সৃষ্টি হয়—বন্ধনে পড়ে যাবো। বেটা, মায়ার আকর্ষণ এত প্রবল, এত তীব্র যে—যে কোন বিষয়ে, যে কোন বস্তুতে—যে কোন মুহূর্তে মায়া মানুষের মনকে বেঁধে ফেলতে পারে। যদি তেমন বাঁধনে বাঁধা পড়ি—সেই ভয়েতেই একটা গাছের নীচে এক রাতের বেশী থাকি না।
একটু থেমে—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,
—মায়া মুক্ত হওয়া বড়—বড় কঠিন। একমাত্র উপেক্ষা ছাড়া মায়াকে কোনভাবেই কাটানো যায় না। বেটা, সব বিষয়ে উপেক্ষার জীবনকেই তো বলে সাধু জীবন। উপেক্ষা নেই—এমন জীবনই তো সংসার জীবন। কেমন জানিস্, মায়া প্রথমেই সৃষ্টি করে দেয় পরিবেশ। তার থেকে সৃষ্টি করে প্রয়োজন। তারপর তা জুগিয়ে আষ্টেপৃষ্টে মায়া বাঁধন দিতে থাকে। মায়ার ফাঁদে পা দেবো না বলেই তো চলি ওই ভাবে।
সাধুদের কাছে গেলে প্রথমে যখন কথা বলতে চায় না—তখন খুবই অস্বস্তি বোধ করি। তারপর যখন শুরু হয়ে যায় কথা বলা—তখন যে মনে কি আনন্দ হয়—তা বলে বোঝানো যায় না। মানসিক আনন্দে মন আমার ভরে উঠেছে। ভারতে লক্ষ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসীরা রয়েছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ক-জনার কথাই বা জানতে পারি ! তার মধ্যে যদি একজনার কথাও জানতে পারি—সেটাই তো আমার লাভ।
এবার জানতে চাইলাম,
—বাবা, প্রচণ্ড গরমে তো না হয় একটা গাছতলায় রইলেন। কিন্তু বর্ষার সময়—তখন তো মাথা গোঁজার-ঠাঁই একটা দরকার—তখন কি করেন আপনি ?
নির্লিপ্ত ভাবেই বললেন হাসিমুখে,
—ঠাঁই আমার ওই গাছতলাই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ঝড়-জল—সবই আমার এই

দেহের উপর দিয়েই চলে যায়। কোন কিছুকে কখনও কিছুই মনে হয়নি—হয়ও না। মনে হলে কি এই দেহটা থাকতো! বেটা, এই বিশ্বসংসারে সব কিছু—কিছুই না। আবার সব কিছুই—সব কিছু।

আবার প্রশ্ন করলাম,

—এমন জীবন যাপনে আপনার এ-দেহ কখনও অসুস্থ হয়নি—হয় না কখনও? বড় কোন রোগে পড়েননি?

সামনের একটা গাছ দেখিয়ে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, ছোট্ট একটা বীজ থেকে ধীরে ধীরে গাছটা আজ কত বড় হয়েছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে পুড়ছে। শীতের ঠাণ্ডা আর বর্ষায় ঝড় জল—সবই তো বয়ে গেছে—যাচ্ছেও ওই গাছটার উপর দিয়ে। কিন্তু দেখ্, গাছটা মরেনি এখনও—কত সজীব। ছোট থেকেই তো আজ এত বড় হয়েছে। এতদিনে তো মরে যাওয়াই উচিত ছিল—ঠিক কিনা বল্? আসলে বেটা, প্রকৃতি ছোট থেকেই সহ্য করার ক্ষমতা দেয়াতেই গাছটার বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। আমার এই দেহটাকে তুই একটা গাছ ভেবে নে। উত্তর পেয়ে যাবি।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, 'প্রকৃতি' কথাটা যখন বললেন—তখন 'প্রকৃতি' শব্দের প্রকৃত অর্থটা কি?

একমুহূর্ত ভেবে নিয়েই সাধুবাবা বললেন,

—এই বিশ্বসংসারে ঈশ্বরের বিকাশ যা—তাই-ই প্রকৃতি। আমরা যা কিছু দেখছি শুনছি বলছি করছি ভাবছি—যা কিছু হয়েছে, যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু হবে—সব, সবই ঈশ্বরের বিকাশ—প্রকৃতি।

এ-কথার পর জানতে চাইলাম,

—বাবা, পড়াশুনো করেছেন কতদূর?

হাসি মুখেই বললেন,

—গুরুজী আমাকে অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, তবে অক্ষরের সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি।

আবার প্রশ্ন করলাম,

—আপনি যে সব কথা বলছেন—এ-গুলো জানলেন কি করে—বলছেনই বা কেমন করে?

আরও হাসিতে ভরে উঠলো মুখখানা। বললেন,

—কিছুই বলছি না আমি। ভেবেও বলছি না। জানি না কিছুই। তুই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিচ্ছে আমার প্রকৃতি। এটাই প্রকৃতি। এখন তোর এই প্রশ্নের উত্তর—এটা সত্য না অসত্য, তা তুই জানিস্ না—আমিও না। সেইজন্যে তো তোকে আগেই বলেছি, সব কিছু—কিছুই না। আবার সব-কিছুই—সব

এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—ঈশ্বরের অসংখ্য সার্থক সৃষ্টির মধ্যে মানুষই অন্যতম। সেই মানুষে মানুষে এত বৈষম্য কেন ?

প্রশ্নটা শুনে খুশীতে যেন ভরে উঠলেন সাধুবাবা। পাশাপাশি দুটো গাছ দেখিয়ে বললেন,

—এটাই তো তাঁর সৃষ্টির বড় খেলা। এই দেখ্‌না, একই জল আলো বাতাস পেয়ে দুটো গাছই বড় হয়েছে। কিন্তু দেখ্‌, একটা কত মোটা আর একটা কত সরু। একটা কত সজীব আর একটা কেমন রুগ্ন। প্রকৃতি তার দেয়াতে কোন কার্পণ্যই করেনি। আসলে, দুটোর মধ্যে একটার গ্রহণ ক্ষমতা কম। ফলে আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যে পূর্ণ। ঈশ্বরের বিস্ময়কর বিকাশ প্রকৃতিতেই সৃষ্টি হয়ে রয়েছে বৈষম্য—মানুষ কি প্রকৃতির বাইরে। ওই একই কারণে মানুষে মানুষে বৈষম্য—সৃষ্টি থেকেই।

তীর্থ যাত্রীরা অনেকেই আসছেন। চলে যাচ্ছেন পাশ দিয়ে। কেউই আমাদের বিরক্ত করছেন না। আমরা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের কথা। বেলাও ক্রমশ বাড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম,

—সাধু জীবনে অনেক বছরই তো কেটে গেল আপনার। এই জীবনে আসা থেকে আজ পর্যন্ত—এমন কোন ক্ষোভ বা দুঃখ কি কিছু সৃষ্টি হয়েছে—যা আপনার মনকে কখনও—কোনভাবে পীড়িত করে ?

মুহূর্ত-মাত্র দেরী না করেই বললেন,

—না না বেটা, কোনঃ ব্যাপারে মনে আমার কোন ক্ষোভ বা দুঃখ কিছু নেই। আমি সাধু। আমার ও-সব থাকবে কেন ? কামনা থাকলেই তো ও-সব আসে। ক্ষোভ বা দুঃখের উৎপত্তি ওর থেকেই। সাধু, গৃহী—যার কামনা আছে—তার ক্ষোভ, দুঃখ আছে। জীবনে তো চাইনি কিছুই। ওটা আসবে কোথা থেকে ?

এবার জানতে চাইলাম সাধুবাবার ভবিষ্যৎ চিন্তার কথা,

—বাবা, এখন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত—কি করবেন, কেমন ভাবে চলবে—এ-সব কথা কি কিছু ভেবে দেখেছেন কখনও ?

হো হো করে হেসে উঠলেন সাধুবাবা। বললেন,

—দূর্‌ বোকা, সাধুরা কি কখনও ভাবে !

জোর দিয়েই বললাম,

—তবুও কিছু ভাবনা কি কখনও আসে না ?

মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন,

—নেহি, কুছ নেহি—কভি-ভি নেই।

এবার আরও ভিতরে যাওয়ার চেষ্টায় বললাম,

—কখনও কি কোনভাবে আপনার মনের কোন পতন ঘটেছিল সাধু জীবনে ?

এই প্রশ্নে সাধুবাবা ভাবলেন বেশ কয়েক মিনিট ধরে। তারপর বললেন,

—জীবনে তো কখনও কোন কিছু ভাবলামই না। ভাবলে তবে তো মনের পতন ঘটবে। আর এমন কোন কাজ করিনি—করিও না, যা থেকে মনের উপর কোন ক্রিয়া করে মানসিক পতন ঘটাতে পারে।

মনের আরও ভিতরের কথা জানতে বললাম,

—সাধন ভজন জপ তপের সময় ভগবানের নামই করেন। তারপর যখন কিছু না করেন—তখন কি চিন্তা—কি জাতীয় চিন্তা ভাবনা করেন? মানুষের মন বলে যখন একটা কথা আছে—তখন সে তো অহরহ কিছু না কিছু ভাবেই। আপনি কি সে মনের বাইরে?

কথাটায় চিন্তার একটা ভাব ফুটে উঠলো মুখখানায়। অ-নে-ক ভেবে বললেন,

—তোর কথাটা ঠিক। এটাই তো মনের—মনের কথা। কিন্তু কি নিয়ে ভাববো বলতো? আমি তো কিছু ভেবেই উঠতে পারছি না। অবসর সময়েও তো কোন ভাবনা আসে না মনে—কোন কিছুরই।

ভাবলাম, মন কোন্ অবস্থায় পৌঁছালে একটা মানুষ কিছুই ভাবে না মনে! সাধুবাবার মন কি তাহলে চিন্তাশূন্য অবস্থায় পৌঁচেছে? এমন অবস্থার কথা ভাবতেই পারছি না! আবার বললাম,

—এই যেমন ধরুন, আমি আসার আগের থেকেই বসেছিলেন। তখন একা একা বসে—জপ করলে আলাদা কথা—নইলে কি চিন্তা বা ভাবছিলেন আপনি?

একটু ভেবেই বললেন,

—কিছুই ভাবছিলাম না—চিন্তাও করছিলাম না কিছুই। বসেই ছিলাম।

সাধুবাবা যতই বলছেন কিছুই ভাবিনা—আমার ভাবনা বেড়েই চলে। এ কি করে সম্ভব! জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, মনের এমন অবস্থা আপনার হলো কি করে? যোগ সাধনা করেন?

উদাসী সম্প্রদায়ের সাধু বললেন উদাসীনভাবেই,

—যোগ-টোগ কিছু করি না। মনের অবস্থাটাই বা কি হয়েছে আমার—তাও বলতে পারবো না আমি। গুরুজী জপ করতে বলেছেন—জপই করি। আর কিছু নয়।

প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—আমরা সংসারে আছি। গুরু বা ইষ্টের কাছে ভক্ত বা শিষ্যের কি প্রার্থনা করা উচিত—বলতে পারেন?

এ-কথায় খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলেন সাধুবাবা। আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে—মিনিট খানেক। তারপর আনন্দিত চিত্তে বললেন,

—বড় সুন্দর কথা বলেছিস্ বেটা। এমন কথা কেউ জিজ্ঞাসা করেনি কখনও। সুন্দর—সুন্দর বেটা।

এ-টুকু বলেই আমার মাথায় দুহাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। সারাটা

দেহ আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো সাধুবাবার স্পর্শে। আমিও সাধুবাবার পা দুটো স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। এবার বললেন,

—বেটা, গুরু বা ইষ্টের কাছে একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিত—'হে গুরুজী, আমাকে তোমার করে নাও।' ব্যস, এই টুকুই। আর একটা কথাও নয়। এই প্রার্থনাতে পার্থিব এবং অপার্থিব—লাভ হয় সবকিছুই। কেন জানিস্, শিষ্যকে যদি গ্রহণ করে নেন—তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব বর্তে যায় গুরুর উপরে। তখন শিষ্যের সমস্ত কিছু আশা ও ইচ্ছা পূরণ করতে তিনি বাধ্য—করেনও। তাই ওইটুকু প্রার্থনাতেই সার্থক হয়ে যায় মনুষ্য জন্ম।

ছোট্ট কথা। অথচ অন্তর্নিহিত সত্য ব্যাপক। যেন বটের বীজ। ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। চুপ করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর বিনীত কণ্ঠেই বললাম,

—বাবা, দয়া করে তো অনেক কথাই বললেন। এমন করে এসব কথা বলবেন—এত কথা বলবেন—ভাবতেই পারিনি। এবার অনুগ্রহ করে বলবেন—কেন সংসার ছেড়ে এ-পথে এলেন ?

এতটুকু দেরী করলেন না সাধুবাবা। নির্বিকার চিত্তে বললেন,

—লোক-মুখে শুনি— তারা নাকি কি সব ভাবে—চিন্তা করে। তুই বিশ্বাস কর্ বেটা, ভাবনাটা যে কি—তা আমি নিজেই ভেবে পাই না। আর ঘর ছাড়লাম কেন—এ-পথেই বা এলাম কেন—তা-ও কিছু ভেবে পাইনা আমি। তখন বয়েস আমার সাত আট। একদিন ঘুম থেকে উঠলাম। সকালের 'নাস্তা'-টা করলাম। পড়াশুনোর কোন বালাই ছিল না। সরস্বতী আমাদের বাড়ীর মুখটুকুও দেখেনি কখনও। নাস্তা করে দু-ভাই খেলতে লাগলাম উঠোনে। হঠাৎ কি মনে হলো—ভাইকে বললাম, তুই দাঁড়া, আমি এখনই আসছি। ব্যস, সকলের অলক্ষ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ী থেকে স্টেশন—হাঁটা পথে প্রায় এক ঘণ্টা। চলে এলাম স্টেশনে। পথটা চিনতাম। ঘর ছাড়ার কিছুদিন আগে একবার বাবার সঙ্গে গেছিলাম মাসীর বাড়ী। রেলে চড়ে। সোজা পথ।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—কোন্ স্টেশনে এলেন ?

সাধুবাবা বললেন,

—জলন্ধর। কপালটা আমার এমনই ভালো, গিয়ে দেখলাম—একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনটা যাবে কোথায়—কিছুই জানি না। ভাবলামও না কিছুই। মা বাবা ভাই—কারও কোন কথাই না। উঠে পড়লাম। যথা সময়ে এসে পেঁছালাম লক্ষ্মৌ স্টেশনে। নেমে পড়লাম। আবার ট্রেন ধরলাম ওখান থেকে। এসব করছি কেমন যেন বিবশভাবে। সোজা গেলাম হরিদ্বারে। কাউকে জিজ্ঞাসা করে ট্রেনে উঠিনি। হরিদ্বারে যাবো—তাও ভাবিনি। আর ওটা যে একটা তীর্থ—তাও জানতাম না। ও-নাম শুনিনি কখনও। ওই সাত আট বছর বয়েসেই আমার

জীবনের শেষ ট্রেন চড়া। জীবনে আর কোন গাড়ীতে পা রাখিনি কখনও।
জানতে চাইলাম,

—জলন্ধর থেকে হরিদ্বার—ওতো অনেক পথ! পথে রাতও তো কাটাতে হয়েছে ট্রেনে। কি খেয়েছিলেন পথে?

নির্লিপ্ত ভাবেই সাধুবাবা বললেন,

—কিছুই খাইনি। পথে দুদিন অনাহারেই কেটেছিল। ওখানে চিনি না কিছুই—জানিও না। হরিদ্বারেও পুরো একটা দিন না খাওয়া। একেবারে নুয়ে পড়লাম খিদেতে। পয়সা নেই কাছে। খাবো কি? দেখলাম, হর কি পিয়ারী ঘাটে বসে ভিক্ষে করছে অনেকেই। যাত্রীরাও দিচ্ছে কিছু। বসে গেলাম ওদের সঙ্গে। মিললো কিছু। খেলাম। তাজা হলাম একটু। তারপর ভিক্ষে করতাম সারাদিন। ঘাটের পাশেই ঘুমাতাম রাতে। এইভাবেই হরিদ্বারে কাটলো প্রথম তিনটে দিন।

এক নিঃশ্বাসে এই পর্যন্ত বলে থামলেন। কোন কথা বললাম না। একটু বিশ্রাম নিয়ে বললেন,

চতুর্থ দিন। বসে আছি ভিক্ষে করতে। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে ফিরছেন এক সাধুবাবা। হঠাৎ নজর পড়লো আমার উপর। ভিখারীদের মধ্যে আমাকে দেখতে পেয়ে একেবারে কাছে এসেই দাঁড়ালেন। মুখের দিকে তাকিয়ে মধুরকণ্ঠে বললেন,

—বেটা, আয় আমার সঙ্গে। এখানে একটা আশ্রম আছে। সেখান থাকবি—খাবি আর কাজ করবি আশ্রমের। চল—ওঠ্ ওঠ্। এ-পথ তোর জন্যে নয়। আয় আয়—শিগগির্ আয়।

তাকিয়ে রয়েছি সাধুবাবার মুখের দিকে। কথাগুলো আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো। মানুষের জীবনে এমন হয়! কি করে হয়? ভেবে কুলকিনারা কিছুই পেলাম না। সাধুবাবা বললেন,

—তোকে কি বলবো বেটা, অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। কোন কথা বললাম না। ভাবলামও না কিছু। উঠে দাঁড়ালাম। বিবশভাবে চললাম সাধুবাবার পিছন পিছন। এলাম একেবারে গোঘাটে। ওখানে একটা প্রাচীন গুরুদ্বার আছে। রয়ে গেলাম। আশ্রমের কাজ করি। থাকি—খাই। এইভাবেই কাটতে লাগলো দিনগুলো। কেটে গেল মাস ছয়েক। ওই সাধুবাবাই ছিলেন গুরুদ্বারের প্রধান। খুশী হলেন—আশ্রমের কাজে আমার নিষ্ঠা দেখে। তারপর একদিন এলো আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত। দীক্ষা দিলেন তিনি। শুরু হলো আমার এক নতুন জীবন।

কৌতূহলী হয়ে বললাম,

—আপনার মা বাবা ভাই—কারও কথা মনে এলো না—ভাবলেন না, মন খারাপ হলো না তাদের জন্য?

কি এক ভাবে বিভোর সাধুবাবা বললেন,

—কিছুই ভাবলাম না বেটা। ওদের কোন ভাবনাই আসেনি মনে। মন খারাপ হয়নি এতটুকু। মনেই হয়নি ওদের কথা—হয়ও না। বাড়ীর কারো মুখও আমার মনে পড়ে না। সেই থেকে জীবনের সত্তরটা বছর তো কেটে গেল এইভাবেই।

কথাগুলো শুনে বিস্ময়ের অবধি রইলো না। ভাবলাম, কি ধরনের মন হলে মানুষের মনের অবস্থাটা এইরকম হয়! এ কেমন গৃহত্যাগ—যার কোন কারণ বা রহস্য খুঁজে পাওয়া যায় না! কিছুই ভেবে পেলাম না। তবুও ভাবছি—যদি কোন সূত্র পাই।

আমার মুখের ভাবটা দেখে সাধুবাবা বললেন,

—ভেবে কিছু লাভ নেই—সময় নষ্ট। না ভেবে—ভেসে চল্। তাঁর কোলে মাথা রেখে কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে দে। দেখবি, আপনিই পোঁছে যাবি—যেখানে তোর পোঁছানোর কথা।

কথাটা বলেই আমাকে প্রশ্ন করলেন হুট্ করে,

—বিয়ে-থা করেছিস্ বেটা?

হেসে ফেললাম। এমন একটা প্রশ্ন করবেন—ভাবতেই পারিনি। বললাম,

—না বাবা, ওসব করিনি কিছু। বিয়ের বয়সই তো হয়নি এখনও।

মাথাটা নাড়লেন। কিছু বললেন না। জানতে চাইলাম,

—এতো বছর ধরে কি কঠোর জীবন-যাপনটাই না করলেন আপনি! এতে লাভটা কি হলো আপনার—সমাজই বা পেল কি আপনার কাছ থেকে?

সহজভাবেই বললেন,

—শুধু সমাজ নয় বেটা, সংসারও কিছু পায় নি আমার কাছ থেকে। দেবার মতো তো কিছু নেই আমার। আর এ-জীবনে লাভ-লোকসান কি হলো—তাও হিসাব করে দেখিনি কখনও। ভাবিনিও কিছু।

অনেকটা বেলা হলো। উঠতে হবে এবার। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস বা আস্থা নেই বলে শুনি—তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলবেন? আর দীর্ঘ সাধু-জীবনের এই পথ চলায় ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার উপলব্ধ মতামতই বা কি?

দৃঢ়তার সুর অথচ শান্ত ধীর কণ্ঠেই বললেন,

—বেটা, কারও ঈশ্বরে বিশ্বাস বা আস্থা নেই—কথাটাই ঠিক নয়। প্রথমে বলি, যারা কোন একটা শক্তির উপর নির্ভর বা বিশ্বাস করে চলছে—তাদের কথা ছেড়ে দে। আর যাদের বিশ্বাস নেই বা মানিনা বলে—ভাবে, নিজের শক্তির বলেই সব কিছু করছে, হচ্ছে—আসলে তারা আরও বেশী ঈশ্বরে নির্ভর করছে। কেমন করে জানিস্? তোকে তো আগেই বলেছি,

ঈশ্বরের বিকাশ যা কিছু—তাই-ই প্রকৃতি। মানুষই তাঁর শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মানুষের ভিতর প্রকৃতিরূপ আত্মশক্তি তো ঈশ্বরেরই বিকাশ—যার ওপরে নির্ভর করেই সে পথ চলছে। তাহলে নির্ভরটা করলো না কোথায়—আস্থা বা বিশ্বাসই বা রইলো

না কোথায় ? এখানে আত্মশক্তি প্রকৃতিই ঈশ্বর—যার উপর নির্ভর করছে।
এবার একটা উদাহরণ দিয়েই বললেন,
—বেটা, দোকানে রঙীন জল বিক্রি হয় বোতলে। দাঁড়িয়ে থাকলে দেখবি, কেউ ঢক্‌ঢক্‌ করে ঢেলে দেয় মুখে—কেউ সরু নল লাগিয়ে টানে। ব্যাপারটা একই। জলের সঙ্গে সংযোগটা দুজনেরই। একজনের সরাসরি বোতলে মুখে—আর একজনের নলের উপর নির্ভর করে।
একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন সাধুবাবা। হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে বললেন,
—নির্ভরতা ছাড়া বাঁচতে পারে না কেউই। ঈশ্বর তিনিই—মানুষ যার উপরে নির্ভর করে।
এইটুকু বলেই কেমন যেন স্থির হয়ে গেলেন। আর কোন কথা সরলো না মুখ থেকে। ধীরে ধীরে চোখ থেকে নেমে এলো জলের ধারা। কেটে গেল অনেকক্ষণ। আমাকে ফিরতে হবে চিত্রকূটে। প্রণাম করলাম। ফিরেও তাকালেন না। সাধুবাবার শূন্যদৃষ্টি—বয়ে যাওয়া মন্দাকিনীর জলে। বসে রইলেন ভাবতন্ময় হয়ে—যেমন বসেছিলেন আমি যাওয়ার আগে।

ভরত কূপ

জীপ ছাড়লো চিত্রকূট থেকে। ঝাঁসি-মানিকপুর শাখায় পড়ে কারভি স্টেশন। সেখান থেকে আসা যায় চিত্রকূটে। কিন্তু অতদূর পর্যন্ত যেতে হয় না। আগেই পড়ে বড় রাস্তার মোড়। জীপ চললো তার বিপরীত পথেই। চিত্রকূট থেকে এলাম ভরত কূপ—১৬ কি. মি.।
চিত্রকূটের ভ্রমণার্থী কিংবা তীর্থযাত্রী যারা—তাদের অধিকাংশই আসেন না ভরত কূপে। চিত্রকূটের আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলো যে বাসে ঘোরানো হয়—তাদের ভ্রমণসূচীতে রাখা হয় না ভরত কূপকে। তাই আসতে হয় আলাদা ভাবে। জীপ কিংবা প্রাইভেট মোটর ভাড়া করে। এর জন্য খরচাও অনেক।
জীপ থেকে নেমে এগিয়ে চলি মন্দিরের দিকে। ডানদিকে মন্দির। চারদিকে বিশাল বিস্তৃত সবুজ মাঠ। তার মধ্যে চোখে পড়ে কিছু কিছু গাছপালা। মন্দির যেদিকে—সেদিকে বাড়ীঘরও আছে বেশ কিছু।
এলাম মন্দির চত্বরে। বিস্তৃত নাট মন্দির। গোলাকার চূড়ার মন্দিরটি মাঝারী আকারের। সামনেই লেখা রয়েছে—শ্রীরাম মন্দির, ভরত কূপ।
মন্দিরে, উঁচু বেদিতে স্থাপিত আছে সুদর্শন পাথরের বিগ্রহ—রাম-লক্ষ্মণ-সীতা। তার নীচের বেদিতেই ভরত-শত্রুঘ্ন। সবই ধবধবে সাদা পাথরের। মূল মন্দিরের পাশেই মন্দিরটি গোপালের। এখানে গোপাল ছাড়াও আছে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ।

এগুলি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি ডানদিকে। এলাম আরও একটি মন্দিরে। দেখলেই বোঝা যায় প্রাচীন। রামসেবক মহাবীরজী বসে আছেন বেদিতে।
মহাবীর মন্দির থেকে আরও একটু এগিয়ে গেলাম। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম উপরে। সামনেই পাথর বাঁধানো বিস্তৃতক্ষেত্র। চারদিকে রয়েছে কিছু ঘরবাড়ী। এখানে যারা—তারা প্রত্যেকেই স্থায়ী বাসিন্দা। এরই একপাশে রয়েছে একটি বিরাট কূপ—ভরত কূপ। পাশেই একটি অশ্বত্থগাছ। গাছটির বয়স কম নয়। এই কূপের সামনেই রামানুজ ভরতের মন্দির। কোন কারুকার্য নেই মন্দিরে—একেবারেই সাধারণ। ভরত ও স্ত্রী মাণ্ডবীর আকর্ষণীয় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এই মন্দিরে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-শত্রুঘ্নও বাদ যায়নি।
মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রম থেকে চিত্রকূটে আসার পথে পরিশ্রান্ত ভরত সদলবলে বিশ্রাম করেছিলেন এখানে। শত শত বছর ধরে এই প্রবাদই বহন করে আসছে ভরত কূপ।
দেখার মতো এখানে কিছুই নেই। যাত্রী সংখ্যাও কর গোণা। তবুও নামের টানেই আসে কিছু যাত্রী—যেমন এসেছি আমি। মিনিট পনোরোর মধ্যেই দেখা হয়ে যায় সব কিছু।

রাম সাইয়া

জীপ ছাড়লো ভরত কূপ থেকে। কিছুটা পথ আসার পর ধরলো ইটের রাস্তা। এ-পথের দুধারেই বিস্তৃত চাষের জমি। মাঝখান দিয়েই পথ। এ-পথে আরও কিছুটা এগোতেই দূর থেকে দেখতে পেলাম কামদাগিরি পাহাড়।
জীপ যেখানে এসে থামলো—সেখান থেকে হাঁটতে হবে কিছুটা। পথ বলে তেমন কিছু নেই। চাষের জমির উপর দিয়েই হাঁটতে শুরু করি। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়—তার পিছনেই রাম সাইয়া।
হাঁটতে হাঁটতে এলাম পাহাড়ের পাদদেশে। পাহাড় বলতে বিশাল কিছু নয়। একটু ঘুরে গেলাম পাহাড়ের ওপাশে। আবার সামনেই পড়লো আরও একটা প্যাহাড়। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। প্রথমেই পড়লো রাম মন্দির। রাম লক্ষ্মণ সীতার বিগ্রহ আছে ভিতরে। এই মন্দিরের পিছনেই পাহাড়ের পাদদেশ—এখানেই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি—রাম সাইয়া মন্দির।
চিত্রকূটে বাস করলেও রাম অনেক সময়েই যেতেন পার্শ্ববর্তী উপবনে। সময় কাটানোর জন্য। যেমন যেতেন স্ফটিকশিলা, গুপ্ত গোদাবরী, হনুমান ধারায়। তেমনই একটি উপবন এই রাম সাইয়া।
রাম সাইয়া মন্দিরটি দুটি অংশে বিভক্ত। হনুমান মূর্তি আছে দুটিতেই। একটি নিমগাছ আছে মন্দিরের মাঝখানে। কয়েকটি কালো পাথর রয়েছে গাছের

গোড়ায়। তার উপরে আছে সাদা হাতের ছাপ। এখানকার পুরোহিত বললেন, একদা রাম বিশ্রামরত অবস্থায় ছিলেন এখানে। কোন কারণবশতঃ চিত্রকূট থেকে আসেন ভরত শত্রুঘ্ন। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার সময় তাঁদের হাতের ছাপগুলি পড়ে পাথরে। লোকবিশ্বাস, গাছের গোড়ার এই পাথরগুলিই নাকি সেই পাথর।

এই নিমগাছটি যেখানে—তার অদূরেই আছে বেশ বড় একটি পাথর-খণ্ড। বেশ ভালোভাবেই দুজন শোয়া যায়। পাথরটি এমনভাবে রয়েছে—দেখলেই মনে হয়, কেউ যেন হেলান দিয়ে রেখেছে পাহাড়ের গায়ে। আলাদা একটি বৈশিষ্ট্যও রয়েছে পাথরটির। পাশাপাশি দুটি খাঁজ আছে এতে। দেখলেই বোঝা যায়, কেউ শুয়েছিল কখনও। আরও বোঝা যায়—খাঁজটি প্রাকৃতিক। ছেনি হাতুড়ির স্পর্শে নয়। মোটামুটি নরম মাটিতে কেউ শুয়ে উঠলে যেমন খাঁজ পড়ে ঠিক তেমন। রাম সীতা মাঝে মধ্যেই এখানে এসে শুয়ে বসে বিশ্রাম নিতেন। তাই নাম হয়েছে রাম সাইয়া। এই জনশ্রুতিই চলে আসছে—কবে থেকে জানি না—এখনও পর্যন্ত। এখানকার সাধারণ মানুষও তাই বিশ্বাস করে। অবিশ্বাসটা তাড়াতাড়ি করা যায়—বিশ্বাসটা দেরীতে। এই পাথরটির মাঝামাঝি জায়গায় আছে সরু একটি গর্ত। লোক বিশ্বাস, এই গর্তের মধ্যে ধনুক বাণ রেখে তারপর শুয়ে বিশ্রাম করতেন রাম।

বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানই বটে এই রাম সাইয়া। কোন জনকোলাহল নেই। শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ আর প্রকৃতির রূপ—দুই-ই চোখ জুড়ানো। অথচ যাত্রী সমাগম এখানে খুবই কম। প্রতিবছর মেলা বসে দশহরাতে। কিছু বেশী লোক সমাগম হয় তখনই।

চিত্রকূটের স্থানীয় বাস-ভ্রমণ সূচী থেকে বাদ দেয়া হয়েছে সুন্দর দর্শনীয় এই স্থানটি। কারণ হাঁটাহাঁটিতে সময় লেগে যায় বেশী। পথও একেবারে মন্দির পর্যন্ত নয়। সময় নষ্ট করার সময় এদের নেই। টাকা দাও—ঝটপট্ ঘোরো। দরকার কি সবকিছু দেখার। তাই চিত্রকূট থেকে জীপে এসে দেখে নিতে হয়—আলাদাভাবে। তাতে খরচা একটু বেশী পড়ে। তবে দেখাটা হয়। বার বার আসা হবে না। পয়সা যাক্—দেখাটা হোক।

হনুমান ধারা

যাত্রী বোঝাই বাস ছাড়লো চিত্রকূট থেকে। সকলেই তীর্থযাত্রী। চললো হনুমান ধারা। বাস ছাড়ার একটু পরেই পার হলাম ছোট্ট একটি পুল। মানে পার হলাম মন্দাকিনী। চললো পিচের বাঁধানো রাস্তা ধরে। তারপর কিছুটা

পথ মালভূমির মতো। উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো। এই পথই পেরিয়ে এলাম হনুমান ধারায়। চিত্রকূট থেকে ৫ কি. মি.।
হনুমান মন্দির আছে এখানে। তবে সমতলে নয়। উঠতে হয় পাহাড়ে। বয়স্ক যারা—তাদের পক্ষে ওঠা কষ্টকর। ব্যবস্থা অবশ্য আছে—ডুলি।' সাধারণ পাহাড়ী পথ নয়। উঠতে হবে সিঁড়ি ভেঙে। সময় নিয়ে ধীরে ধীরে উঠলে কোন কষ্ট নেই—অসুবিধেও হয় না।
উঠতে লাগলাম সিঁড়ি ভেঙে। এক নাগাড়ে ওঠা যায় না। অভ্যাস নেই। তাই হাঁপিয়ে উঠি। কিছুটা উঠছি—আবার বিশ্রাম নিচ্ছি। হনুমান ধারায় আর সব যাত্রী যারা—তাদের দশা আমারই মতো। হাঁপাচ্ছে—উঠছে, এইভাবেই চলছে। ক্রমাগত প্রায় সাড়ে তিনশো সিঁড়ি ভেঙে এলাম উপরে। এখান থেকে নীচে, দূরে—বহুদূরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর লাগে। জুড়িয়ে যায় চোখ দুটো। মনও ভরে যায় এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে।
এসে দাঁড়ালাম একটি তোরণের কাছে। আরও একটু এগিয়ে যেতেই ছোট্ট একটি হনুমান মন্দির। সিঁড়ির একেবারে পাশেই। প্রথম তোরণের পর এলো আরও একটি তোরণ। সেটা পেরোতেই বাঁধানো চত্বর। এর একদিকে ছোট্ট মন্দির—হনুমানের। পাহাড়ের গা ঘেঁষেই। পাহাড়ের গায়েই খোদাই করা হয়েছে হনুমানের মূর্তি। চোখ দুটো রুপোর—ঝকঝক করছে। মাথায়ও রুপোর মুকুট। এই পাহাড়ের বাঁদিকে গা বেয়ে নেমে এসেছে জলধারা—হনুমান ধারা। ঝরঝর করে নেমে আসা এই ধারার জল এসে পড়ছে একটি কুণ্ডে। ওই কুণ্ডের জলই আবার পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে নেমে গেছে নীচে।
হনুমান ধারার আরও একটি নাম—সরস্বতী গঙ্গা। প্রবাদ আছে, একদা এখানে দেখা দিল প্রচণ্ড জলাভাব। ফলে পাহাড়ের সজীব বৃক্ষলতা গেল শুকিয়ে। অপরিসীম কষ্টের সৃষ্টি হলো সমতলের মানুষের। এতে ব্যথিত হলো হনুমানের হৃদয়। আন্তরিক আর্তি নিয়ে গেলেন রামচন্দ্রের কাছে। সবিনয়ে জানালেন জলাভাবের কথা। অনুরোধ করলেন প্রভুকে। চিরস্থায়ী জলের ব্যবস্থা করলেন রামচন্দ্র। পাহাড়ের গায়ে বাণ মেরে আনলেন জলধারা—সরস্বতী গঙ্গাকে। হনুমানের প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হলো ধারা—তাই নাম হয়েছে এর হনুমান ধারা।
এই পাহাড়ের আর একদিকে—অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে একটু নামলেই আরও একটি মন্দির। এটি পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির। পাহাড়ের গায়েই খোদিত মূর্তি। পাঁচটি মুখ আছে হনুমানের। এমন মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। এখানেও হনুমান ধারার মতো নেমে এসেছে আরও একটি ধারা। জল এসে পড়ছে মন্দিরের সামনেই—বাঁধানো একটি কুণ্ডে। এই মন্দির এবং ধারা-সংলগ্ন স্থানটি বেশ সমতল।
চিত্রকূটের আরও একটি সুন্দর দর্শনীয় স্থান—প্রমোদ বন। দুটি মন্দির আছে

এখানে। দুটিই রামানুজ সম্প্রদায়ের। একটিতে স্থাপিত আছে লক্ষ্মী নারায়ণের প্রাচীন বিগ্রহ। অপরটিতে দেবী অন্নপূর্ণা। মন্দির দুটির বয়স প্রায় সাড়ে তিনশো বছর।

এখানেও আছে একটি হনুমান মন্দির। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হনুমান মূর্তিটিও বহুকালের প্রাচীন। তার পাশেই দুটি সুন্দর বিগ্রহ—রাম সীতা।

জানকী কুণ্ড আর রঘুবীর মন্দিরটিও সুন্দর—সুন্দর এর পরিবেশও। রঘুবীর মন্দিরেও ওই একই অবস্থা। রাম সীতাকে ছেড়ে—হনুমান রামকে ছেড়ে নেই কোথাও। তবে সমগ্র চিত্রকূটে একটিই ব্যাতিক্রমী মন্দির—এই রঘুনাথ মন্দির, যেখানে লক্ষ্মণের দেখা পাওয়া যায় না। প্রমোদ বনে, প্রমোদ ভ্রমণে স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকুক—রামের ভক্তরা হয়তো চাননি এটা। সেইজন্যেই হয়তো লক্ষ্মণ নেই! আর হনুমান, বন্যপ্রাণী বিশেষ—বুঝবে না কিছুই—তাই হয়তো রয়ে গেছে রামের সঙ্গে।

গুপ্ত গোদাবরী

চিত্রকূট থেকে গুপ্ত গোদাবরী। পথ ওই একই। বাস চললো সাতনা রোড ধরেই। এবার ঢুকলো ডানদিকে। পথ এক—পথের বিবরণও এক। এ-পথে আলাদা বৈচিত্র্য কিছু নেই। গুপ্ত গোদাবরীর কিছু আগের থেকেই কাঁচা পথ—ভাঙাচোরা। এমন রাস্তা বেশ কিছুটা। তারপর আবার ভালো। এখন হয়তো পরিবর্তন হয়েছে। বাস এসে দাঁড়ালো গুপ্ত গোদাবরী পাহাড় থেকে একটু আগে। পাক্কা ১৯ কি. মি.।

এখানে আসার পথে প্রথম দিকটায় কোন লোকবসতি নেই। এই তীর্থের কিছু আগের থেকেই শুরু হয়েছে গ্রাম—জন বসতি।

নেমে এলাম বাস থেকে। হাঁটতে হবে একটু। পথের দুধারেই সারি-সারি দোকানপাট। তেলেভাজা, কাচের চুড়ি আর মনিহারী দ্রব্যের। সব তীর্থের যে দশা—এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই।

টুকটুক করে হেঁটে এলাম বেশ বড় একটি পাহাড়ী টিলার কাছে। সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম কিছুটা উপরে। প্রথমেই পেলাম দুটো জলের কুণ্ড। উপরে একটা—তার নীচেই আর একটা। পাহাড়ের গা বেয়ে আসছে জল। প্রথমেই পড়ছে উপরের প্রথম কুণ্ডে—তার উপচে পড়া জল পড়ছে নীচের কুণ্ডে। যাত্রীদের অনেকেই স্নান করছে এখানে। আরও উঠে এলাম উপরে। দাঁড়ালাম পাহাড়ের গায়েই লাগোয়া একটা ছোট্ট মন্দিরের সামনে। দেখলেই বেশ বোঝা যায়—বহুকালের প্রাচীন এ-মন্দির। ভিতরে গোপাল মূর্তি—সঙ্গে আছে কয়েকটি নারায়ণ শিলা।

আরও একটু উঠে এসে দাঁড়ালাম একটি গুহামুখে। মুখটি বেশ বড়। কথিত আছে, চিত্রকূট থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে ভরত এসেছিলেন এই গুপ্ত গোদাবরী তীর্থে। ঢুকলাম অন্ধকার গুহায়। লোক আছে ভিতরে—টর্চ নিয়ে। গুহার মধ্যে আধাআধি ভাগ আছে দুটো। প্রথমভাগে আলো জ্বালাতেই দেখা গেল অসংখ্য চামচিকি। ঝুলছে গুহার সিলিং-এ। ভ্যাপসা গন্ধে ভরা ভিতরটা। গুহার দেয়াল ঘেষে একটা জলের কুণ্ড। কোথা থেকে জল আসছে, বোঝা গেল না। জল ভরা কুণ্ড অথচ উপচে পড়ছে না। প্রবাদ আছে, সীতা স্নান করেছেন এই কুণ্ডে। তাই নাম হয়েছে এর সীতাকুণ্ড।

গুপ্ত গোদাবরীর এই গুহা প্রকৃতির দান। এমন গুহা সচরাচর দেখা যায় না কোথাও। একটা অদ্ভুত দেখার জিনিষ আছে এর মধ্যে। একটা পাথর ঝুলছে উপরে। হাত দিয়ে নাড়ালে নড়ে। এমনভাবে আটকে আছে—পড়ার ভয় নেই। অথচ ওইভাবে থাকার কথা নয়—পড়ে যাওয়ার কথা। পড়ে যাওয়াই উচিত ছিল। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। লিখেও ঠিকভাবে বোঝানো যায় না। ঝুলন্ত এই পাথরটির নাম—পিশাচ মোচন শিলা।

প্রবাদ আছে—রাম যখন চিত্রকূটে বাস করতেন, তখন ময়ঙ্ক নামে এক রাক্ষস বাস করতো এই গুহায়। রাম লক্ষ্মণ সীতা মাঝে মধ্যেই বেড়াতে আসতেন এখানে। বিশ্রাম করতেন একান্তে—নির্জনে। কখনও সখনও সীতাও স্নান করতেন গুহার ভিতরে—সীতাকুণ্ডে।

একদিন সীতা স্নান করছেন গুহায়। খুলে রাখা কাপড় চুরি করলো ময়ঙ্ক। স্নান সেরে উঠে সীতা দেখলেন তাঁর কাপড় নেই। তখন বাইরে অপেক্ষারত রামকে ডাকলেন গুহায়। এতদিন রাম জানতেন না। এবার জানতে পারলেন ময়ঙ্কের কথা। অকালে প্রাণ গেল লক্ষ্মণের হাতে। উদ্ধার হলো কাপড়। সীতার কাপড চুরি মানে বিরাট ব্যাপার। ফলে এই পাপের জন্য ময়ঙ্ক পাথর হয়ে ঝুলে রইলো গুহার মধ্যে।

এই গুহার মধ্যে বাঁক নিলেই গুহার দ্বিতীয় অংশ। আগেরটির তুলনায় এটি বেশ বড়। এখানে হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত থৈ থৈ করছে জল। বেশ ঠাণ্ডা। দর্শনার্থীরা কেউ হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় তুললো—কেউ ভেজালো। গুহার একপাশের একটি বেদিতে স্থাপিত আছে মহাবীর, গণেশ আর গুপ্তেশ্বরনাথের বিগ্রহ।

বেশ বড় একটা পাথরের চাঁই রয়েছে গুহার মধ্যে। এটা যে কেউ বয়ে নিয়ে এসেছে এখানে—বিশ্বাস করা কঠিন। আনা একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃতির নিয়মেই সৃষ্টি হয়েছে এই গুহা। সেই নিয়মেই এটা সুন্দরভাবে রয়েছে গুহার মধ্যে। একটি আসন যেন। এই বড় পাথর খণ্ডটির নাম রাম দরবার। বেশ বাহারি নাম। কথিত আছে, মাঝে মধ্যে রাম বেড়াতে এলে বিশ্রাম করতেন এই পাথরটির উপরে বসে।

গুহার মধ্যে ছোট ছোট কুণ্ড আছে পাঁচটি। রামকুণ্ড, লক্ষ্মণ ও হনুমানকুণ্ড।

সীতাকুণ্ড তো পাওয়া গেছে আগেই। আরও একটি—চন্দন কুণ্ড। এর মধ্যে হনুমান কুণ্ডটিই আকারে বড়। এই কুণ্ডের জলই গুহাকে ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। জনশ্রুতি আছে, এই গুহার জলধারার সঙ্গে নাসিকের গোদাবরীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে গুপ্তভাবে। তাই নাম হয়েছে এর গুপ্ত গোদাবরী।

বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে। বাঁ পাশেই রয়েছে একটি প্রাচীন মন্দির। সিঁড়ির পাশে—একেবারে পাহাড়ের গায়ে। এখানে সীতার চরণ চিহ্ন নামক একখণ্ড পাথর আর পবনপুত্র হনুমানের মূর্তি টেনে আনছে একের পর এক তীর্থযাত্রীকে। মন্দির দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন এক পূজারী। হাত পাতলেই পড়ছে সীতার চরণ আর হনুমান দর্শনী।

আধঘণ্টার মধ্যেই সব দেখা হয়ে যায়। তীর্থযাত্রীদের অনেকেই এখানে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয়। যে বাসে এসেছিলাম এখানে—ছেড়ে দিলাম। নজরে এসেছে এক সাধুবাবা। কথা হবে তাঁর সঙ্গে।

সাধুসঙ্গ—জীবন যন্ত্রণায় সমাজ—
নির্বিকার সাধু, মহাপুরুষ

গুপ্ত গোদাবরী গুহার কিছুটা আগে—দুধারে দোকান পাট—তারও একটু আগে যেখানে ভিখারীরা বসে ভিক্ষে করে—সেখানেই বসে আছেন এক বৃদ্ধ। সাধু না বলে পাগল বলাই ভালো। পাগল বলছি এই কারণে—বাইরে থেকে দেখলে একটা পাগলের যে সব লক্ষণ থাকে—তার সব কটিই ফুটে উঠেছিল তাঁর দেহে। এটা মনে হলো প্রথম দর্শনেই। বহু বছর স্নান না করা মানুষ ধুলো ময়লার মধ্যে শুয়ে বসে থাকলে দেহের যে দশা হয়—এই বৃদ্ধের তেমনি। খালি গা। ময়লা জমে জমাট বেধে আছে। গাছের শুকনো বাকল যেন। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে দিলেই চকলা উঠে আসবে। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঝাকড়া চুল—এলোমেলো। পরনে ছেঁড়া এক টুকরো কাপড়। নেমে এসেছে হাঁটুর কাছাকাছি। তেলকালি মোছার ন্যাকড়া যেন। সঙ্গে না লোটা—না কম্বল। কিছুই নেই। যাতায়াত করছে যাত্রীরা। কারও মুখের দিকে তাকাচ্ছেন মাঝে মধ্যে। আবার মাথা নিচু করছেন। ভিক্ষে চাইছেন না কারও কাছে। বৃদ্ধ বসে আছেন আপনভাবে। অন্য ভিখারীদের তুলনায় ভাবে একটু স্বতন্ত্র। যেমন, বেশ বোঝা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের বউ—অনেক বউ-এর মাঝে।

গুহা থেকে ফেরার সময় হঠাৎ-ই নজর পড়লো। দাঁড়িয়ে গেলাম একটা দোকানের পাশে। লক্ষ্য করতে লাগলাম। আরও একটু এগিয়ে গেলাম। কাছাকাছি। এবার চোখ পড়লো চোখ দুটোয়। এমন চোখ কোন পাগল বা সাধারণ মানুষের হয় না। দেবী চক্ষু। এই মুহূর্তেই বয়সটা আন্দাজ করতে পারলাম না।

তাঁকে যে গভীরভাবে লক্ষ্য করছি—তা তিনি টের পেয়েছেন মনে হলো। একবার তাকালেন আমার মুখের দিকে। কিছুটা অস্থির হয়ে উঠলেন—বুঝতেই পারলাম। ভাবলাম, দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। দাঁড়িয়েই রইলাম। কাটলো মিনিট দশেক। আরও যেন অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। এক পা-ও নড়লাম না।

এবার দেখলাম, বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। এখন ভালো করে লক্ষ্য করলাম চোখ দুটো। অসম্ভব বড় আর ফালা ফালা। কপালের উপর বেয়ে পড়া চুলগুলোতে প্রায় ঢেকে রয়েছে। চোখ দুটো থেকে ঠিকরে যেন আলো বেরোচ্ছে। শান্ত চোখ অথচ স্থির। আরও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম, চোখের পলক পড়ছে অনেকক্ষণ পর—একবার।

ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তাও প্রায় আধঘণ্টা। এবার ঝট্ করে উঠে তিনি হাঁটা ধরলেন। পিছু নিলাম। কিছুটা তফাৎ রেখে। কিছুদূর যাওয়ার পর একবার দেখলেন পিছন ফিরে। দেখলেন, পিছন ছাড়িনি—আছি। চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন আরও। বাড়ালাম আমিও। চললেন আরও কিছুদূর। আবার তাকালেন পিছন ফিরে। দেখলেন—আছি।

এখন একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম দুজনেই। গতি কমালেন বৃদ্ধ। একটু বাড়িয়ে দিলাম আমি। কাছাকাছি হওয়ার জন্য। হলামও। এবার একেবারেই পাশাপাশি। কোন কথা বলার আগেই বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন,

—তু মেরা পিছু লিয়া কিঁউ ?

শান্ত ও বিনীতভাবেই বললাম,

—দেখলাম, আপনিই তো কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন আমাকে দেখে। তারপরেই তো উঠে হাঁটা ধরলেন। আমিও এলাম পিছন পিছন।

পাগল যে এইভাবে কথা বলবে—ভাবিনি। প্রথমে চোখ দুটো দেখামাত্রই যে ধারণা হয়েছিল—এখন দেখলাম ঠিক। পাগল নয়। খুব উচ্চমার্গের সাধু হবে। নইলে চোখদুটো এমন হবে কেন—পলকই বা পড়বে কেন অত দেরী করে। এবার আরও ঝাঁঝিয়ে উঠলেন,

—ঠিক আছে, 'ভাগ্' এখন।

মনে মনে ভাবলাম, ভাগ বললেই কি আর ভাগি! বললাম,

—চলুন না বাবা, একটু বসি কোথাও।

স্বামীর আয় কম। এক পাল বাচ্চা। ছোট ছোট। প্রত্যেকেই ভুগছে রোগে। বই-এর ধারে কাছে কেউ যায় না। মারামারি করছে সর্বদাই। দেখার কেউ নেই। সামলাতে হচ্ছে মাকে। এমন বিরক্ত মা যেভাবে খিঁচিয়ে ওঠে সন্তানদের—ঠিক তেমনভাবেই খিঁচিয়ে বললেন,

—আমার সঙ্গে তোর কি দরকার? বসতেই বা যাবো কেন—যাঃ! ছাড় আমার পিছু।

এ-কথায় কোন আমলই দিলাম না। বাঁকা কথা বললে সব পণ্ড হয়ে যাবে। তাই

বিনীত—আরও বিনীত কণ্ঠেই বললাম,
—আপনার কি কোন ক্ষতি করেছি আমি ?
কণ্ঠে আগের তীব্রতার এতটুকুও কমলো না। একই সুর—একই বাচনভঙ্গীতেই বললেন,
—তু কুছ নেহি কিয়া, লেকিন ছোড় মেরা পিছু।
আর কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলেন। আমিও চললাম সঙ্গে সঙ্গে। কিছুদূর যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে গেলেন। কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বললেন,
—তুই তাহলে পিছু ছাড়বি না—দেখবি তাহলে ?
একটা কথাও বললাম না। ওইভাবে তাকানোয় দেহটা আমার শিহরিত হয়ে উঠলো। ভাবলাম, ছেড়ে দি। যাকগে যেখানে খুশী। আবার ভাবলাম, ইনি হয়তো উচ্চমার্গের কোন সাধু। মনের ভাব অবগত হয়েছেন। অনেক প্রশ্ন করবো। তিনি বলতে চান না। তাই সরে পড়ার চেষ্টা করছেন। অতএব যা হয় হবে। ছাড়বো না। মাথা নিচু করেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন,
—শালা, কুত্তা কা বাচ্চা—তু নেহি ছোড়েগা মেরা পিছু ?
কোন কথা না বলে এবার ঝট্‌ করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। এত দ্রুত করলাম যে, কিছু বলার বা বাধা দেয়ার সুযোগই পেলেন না সাধুবাবা। এতে বেশ কাজ হলো। যেন জল পড়লো আগুনে। শান্ত হলেন মুহূর্তে। মুখের ভাবটারই গেল পরিবর্তন হয়ে। আরও একটু এগিয়ে গেলেন। বসলেন পথের ধারে। একটা গাছের নীচে। বসলাম আমিও। লোক চলাচল করছে। অনেকেই দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। কয়েক মিনিট বসে রইলাম দুজনে। কোন কথা বললাম না। সাধুবাবাই বললেন,
—কি ব্যাপার বলতো! আমার সঙ্গে তোর কি দরকার ?
মাথাটা নীচু করেই বললাম,
—বাবা, আপনার বাহ্যিক চেহারাটা দেখে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, আপনি বোধ হয় পাগল নইলে ভিখারী। পরে চোখ দুটো দেখে মনে হয়েছে উচ্চমার্গের সাধক আপনি। তাই আপনার পিছু…
শেষ হতে দিলেন না কথাটা। রাগত কণ্ঠেই বললেন,
—চুপ, আর ও-কথা মুখেও আনবি না। সাধক—হুঁ!
ও-কথায় আর না গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,
—এই তীর্থে আছেন কত বছর ?
সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,
—কেন বলতো ?
ছোটবেলার কথা। অনেক সময় পড়া না করেই যেতাম ইস্কুলে। মাস্টার মশাই পড়া ধরতেন। পারতাম না। কিছু বললে মাথাটা নীচু করেই থাকতাম।

ভাবটা এমন—যেন কত লজ্জাই না পেয়েছি! আসলে লজ্জা বা দুঃখ—কোনটাই ছিল না তখন। ফাঁকিবাজ আর কথার খেলাপকারীদের থাকে না ওটা। এমনটা করতাম—যাতে আর কিছু না বলেন। ঠিক ইস্কুলের কায়দায় বললাম,

—তেমন কিছু নয়। এটা আমার কৌতূহল বলতে পারেন।

কথাটা শেষ করতেই বললেন,

—তোর এসব জানার দরকার নেই। এখন তুই যেতে পারিস্।

কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না সাধুবাবাকে। ধৈর্য হারালাম না। ভাবলাম, প্রশ্ন করলেই বেয়াড়া উত্তর দেবে। বলার সুযোগটা দিতে হবে সাধুবাবাকেই। নইলে কথা হবে না। বিড়ি রয়েছে পকেটে। দিতে সাহস পাচ্ছি না। চুপ করে বসে থাকাটাই ভালো মনে হলো। দেখা যাক কি হয়! আর কোন কথা বললাম না। সাধুবাবা বেশ ভালো করে লক্ষ্য করছেন আমাকে। কেটে গেল প্রায় মিনিট কুড়ি। এবার মুখ খুললেন,

—বেটা, থাকিস্ কোথায় ?

কণ্ঠস্বর শুনেই একেবারে চমকে উঠলাম। মানুষের কণ্ঠস্বর এত করুণা ঢালা হতে পারে—এ না শুনলে কারও বিশ্বাসই হবে না। এতক্ষণে খুশীতে ভরে উঠলো মনটা। আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। সাধুবাবার দেহ থেকে ভুর-ভুর করে বেরোতে থাকলো চন্দনের গন্ধ। হাতটাও আমার গন্ধেতে ভরে গেল। বললাম,

—বাড়ী আমার কলকাতায়। বেরিয়েছি ভ্রমণ আর সাধুসঙ্গ করতে। আপনাকে দেখে মনে হলো আপনি একজন সাধু। তাই আর পিছন ছাড়লাম না।

কথাটা শুনে হাসিতে ভরে উঠলো সাধুবাবার মুখখানা। ভাবটাই কেমন যেন পাল্টে গেল। বললেন,

—অনেক ঘুরেছিস্ ?

'হ্যাঁ' বললাম ঘাড় নেড়েই। মুহূর্তের মধ্যে সাধুবাবাকে যেন আরও বেশী প্রসন্ন বলে মনে হলো। ভাবের কি অদ্ভুত পরিবর্তন। চুপ করে রইলেন মিনিট খানেক। কিছু একটা ভেবে মাথাটা একটু দোলালেন। তারপর বললেন,

—বহুদিন হলো এখানে আছি। কতদিন—ঠিক বলতে পারবো না।

জানতে চাইলাম,

—বাবা, এমন নোংরা অবস্থায় থাকেন কেন আপনি—নিজেকে গোপন করার জন্য ?

তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করছে। আছে গ্রাম্য লোকও কিছু। তাদের দিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েই বললেন,

—বেটা, কিছু থাকলে তো মানুষ কিছু গোপন করে। আমার তো কিছু নেইরে। আর এমনভাবে থাকি কেন জানিস্ ? গুদামে অবহেলায় পড়ে থাকা চিনি পিঁপড়েতেও ছোঁয় না। যত্নের চিনিতে পিঁপড়ে লাগে বেশী—সেই জন্যেই।

বুঝে গেলাম, এখন প্রশ্ন করলেই উত্তর পাবো। জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা মানুষের মধ্যে এত ক্ষোভ, এত দুঃখ, এত বেদনা কেন বলতে পারেন? এর থেকে মানুষ কি মুক্তি পেতে পারে না—পেতে পারে না কি এতটুকু শান্তি?
প্রশ্নটা শুনে মুখের দিকে তাকালেন সাধুবাবা। মুহূর্তমাত্র না ভেবেই বললেন,
—বেটা, পৃথিবীটা চলছে তার আপন নিয়মে—আপন গতিতে। ক্ষুদ্র মানুষ এই বিশাল পৃথিবীটাকে তার নিজের 'ভাব'-এ—নিজের নিয়মে, নিজের মতো করে নিয়েই চলছে। এতে চলার পথে তার বাধা আর ধাক্কা আসছে অবিরত, ফলে ক্ষোভ, দুঃখ হয়ে উঠছে অনিবার্য। তাই এর থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তিও নেই—শান্তিও নেই।
সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,
—আপনার মতো যাঁরা—আপনাদের মতো যাঁরা—তাঁরাও তো মানুষ। তাঁদের কেন এমন হয় না?
সাধারণভাবেই উত্তর দিলেন সাধুবাবা,
—সংসারের সব ছেড়ে অথবা থেকেও যারা পৃথিবীর নিয়মেই গা ভাসিয়ে চলেছে—তারা অপ্রতিহত। আনন্দময় জীবন তাদের কোনও সংঘাত নেই। তারা যে আপন করে নেয়নি পৃথিবীটাকে। এ-পথে এসেও যারা অজ্ঞানতাবশতঃ কখনও নিজের করে নিতে চেয়েছে—তারা আর পাঁচজনের মতোই মুক্ত হতে পারছে না পার্থিব ক্ষোভ দুঃখ আর বেদনা থেকে।
এবার উদাহরণ দিয়েই বললেন,
—যেমন ধরু, সংসার ছেড়ে এলো কেউ এ-জীবনে। কিছুকাল পর তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার চিন্তা ঢুকলো মাথার মধ্যে। আশ্রম করবো। সকলে মানবে। এমন শত চিন্তা। এসব যখনই ঢুকলো মাথায়—তখনই তার চলা শুরু হলো নিয়মের বাইরে। অনিয়মেই সুখ নষ্ট—শান্তিও নষ্ট। আরে বাবা, কেউ যদি না মানে—তাতে কি যায় আসে? কেউ যদি মানে—তাতেই বা কি আসে যায়! এ-সব কি তুই সঙ্গে নিয়ে যাবি?
প্রশ্ন করলাম,
—এ-তো বললেন সাধুদের কথা। সংসারী যারা—তাদের তো প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন—প্রয়োজন জাগতিক বিষয়গুলোরও।
সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়েও মুখে বললেন,
—প্রয়োজন তো বটেই। তবে সংসারীদের প্রয়োজনের কোন শেষ নেই। তার শেষ কোথায়—কারোরই তা জানা নেই। যার প্রয়োজন—সে তো নিজেও জানে না তার কতটুকু প্রয়োজন। সংসারে বাঁচার জন্য সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। তবে তার ব্যবহারিক তারতম্যও তো আছে। ফলে যখনই পৃথিবীর নিয়মের সঙ্গে তারতম্য হচ্ছে—যে কোন বিষয়, বস্তু বা চিন্তা নিয়ে—তখনই আসছে অশান্তি, ক্ষোভ-দুঃখ। এ থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। যারা মুক্ত হতে পেরেছে—যারা

পারছে, তাদের সংখ্যা নেহাতই কম।

সাধুবাবার সম্পর্কে ভেবে নিলাম একমুহূর্ত। একটু আগেই রাস্তার চরিত্রহীন কুকুরগুলোর মতো তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন আমাকে। কোন কথাই বলতে চাইছিলেন না। অথচ এখন—ভাবতেই কেমন যেন লাগছে! হঠাৎ সাধুবাবা বললেন,

—হ্যাঁরে, তুই তো একটু আগেই বললি অনেক ঘুরেছিস্। ভালো কথা। নিশ্চয়ই মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর দর্শন করিস্, পুজো দিস্—এ-সব তো করিস্?

এমন প্রসঙ্গ পাল্টে সাধুবাবা এ-রকম প্রশ্ন করায় অবাকই হলাম। উত্তরে বললাম,

—কোন তীর্থে গেলে স্বাভাবিক নিয়মেই যাই মন্দিরে—আর সকলে যেমন যায়। পুজো দেয়ার ব্যাপারটা আলাদা। ইচ্ছে হলে দিই—নইলে নয়। হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞাসা করলেন!

মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো সাধুবাবার। অপলক দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—যদি মনের উন্নতি চাস্, আত্মিক কল্যাণ চাস্—তাহলে আর যাস্ না। কেন নিষেধ করছি—বলি শোন্। সাধারণভাবেই অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটে মন্দিরে। বিশেষ করে প্রসিদ্ধ মন্দিরে তো কোন কথাই নেই। সেখানে প্রবেশ করলে পারমার্থিক কল্যাণ তো হয়ই না—অকল্যাণই হয় বেশী। অবশ্য তুই যদি আধ্যাত্মিক কল্যাণ না চাস্ তো আলাদা কথা।

একটু চম্‌কে উঠলাম কথাটা শুনে। বিস্মিত হয়েই বললাম,

—বলেন কি বাবা, এমন কথা তো শুনিনি কখনও!

গম্ভীর ভাবেই বললেন,

—হাঁ বেটা, ঠিকই বলেছি। মন্দিরে ঢুকলেই অক্টোপাসের মতো মনকে আঁকড়ে ধরবে সংসারের কামনা-বাসনাগুলো। ঈশ্বরের কাছে মুক্তির প্রার্থনা করলেও ধরবে—কোন কিছু না ভাবলেও ধরবে। একবার পরখ্ করে দেখিস্। বহু মানুষের সমাগম হয় এমন মন্দিরে যাবি। ভিতরে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবি কিছুক্ষণ। কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এবার বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে কোথাও দাঁড়া। দেখবি, নানা কামনামূলক চিন্তার উদয় হচ্ছে মনের মধ্যে। এটা হবে সকলেরই। খুব খেয়াল করলে তবেই এটা বোঝা যায়। অথচ ভুল করেও কেউ খেয়াল করে না কখনও।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। সামনে পড়ে থাকা গাছের পাতা একটা তুলে নিলেন হাতে। বোঁটাটা ধরে দু-আঙুলে ঘোরাতে লাগলেন। কানে সুরসুরি দেয়ার মতো করে। এমন করতে করতেই বললেন,

—আবার এমনও হবে—বাইরে থেকে কামনামুক্ত ভাব নিয়ে মন্দিরে ঢুকে দাঁড়াবি কিছুক্ষণ। দেখবি, ধীরে ধীরে সেই ভাবের পরিবর্তন হয়ে যাবে অজান্তে। সাংসারিক কামনা বাসনার ভাবই ক্রমাগত প্রতিফলিত হতে থাকবে মনে। যত বেশীক্ষণ থাকবি—ততবেশী করে ওগুলো মনের মধ্যে আসতে থাকবে।

কথাগুলো শুনছি হাঁ করে। এ-সব কথা তো শুনিনি কখনও। মনে মনে ভাবছি, কোন মন্দিরে গিয়ে এমন ভাবনা এসেছিল কিনা মনে। কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সাধুবাবা বলেন,

—যে সব মন্দির নির্জন—লোক সমাগম হয় না বললেই চলে—সেখানে গেলে মনে চট্ করে জাগতিক কামনা বাসনার উদয় হবে না। মনের ভাবটাই থাকবে স্বতন্ত্র। নির্জনে অবস্থিত মন্দিরে যাওয়ার ফল অনেক ভালো—'জাগ্রত' বলে খ্যাত মন্দিরের তুলনায়। তবে সাংসারিক কোন কামনায় ও সব 'জাগ্রত' মন্দিরই ফলপ্রদ। সত্যিই যদি কেউ কামনা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে পরমানন্দে রাখতে চায়—তা হলে কোন মন্দিরের মধ্যে না যাওয়াই মঙ্গল। কি হবে বলতো এক ঘটি জল বিশ্বনাথের মাথায় ঢেলে! পুণ্য হবে—মুক্তি পাবি? তাহলে তো সবাই মুক্ত হয়ে যেত।

এবার থাকতে না পেরে বললাম,

—বাবা, আপনি বললেন, মন্দিরে গেলে সাংসারিক কামনা বাসনা মনকে আঁকড়ে ধরবে—কেন ধরবে, কেমন করে ধরবে—কারণটা কি বলবেন?

মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। ভাবের কোন পরিবর্তন দেখলাম না। কিছু যে একটা চিন্তা করছেন—তাও মনে হলো না। শূন্য দৃষ্টিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন চারদিকে। তারপর বললেন,

—'মন্দির' শব্দটাই বশ করে মানুষকে। আকর্ষণ করে টেনে আনে দূর-দূরান্তর থেকে। তাই মানুষ ছুটে আসে—আসে অসংখ্য কামনা বাসনা নিয়ে। মন্দিরে চলতে থাকে কামনা বাসনারই প্রার্থনা। ফলে সীমাবদ্ধ মন্দির অভ্যন্তরের বায়ুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় পার্থিব কামনায়। মুখে উচ্চারিত কামনা বাক্যের শব্দ এবং চিন্তাতরঙ্গ গেঁথে যায় মন্দিরের দেয়ালে—ঘুরতে থাকে মন্দিরক্ষেত্রের বায়ুমণ্ডলে। এবার মন্দিরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো অসংখ্য মানুষের কামনামূলক চিন্তা ও কথাগুলো আশ্রয় করে দেহ ও মনকে। তারপর ক্রিয়া করতে থাকে। ফলে মন ভরে ওঠে কামনা বাসনায়। এগুলো হয় সব অলক্ষ্যে—অজান্তেই। চোখে দেখা যায় না। বুঝতে পারেন শুদ্ধ দেহী ও মনের যাঁরা। মনে রাখবি, কোন বাক্য বা চিন্তা কখনও লুপ্ত হয় না! রয়ে যায়। ভেসে বেড়ায় বায়ুমণ্ডলে—গেঁথে যায় বদ্ধ জায়গার বস্তুতে।

এবার সাধুবাবা একটা উদাহরণ দিয়েই বললেন,

—স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে একের কামচিন্তা অপরের দেহ-মনকে আশ্রয় করে—উত্তেজিত করে তোলে। যতই মনে করুক ঠিক থাকবো—কিছুতেই থাকতে দেবে না। একদিন দুদিন—তারপর যে কে সেই। মন্দিরেও তাই। ধরবেই—ধরবে। দেহ মন শুদ্ধ হলেই মন্দিরের ব্যাপারটা বুঝতে পারবি সহজেই। ওটা শুদ্ধ হয় ঈশ্বরের স্মরণ মনন ও অনুধ্যানে। যাদের হয়েছে—তারা কামনা জর্জরিত মানুষ দেখলে বা কাছে এলেই বুঝতে পারে। কারণ চিন্তাতরঙ্গ তার

দেহ মনকে স্পর্শ করে। ফলে তারা বিরক্ত হয়—সঙ্গ দিতে চায় না। তবে একটা কথা নিশ্চিত জানবি—সাধন-শক্তি না থাকলে মন্দিরে গেলে মন কামনায় আচ্ছন্ন হবেই। সত্যিই যদি মনের উন্নতি চাস্, তাহলে মন্দিরের ভিতর যাস্ না। বাইরে থেকে দেবদর্শন করিস্। মনের মুক্তি কখনও মন্দিরে আসে না।

অবাক হয়ে গেলাম কথাগুলো শুনে। অধ্যাত্মভূমি তপোবন এই ভারতবর্ষ। এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য তীর্থ—অগণিত মন্দির। এ-সব কি তাহলে কামনা জর্জরিত হয়ে আছে? সেখানে যারা যায়—তাদের কি কোন কল্যাণই হয় না? কোন সাধকের জীবনীতে তো এমন কথা পাইনি! এই মুহূর্তে আর কিছু ভাবলাম না। সময় নষ্ট হয়ে যাবে। বাদ পড়ে যাবে অন্য কথা—অন্য জিজ্ঞাসা। প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—বাবা, আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু?

এখনও আমি সেই চন্দনের ভুর ভুর করা গন্ধের মধ্যেই আছি। আমার গা-ও ভরে গেছে গন্ধে। 'সম্প্রদায়' কথাটা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন,

—লেখাপড়া শিখে তোর এতদিনে এই জ্ঞান হয়েছে? ঈশ্বরের রাজত্বে যারা বাস করে—তাঁকে যারা ডাকে—তাদের আবার সম্প্রদায় আছে নাকি? তাঁকে ডাকতে আবার সম্প্রদায়ভুক্ত হতে হয় নাকি!

সাধুবাবার এ-কথার পর আর কোন কথা চলেনা। তাই অন্য কথা জিজ্ঞাসা করলাম,

—কত বছর বয়সে ঘর ছেড়েছেন—ছাড়লেনই বা কেন?

কথাটা শুনে একটু বিব্রত হলেন মনে হলো। মুহূর্তে সে ভাবটা কাটিয়েই বললেন,

—পরমাত্মার ইচ্ছা যা—তাই-ই হয়েছে। ওসব কথায় তোর কাজ নেই।

তবুও একটু চাপ দিলাম,

—বলুন না বাবা, কারণ তো একটা কিছু আছে—কেন ছাড়লেন?

মিনিট পাঁচ সাত কি ভেবে পরে বললেন,

—বেটা, এই বিশ্বসংসারে চেষ্টা করে কেউ যেমন সাধক বা বিজ্ঞানী হতে পারে না—তেমনই পারে না চোরও হতে। এ-পথ নির্দিষ্ট ছিল—হয়েছে। তবে লৌকিক কারণ তো কিছু আছেই। আমার ফেলে আসা জীবন—ফেলেই এসেছি। তাই কাজ নেই ও-কথায়।

বুঝতে পারলাম, পিছনে ফিরে যেতে চান না সাধুবাবা। না চাইলে কি হবে—আমাকে জানতেই হবে। পা-দুটো ধরে অনুরোধের সুরেই বললাম,

—দয়া করে বলুন না বাবা, ক্ষতি তো কিছু নেই।

সাধুবাবা হাত দিয়ে আমার হাতদুটোকে সরিয়ে দিতে দিতেই বললেন,

—ছাড়্ ছাড়্—পা ছেড়ে দে। সাধুদের বলতে নেই ওসব কথা।

হাত সরিয়ে নিলাম পা থেকে। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখ মুখের

ভাবটাই কেমন যেন বদলে গেল। ফিরে গেলেন সুদূর অতীতে—যেখানে কোন সাধুই সহজে যেতে চান না,

—তখন বেটা বয়েস আমার কত হবে ঠিক বলতে পারবো না। সাত আট নয়—এ-রকমই হবে। জন্মের পর যখন সামান্য জ্ঞান হলো—দেখতাম, বাবা আমার মাকে ভীষণভাবে মারধোর করতো। কারণ বা অকারণ—কি জন্যে যে মারতো—বুঝতাম না। এমন কোন দিন ছিল না—যেদিন মা আমার বাবার হাতে মার খায়নি। এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারতাম না। বাবা কাজে বেরিয়ে গেলেও মা একা একা বসে কাঁদতেন। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতাম আমিও। ক্রোধ হতো বাবার উপর। তখন তো আমি বাচ্চা—কিছুই করতে পারতাম না—পারতাম না কিছু বলতেও।

কথাটুকু শেষ হতেই চোখদুটো জলে ভরে উঠলো সাধুবাবার। তাকিয়ে থাকতে পারলাম না মুখের দিকে। নিজের মনেই কেমন যেন একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হলো। তবুও বললাম—একটু অপেক্ষা করে,

—বাবা, আপনি তো সাধু। সংসারের কোন বন্ধনই নেই আপনার। যা কিছু সুখ-দুঃখ—তার বাইরেই আপনার জীবন। আর আপনি কাঁদছেন? আপনার ভিতরেও গৃহীদের মতো এতো মায়া রয়েছে!

এবার চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জল নেমে এলো গাল বেয়ে। একটু ধরা গলায় বললেন,

—বেটা, সাধু হয়েছি বলে কি কাঁদতে নেই? ভগবানের জন্য চোখের জল ফেলতে পারি—আর আমার দুঃখিনী মায়ের জন্য পারবো না? পৃথিবীতে মা ছাড়া সন্তানের আপন কে আছে? কেউ নেই—কেউ হতেও পারে না। আর মায়ার কথা বলছিস্?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—মায়া আমার নেই রে! মায়া থাকলে কি আর মাকে ফেলে বেরোতে পারতাম! বেটা, মায়া জাগতিক এবং অপার্থিব—দু-রকমের আছে। জাগতিক বা পার্থিব মায়া সৃষ্টি করে বন্ধন। আর ত্যাগের সৃষ্টি করে অপার্থিব মায়া। মায়া ভগবানেরও আছে—আছে বলেই, তিনিও কষ্ট পান তাঁর ভক্তের জন্য। কেমন জানিস্—ভক্ত, ধর্ খুব কষ্টে আছে। অথচ ভগবান ছাড়া সে কিছুই জানে না। কিন্তু কর্ম এমন যে, ভক্তের কষ্ট তাঁকেও সহ্য করতে হয় নির্বিকার হয়ে। ভক্তের জন্য ভগবানের যে কষ্ট—এটাও জানবি মায়া। তবে অপার্থিব। ভক্তের উপর ভগবানের মায়া। এ-মায়ায় ত্যাগ সৃষ্টি হয় ভক্তের। তাঁর নজরটা তার উপরে থাকে বলে। আর তা থাকে বলেই তো ভক্তের পিছনে পড়ে থাকে ভগবান—মুক্তি দেয়ার জন্য। বেটা, একেবারে সত্য এ-সব কথা। চামড়ার চোখে দেখা যায় না বলে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

যত শুনছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি সাধুবাবার কথায়। চুপ করে রইলেন খানিকটা

সময়। পূর্ব-প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিতেই বললেন,

—প্রতিদিন এইভাবেই দেখতাম মায়ের উপর অত্যাচার। ক্ষমতা ছিল না যে প্রতিবাদ করি। ধীরে ধীরে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হতে থাকলো মনে। একদিন বাবা বেদম মার মারলেন মাকে। এ-মার চোখে দেখা যায় না। সংজ্ঞা হারিয়ে মা আমার লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। ব্যস, তারপর আর ফিরে যাইনি ঘরে।

গৃহত্যাগের কাহিনী শুনে মনটা ভরে উঠলো অস্বস্তিতে। এই সাধু-জীবনে এসে, সাধুবাবার মায়ের জন্য চোখের জল না পড়লে হয়তো সাধু জীবনটাই কলুষিত হতো সাধুবাবার। দু-জনেই বসে রইলাম কোন কথা না বলে। মিনিট দশেক কাটলো। বললাম,

—বাবার বয়েস কত হলো এখন?

মলিনতার ছাপ পড়েছে মুখে। একটু ভেবে নিয়েই বললেন,

—বহুকাল হলো ঘর ছেড়েছি—সেই ছোট বেলায়। ঠিক বলতে পারবো না বেটা।

বলে আবার ভাবলেন। কয়েক মিনিট। বললেন,

—আন্দাজ ৮০/৮৫ বছর তো হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাড়ী কোথায় ছিল? ঘর ছেড়ে বেরিয়ে প্রথমে গেলেন কোথায়?

চোখের ভিজে পাতা—যা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। দু-হাতে মুছে বললেন,

—ঘর ছেড়ে তো বেরোলাম। মনে শান্তি নেই। মায়ের কথা মনে করে শুধু কাঁদতাম আর কাঁদতাম। তখন একমাত্র সাথীই আমার চোখের জল। এত কেঁদেছি যে, পরে একটা সময় এলো—চোখের জল বোধ হয় আমার শুকিয়ে গেছিলো। আর আসতো না। কাউকে কিছু বলতেও পারতাম না। কাকেই বা বলবো? একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করতাম বুকের ভিতর। একে তো মনের এই অবস্থা, তার উপর থাকা খাওয়া আর ঘুম—এ-তিনটের কোনটারই তখন ঠিক ছিল না। সম্বল করেছি ভিক্ষাবৃত্তি। যা জুটতো—তাই-ই খেতাম। এই ভাবেই চলতে লাগলাম অনিশ্চিত জীবনে—অনিশ্চয়তার পথে। বাড়ী ছিল আমার সাহারাণপুরে।

একটু থেমে—ঘন একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাকালেন আমার মুখের দিকে। কোন কথা না বলে রইলাম একইভাবে। সাধুবাবা বললেন,

—ধাক্কা খেতে খেতে একদিন গেলাম বৃন্দাবনে। প্রতি মুহূর্তে মায়ের করুণ মুখখানা ভেসে উঠতো চোখের সামনে। অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্‌ করতাম। এইভাবেই কাটলো প্রায় মাস আটেক। একদিন বসে আছি যমুনা তীরে—গোঘাটে। ভাবছিলাম মায়েরই কথা—অন্যমনস্ক হয়ে। হঠাৎ দেখি এক জটাজুট সন্ন্যাসী। এসে দাঁড়ালেন একেবারে সামনে। মুহূর্ত দেরী করলাম না। অসহ্য যন্ত্রণায়

ভেঙে পড়া মনটা তখন আমার 'মন'-এ নেই। জড়িয়ে ধরলাম তাঁর পা-দুটো। কাঁদতে থাকলাম আকুল হয়ে। একটা কথাও সরলো না মুখ থেকে। পা-দুটোও ছাড়লাম না। ধরে তুললেন আমাকে। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'চল্ বেটা, তোকেই তো নিতে এসেছি। তোর দুঃখ কিসের? আমি তো আছি।'

আর কোন কথা নয়। সঙ্গী হলাম সন্ন্যাসীর। একটা নেংটি দিলেন তিনি। পুরনো ছেঁড়া নোংরা পোশাক ছেড়ে পরলাম নেংটি। এলাম বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বারে। তারপর হাঁটা পথে হরিদ্বার থেকে গেলাম রুদ্রনাথে। তখন ওপথ ছিল বড় কঠিন—দুর্গম। এখনকার মতো এত লোক সমাগম ছিল না। রুদ্রনাথে কয়েকদিন থাকার পর দীক্ষা দিলেন সেই সন্ন্যাসী। তিনিই আমার পূজনীয় গুরুজী। দীক্ষা হলো রুদ্রনাথ মন্দিরে। দীক্ষার পরেই লোপ পেল আমার অন্তরের সমস্ত বেদনা। স্থিতি এলো মনের। শান্ত হলাম।

অবাক হয়ে গেলাম সাধুবাবার কথা শুনে। কি অদ্ভুত পরিবর্তন! কি অকল্পনীয় যোগাযোগ! এর কি সত্যিই কোন ব্যাখ্যা আছে? বিস্মিত মনেই জানতে চাইলাম,

—তখনকার দিনে পথ ছিল দুর্গম। কেদার-বদরীতে তো লোকজন কিছু যেত। রুদ্রনাথে তীর্থযাত্রী যেতো না বললেই চলে। গেলেও তা ধরার মধ্যে নয়।

তখন ওখানে খেতেন কি—থাকতেনই বা কোথায়?

চোখ মুখে দেখলাম, আগের অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন সাধুবাবা। বললেন,

—ওখানে গুহা ছিল অনেকগুলো। তার মধ্যে একটা ছিল গুরুজীর। আমি যাওয়ার আগেও তিনি ওখানে থাকতেন—তপস্যাও করতেন। এ-সব জেনেছি অনেক পরে। ওই গুহাতেই রয়ে গেলাম। গুরুজী আর আমি। দীর্ঘ প্রায় সত্তরটা বছর কাটিয়েছি হিমালয়ে—রুদ্রনাথের ওই গিরিগুহায়।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনার গুরুজীর বয়স কত ছিল?

কপালটা একটু কোঁচকালেন। মনে হলো, ভেবে ঠাঁই পেলেন না। বললেন,

—গুরুজীর বয়স কত ছিল—ঠিক বলতে পারবো না বেটা। আমি তোর মতো এসব কথা জিজ্ঞাসাও করিনি কখনও। তবে প্রথম যখন দেখি, তখনই তো গুরুজী একেবারেই বুড়ো। কিন্তু দেখলে মনেই হতো না। অথচ দেহের চামড়া কুঁচকে ভাঁজ হয়ে—মোটা হয়ে গেছে। তার উপর আমিই তো তাঁর সঙ্গ করেছি প্রায় সত্তরটা বছর। আর খাওয়ার কথা বলছিস্—ওটা গুরুজীই জোগাড় করে আনতেন। ওসবের কোন চিন্তাই ছিল না আমার।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম ওই একই কথা,

—হিমালয়ের ওই নির্জন গিরিগুহা। তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ছিল নেহাতই কম।

বলতে গেলে ভিক্ষে দেয়ার মতো লোকই ছিল না। সেখানে প্রতিদিনের আহার সংগ্রহ হতো কেমন করে? তখন তো এমন লোকবসতিও ছিল না যে—গেলেই পেয়ে যেতেন!

এতক্ষণ পর সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠলো সাধুবাবার মুখে। বললেন,

—গুরুজী আহার সংগ্রহ করতেন কোথা থেকে—বলতে পারবো না। তবে প্রতিদিন সুমিষ্ট ফল, উৎকৃষ্ট ঘি, আটা সব্জি আনতেন। যখন যা খেতে ইচ্ছে করতো, প্রয়োজন হতো—তাই-ই আনতেন। কোনদিন না খেয়ে থাকিনি আমরা।

কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। দুর্গম হিমালয়ে সাধুবাবার খাদ্য সংগ্রহের রহস্য ভেদ করতেই হবে। বলে'কি এসব কথা! মাথাটাই দেখছি আমার খারাপ করে দেবে। কৌতূহলে অধৈর্য হয়ে বললাম,

—গুরুজী প্রতিদিন খাবার আনতেন কোথা থেকে—দিতই বা কে?

নির্বিকারভাবেই বললেন সাধুবাবা,

—তোর মতো অত কৌতূহল আমার ছিল না। গুরুজী আশ্রয় দিয়েছেন—এটাই তখন ছিল যথেষ্ট। তাই ওসব কথা জিজ্ঞাসা করিনি কখনও।

মনেই হলো, বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চাইছেন সাধুবাবা। তাই কথার ফাঁক মেরে একটু ঘুরিয়ে বললাম,

—বাবা, নির্জনে দেবার মতো লোক নেই, অথচ আহার সংগ্রহ করে আনতেন গুরুজী। কোথা থেকে—কেমন করে আনতেন—এত বছর যখন এ-পথে আছেন, তখন ধারণা তো কিছু আছে আপনার।

কথাটা একটু ঘোরাতেই মুখ খুললেন সাধুবাবা,

—আমার গুরুজী ছিলেন যোগী। অসাধারণ ছিল তাঁর যোগৈশ্বর্য। এ-সব আহার আনতেন তিনি অতি সহজেই। গুরুজীকে 'ভিখ্ মাঙতে' দেখিনি কখনও —দেখিনি কারও কাছে হাত পেতে কিছু নিতে।

কৌতূহলের সীমা রইলো'না আমার। উৎসুক হয়ে বললাম,

—নিজের চোখে আপনি কখনও তাঁর যোগৈশ্বর্যের কিছু দেখেছেন?

খুশীতে ভরে উঠলো সাধুবাবার মুখখানা। বললেন,

—দেখেছি মানে! গুরুজীর অসাধারণ ক্ষমতা দেখতে দেখতেই তো কেটে গেছে জীবনের অতগুলো বছর। টেরই পাইনি। ওসব কথা বলেও শেষ করতে পারবো না কোনদিন! আহার সংগ্রহের কথা বললি যখন—একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি শোন্। একদিন সকাল থেকে শুরু হলো তুষারপাত—সঙ্গে বৃষ্টি। বাপ-রে সে-কি বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি সচরাচর হতে দেখিনি কখনও। সঙ্গে চলেছে ঝড়ো হাওয়া। বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণই নেই। বেলা ক্রমে বেড়েই চলেছে। গুহা থেকে বেরোয় কার সাধ্যি। এদিকে কাঠও নেই—খাবারও নেই গুহায়। এ-সবই জানতেন গুরুজী। তবুও বললাম তাঁকে। শুনে হাসলেন তিনি। বললেন,

'ঘাবড়াও' মত্ বেটা'—বলে, গুহায় বসে ধীরে ধীরে গুহার বাইরে প্রসারিত করে দিলেন হাতটাকে। ক্রমশ বড় হতে থাকলো। চেয়ে রইলাম অবাক হয়ে। দৃষ্টির নাগাল পার হয়ে গেল আমার। মুহূর্তের মধ্যেই হাতটা নিয়ে এলেন পূর্বাবস্থায়। দেখলাম, ওই প্রচণ্ড বৃষ্টি আর তুষারপাতের মধ্যেও হাতে এক বোঝা শুকনো কাঠ, আটা, সব্জী আর ঘি। এ-যুগে এ-সব কথা তো কেউ বিশ্বাসই করবে না—বিশ্বাস হবে না তোরও।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। মিনিট খানেক। তারপর বললেন,

—বেটা, একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করতাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন জিনিষই গুরুজী আনতেন না কখনও। আর সঞ্চয়ও থাকতো না কোনদিন। যেদিন যে জিনিষ যতটুকু প্রয়োজন—ঠিক ততটুকুই আনতেন। একটা রুটিও কখনও অতিরিক্ত থাকতো না—হতোও না।

এ-সব কথা ভেবে কোন কূল-কিনারা করতে পারলাম না। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম,

—সারা ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ ঘুরেছেন নিশ্চয়ই?

মাথাটা নাড়িয়েও মুখে বললেন,

—না না বেটা, কেদার-বদরী, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী আর গোমুখ গেছি। আর কোথাও যাইনি কখনও। হিমালয় তপোবন, ওখানে সর্বদাই বয়ে চলেছে আনন্দের হিল্লোল। এমন আনন্দ কি আর অন্য কোন তীর্থে পাওয়া যায়! সেইজন্যেই তো হিমালয় ছেড়ে অন্য কোথাও যাইনি। মনও চায় না।

জানতে চাইলাম,

—তাহলে কেন হিমালয় ছেড়ে নেমে এলেন এই জনকোলাহল তীর্থে?

এতক্ষণ সাধুবাবার দৃষ্টি ছিল আমার উপরে। এবার এদিক ওদিক তাকালেন একটু। তারপর চোখটা ঘুরিয়ে আমার দিকে রেখে বললেন,

—গুরুজীর দেহরক্ষার পর ভাবলাম, যাই একবার লোকালয়ে। বহুবছর তো যাইনি—তাই চলে এলাম। আবার ফিরে যাবো সেই গুহায়—যেখানে শুরু করেছিলাম আমার সাধন-জীবন।

এই কথাটা বলার পর দেখলাম, ভাবটা কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠলো সাধুবাবার। মনে হলো, সেই গুহা-জীবনে চলে গেলেন তিনি। বললাম,

—ফিরে তো যাবেন। গুরুজীও নেই। নির্জনে খাবেন কি? আপনার গুরুজীর কায়দায় খাবার আনবেন?

হেসে ফেললেন কথাটা শুনে। এ-হাসির মধ্যে মিশে রয়েছে যেন এক অপার্থিব আনন্দ। এড়িয়ে যাওয়ার ছলেই হাসতে হাসতে বললেন,

—গুরুজীই মিলিয়ে দেবেন।

এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আমরা প্রায়ই বলে থাকি, ঈশ্বর আছেন—তিনি দয়া করছেন—তাঁর

করুণায় চলেছি—আমাদের উপর তাঁর কৃপা আছে—এমন অনেক কথাই বলি। এ-সবই তো কথার কথা। বুঝতে পারি কই ?
আনন্দভরা মুখে বললেন,
—বেটা, মানুষের সাধারণ চিন্তা ভাবনার বাইরে ঘটে যাওয়া মঙ্গলজনক কোন ঘটনা বা কার্য সংঘটিত হলে—তার সুফল দেখে অন্তরে যে আনন্দের অনুভব—সেটাই ঈশ্বরের দয়া বা করুণা। এটা না বোঝার কারণ কই ? প্রতিটি মানুষ তার নিজের জীবন দিয়েই তা বুঝতে পারে—সহজেই। তবে সেই ঘটনা কারও জীবনে ছোট—কারও বা বড় আকারে ঘটে—পার্থক্য এই-টুকুই। কিন্তু ঘটে—প্রায় প্রতিদিনই। অথচ ভুল করেও ভাবেনা—অনুভব করতে চেষ্টাও করে না অলক্ষ্যে বর্ষিত ঈশ্বরের এই কৃপার কথা—করুণার কথা। আসলে অকৃতজ্ঞের উদাহরণে মানুষই যে প্রথম !
কথাটা শুনে ভাবতে লাগলাম। সাধুবাবা বললেন,
—কি-রে বেটা, কি অত ভাবছিস্ ? ভাবনার কি শেষ আছে ! যত ভাববি—ভাবনা তোকে আরও ভাবিয়ে তুলবে।
ভাবলাম, সত্যিই ভেবে লাভ নেই কিছু। প্রশ্ন করলাম,
—একটু আগেই বলেছেন, স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে থাকলে একের কামচিন্তা অপরের দেহ-মনকে প্রভাবিত করে তোলে। আপনি তো সংসার করেন নি। সারাটা জীবনই কাটিয়েছেন হিমালয়ে। কোন মেয়ে-মানুষের পাশে না শুয়েও বিষয়টা জানলেন কি করে ?
উত্তর দিতে এতটুকু দেরী করলেন না সাধুবাবা,
—বেটা, ওটা তো জগতের সৃষ্টি রহস্যের কথা। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হলেই—ওটা আপনা থেকেই জানতে পারা যায়। শিখিয়ে বা বলে দিতে হয় না কাউকে।

লজ্জার মাথা খেয়ে হিমালয়ের এই সাধুবাবাকে এবার বলেই ফেললাম,
—বলুন দেখি বাবা, কামের এই প্রভাবে আপনি কি প্রভাবিত হয়েছেন ?
এ-কথায় অসন্তুষ্ট তো হলেনই না—হেসে ফেললেন। বললেন,
—জীব জগতের কেউই কামের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তবে আমার কথাই বলি। একেবারে সেই ছোট্টবেলায় গুরুজীর সঙ্গে গেছি হিমালয়ে। তখন তো ওসবের কিছু বুঝতামই না। তারপর দীর্ঘকাল—বলতে পারিস্, জীবনের সবটাই তো কেটেছে আমার ঠাণ্ডা আর হিমালয়ের নির্জন গুহায়। তপস্যা ছাড়া আর কোন কাজই ছিল না আমার। ওখানে থাকাকালীন নারীর মুখ আমি খুব কমই দেখেছি। বছরে এক-আধটা হয়তো। কারণ গুহা থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে যাওয়ার কখনও প্রয়োজন হতো না আমার। দেখেছি শুধু গুরুজীকে—দেখেছি প্রকৃতির নিত্যদিনের রূপের পরিবর্তন—মনোমুগ্ধকর শোভা। যৌবনের প্রথম অবস্থায় কাম দেহকে একটু নাড়া দিয়েছে—মনকে নয়। কঠোর তপস্যা, সংযম,

ব্রহ্মচর্য পালন আর গুরুকৃপা—এ-সবের জন্য মনের উপর কামের কোন ক্রিয়াই হয়নি; কখনও—কোনদিন—এক মুহূর্তের জন্যেও নয়।
কথাটা শুনে কেমন যেন খট্‌কা লাগলো মনে। বলেই ফেললাম,
—বাবা, আপনি বললেন, কাম আপনার দেহকে একটু নাড়া দিয়েছে—মনকে নয়। কথাটা কি ঠিক? চিন্তার থেকেই তো ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া। মনে কাম-চিন্তা না এলে দেহে তার ক্রিয়া হবে কি করে? দেহে কামের ক্রিয়া আছে, অথচ মনে কোন কাম-চিন্তা নেই—এ-কেমন কথা?
কথাটা শেষ হতে না হতেই—উত্তরটা যেন মুখেই ছিল সাধুবাবার। জিজ্ঞাসা করবো—জানতেন মনে হলো। বললেন,
—বেটা, একেবারে বাল্যকালে শিশুর দেহে কামের যে অবস্থা থাকে—যৌবনে আমার কামের সেই অবস্থাই ছিল। একটা পুরুষ শিশুর মনে কামের কোন চিন্তাই স্পর্শ করে না—থাকেও না। অথচ লক্ষ্য করলেই দেখবি, অনেক সময় ঘুমন্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় কামের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে দেহে। এ-প্রকাশ তার কোন কাম-চিন্তা-প্রসূত নয়। কামের এ-প্রকাশ প্রাকৃতিক নিয়মেই—বুঝলি? কাম আমার দেহে ছিল শিশুর মতো অবস্থায়। শুক্রের প্রভাবে দেহে কামের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে—মনে কোন ক্রিয়াই হয়নি—হয় না—হতোও না কখনও।
এবার প্রশ্ন করলাম,
—আপনার মতে কোন্ জীবনটা ভালো—সংসার, না সাধুজীবন?
একটু ভেবে, হাসতে হাসতেই বললেন,
—সংসারে যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সব দিক থেকে—সে তো ভাবতেই পারবে না সাধু জীবনের কঠোরতার কথা। তার কাছে সংসার জীবনটাই ভালো মনে হবে। যে প্রতিষ্ঠা পায়নি—তার কাছে মনে হবে, সাধুজীবনে কত সুখ—কত আনন্দ। কিস্‌সু নেই সংসারে। বেটা, এই জীবনেও তো দেখলাম, দীর্ঘকাল এ-পথে থেকে—এ-জীবন-পথের অসহ্য কষ্ট আর কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে অনেক সাধুই তো ফিরে গেছে সংসারে। তাই ভালো মন্দের বিচার করাটা শক্ত।
একটু চাপ দিয়েই বললাম,
—তবুও আপনার মতে কোন্‌টা ভালো বলে মনে হয়?
নির্লিপ্তভাবেই বললেন,
—দেখ্ বেটা, সংসারে সব কিছু থাকলেও শান্তিটা নেই। যার শান্তি নেই—সব কিছু থাকলেও তার কিছুই নেই। তার মানে সংসারে কারও কিছুই নেই। সাধু জীবনে আর কিছু না থাকলেও শান্তিটা আছে। সংসার ভালো। তবে সংসার যদি করতেই হয়, তাহলে সংসারে থেকে পরমাত্মার সঙ্গে সংসার করাটাই ভালো। তাতে শান্তিটা থাকবে—সংসারে থেকেও।
সব সময় মনে থাকে না সব কথা। বহুদিন ধরেই ভেবে রেখেছি, এই কথাটা জিজ্ঞাসা করবো কোন সাধুবাবাকে পেলে। পেয়েছিও। কথায় কথায় হারিয়ে

গেছে কথাটা। নিজেই তলিয়ে যাই সাধুবাবাদের কথায়। এই মুহূর্তে হঠাৎ মাথায় এলো কথাটা। জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম,

—প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত—ভারতবর্ষে তো বাবা বহু সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, মহাপুরুষ এসেছেন যুগে যুগে। আরও আসবেনও হয়তো। বর্তমানে যে একেবারে নেই—এমন নয়। আমার বিশ্বাস তাঁদের অনেকেই অসাধারণ ক্ষমতা এবং ঐশী শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু সমাজের জন্য—সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা শুধু জ্ঞান বিতরণ ছাড়া আর কিছুই করেননি—করেনও না। তাঁদের সকলের উপর শ্রদ্ধা রেখে, এ-কথা স্পর্ধার সঙ্গেই বলছি—তৈলঙ্গ স্বামী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, গম্ভীরনাথ, গোরক্ষনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, ভোলানন্দগিরি, বামাক্ষেপা, কাঠিয়াবাবা থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পর্যন্ত—ভারতের প্রায় সমস্ত সাধকের জীবনই আমি পড়েছি। তাতে আমার ওই ধারণাই হয়েছে। তাঁদের জ্ঞানের কথা কটা লোক মেনে চলে? তাঁরা কি জানতেন না, তাঁদের উপদেশ অসার হয়ে যাবে? যে উপদেশ কার্যকরী হয় না—সে উপদেশের মূল্য কি? তাঁদের সাধনলব্ধ ঐশীশক্তি সমাজ ও সংসারীদের কোন উপকারেই আসেনি—কেন? এখন যাঁরা ওই শ্রেণীর বলে খ্যাতিলাভ করেছেন—তাঁরাই বা কি করছেন? অসাধারণ ঐশী শক্তিসম্পন্ন আপনার গুরুজী তাঁর শক্তি দ্বারা সমাজ ও সংসারীদের জন্যেই বা কি করেছেন?

এ-প্রশ্নে সাধুবাবাকে বিব্রত হতে দেখলাম না। শুনে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। আমিও রইলাম চুপ করে—মুখের দিকে তাকিয়ে। কেটে গেল মিনিট দশেক। এতক্ষণ পর এবার বসলেন সোজা হয়ে। একেবারে সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—বেটা, তুই তো অনেক কথাই বললি। এবার আমি কিছু বলি। সাধন-বলে মানুষ ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিই লাভ করতে পারে—একটা শক্তি ছাড়া। সেটা হলো—জগৎ বা সৃষ্টি-বিষয়ক শক্তি। জগৎ বা সৃষ্টির ধারাকে রোধ বা পরিবর্তন করার শক্তি কোন সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, মহাপুরুষেরই লাভ হয় না। এমনকি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরও নয়। যদিও এঁরা ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিতেই শক্তিমান হতে পারেন। এঁরা সাধনবলে অর্জিত ঐশী শক্তিদ্বারা ক্ষেত্র বা ব্যক্তিবিশেষে কিছু উপকার করতে পারেন। সেটুকুও সাময়িক। তবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে, সমষ্টিগতভাবে সমাজ এবং মানুষের কল্যাণের জন্য কোন কিছুই করা সম্ভব হয় না। কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টি-কারক, সৃষ্টিরোধক বা পরিবর্তক কোন শক্তিই মহাপুরুষের নিজের ইচ্ছাধীনে প্রকটিত হয় না—যতই তিনি ঐশী শক্তিসম্পন্ন হোন না কেন। অসীম শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা হলেও জগৎ বিষয়ে সৃষ্টির ধারাকে রোধ বা পরিবর্তন করে মানুষের জন্য—সমাজের জন্য কিছু করে দেয়ার ক্ষমতা তাঁর নেই। সেইজন্যেই তো কিছু করতে পারেন না। করুণার হৃদয় তাঁদের। কোটি কোটি মানুষের নানা দুঃখ-কষ্ট তাঁরা দেখেছেন—দেখছেন। অথচ ব্যথিত হৃদয়ে নির্বিকার চিত্ত। আসলে বেটা, আসল

ক্ষমতা যে দেননি তিনি। তা দিলে তো ঈশ্বরের কোন অস্তিত্বই থাকে না। ঐশী শক্তিসম্পন্ন সাধক মহাপুরুষদের সম্পর্কে বহুদিনের ক্ষোভ একটা অন্তরে ছিল। এ-কথা শোনার পর তা আর রইলো না। আরও কথা হলো অনেক। সময়ও কেটে গেল অনেকটা। এবার ফিরতে হবে। তাই এখন এলাম আমার মূল প্রশ্নে,

—বাবা, এই জীবনে আসবেন—এমন কথা স্বপ্নেও ভাবেননি কখনও—অথচ এসে গেলেন। এত বছর ধরে কঠোরতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে কি পেলেন এই জীবনে ?

অপলক দৃষ্টি সাধুবাবার। প্রসন্নতায় ভরা মুখমণ্ডল। হাসি ফুটে উঠলো মুখে। মধুর কণ্ঠে বললেন,

—কেন বেটা, এই জীবনটাই তো পেলাম—ক-জনা পায় এমন জীবন!

প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যমূলক। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন মনে হলো। তাই সোজাসুজি বললাম,

—বাবা, আপনার এমন পরমানন্দময় জীবনের কথা ভুল করেও ভাবতে পারি না। সে কথা বলছি না আমি। জানতে চাইছি, কি পেলেন এই জীবনে—ঈশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধিই বা কি হলো আপনার ?

হিমালয়ের তাপস—এখন কথা বলছেন একটা গাছের তলায় বসে—পথের ধারে। যাঁর পরনে একটা টুকরো নোংরা কাপড় ছাড়া সারা অঙ্গে আর কিছুই নেই—নেই পিপাসায় জলপানের প্রয়োজনে ছোট্ট একটা চায়ের ভাড়, ভাঙা কৌটো পর্যন্ত। এখন 'নিঃস্ব' শব্দের প্রতীয়মান অর্থ—যিনি এই সাধুবাবা—বসে আছেন আমার সামনে। তাঁর দীর্ঘজীবনে—পাওয়ার প্রশ্নের নির্লিপ্ত উত্তর,

—চাইলে হয়তো কিছুই পেতাম না—ঈশ্বর সম্পর্কে এই উপলব্ধিই আমার হয়েছে।

এবার শেষ প্রশ্ন করলাম শেষেই,

—ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার শেষ কথা কি ?

উদাসীনভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—বেটা, যে অনন্ত সত্যের শুরুই জানি না—তার শেষ কথা বলবো কেমন করে! ঈশ্বর সম্পর্কে শেষ কথা—একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন।

প্রণাম করলাম। অনুমতি চাইলাম ফিরে আসার। মুখে বললেন—'ঠিক হ্যায় বেটা'। বসে রইলেন সাধুবাবা। কিছুটা চলছি—আবার ফিরে দেখছি পিছনে। দেখছি চেয়ে রয়েছেন তিনিও। আরও কিছুটা—তখনও। এবার দৃষ্টির বাইরে। ভাবতে ভাবতেই চলেছি—সাধুবাবার কথা।

———

নীলপর্বতে—মোক্ষদাদেবী কামাখ্যা

আজ থেকে একুশ বছর আগের কথা। তখন কলেজে পড়ি। কলেজেই একদিন আমার এক সহপাঠি বললো—কামাখ্যায় যাবি? হঠাৎ কথাটা শুনে একটু চমকে উঠলাম। কামাখ্যা—সে তো অনেক দূর! যাবো বললেই তো আর হলো না। দস্তুর মতো টাকা চাই। গাড়ী ভাড়া, থাকা খাওয়ার খরচ—এ-সবই তো লাগবে। গরীবের ছেলে আমি। টাকা কোথায়? দিন চলে না—মাস বত্রিশ অবস্থা। কলেজে অনেক হাতে পায়ে ধরে তবে ফ্রি পড়ার ব্যবস্থা করেছি। এ-সব কথা ভেবে নিলাম এক ঝলক্। তারপর পরিষ্কারভাবে বললাম, যাওয়া হবে না। একটা টাকাও আমার নেই।

বন্ধুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। এতটুকু দেরী না করেই বললো, টাকার কথা একদম ভাবতে হবে না তোকে। আমার পিসেমশাই বদরপুরে থাকেন। এখানে এসেছিলেন বেড়াতে। চলে যাবেন। আমরা তাঁর সঙ্গেই যাবো। পিসতুতদাদা গৌহাটি থেকে পিসেমশাইকে নিয়ে চলে যাবে। আমরা গৌহাটিতে নেমে চলে যাবো কামাখ্যায়। দিন চারেক কামাখ্যায় আর শিলং-এ দু-দিন থেকে চলে আসবো। তোর একটা পয়সাও লাগবে না। সব খরচা আমার। পিসেমশাই আজই যাবেন। গেলে তোকে আজই যেতে হবে।

আর একটা কথাও বললাম না। রাজী হয়ে গেলাম। বাড়ী ফিরে এলাম কলেজ থেকে। চটপট গুছিয়ে নিলাম। বেরিয়ে পড়লাম মাকে প্রণাম করে—শূন্য পকেটে। হাওড়া থেকে ছাড়লো কামরূপ এক্সপ্রেস। এলাম নিউবঙ্গাইগাঁও। ট্রেন বদল করলাম এখানে। তারপর একেবারে সোজা চলে এলাম গৌহাটি। ট্রেন এলো ঘড়ির কাঁটা ধরে—ঠিক সময়ে। এখান থেকে পিসেমশাই চলে গেলেন বদরপুরে। বন্ধু আর আমি রয়ে গেলাম গৌহাটিতে।

স্টেশনের কাছ থেকে বাস ধরলাম সকালে। নেমে গেলাম কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে। জঙ্গলের ভিতর দিয়েই একটা পথ উঠে গেছে উপরে। উঠবো হাঁটা পথেই। চড়াই বেশী—উৎরাই কম। বেশ কিছুটা উপরে উঠেছে—এমন তিন-জনকে দেখলাম নীচের থেকে। আমাদের দুজনেরই বয়েস কম। কামাখ্যা মন্দিরে ওঠার পথটা পরিষ্কার। খাঁজকাটা সিঁড়ির মতো। পথের দু-পাশেই গভীর ঘন জঙ্গল। ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম দুজনে। ভয়েতে গা-টা বেশ ছম্‌ছম্‌ করছে। একটানা ওঠা যায় না। কিছুটা উঠছি—একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। উঠতে লাগলাম এইভাবেই। পায়ে হাঁটা পথ প্রায় দেড় কিলোমিটার। মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছি সাধু-সন্ন্যাসীদের। কেউ বসে আছেন পথের ধারে—কেউ বা গাছতলায়। আমরা দুজনে এগিয়ে চলি···

একুশ বছর পর আজকের কথা। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছাড়লো শিয়ালদা থেকে। সরাসরি যাবে গৌহাটি। এখন আর পথে ট্রেন বদল করতে হয় না কোথাও। সারা দেশের অগ্রগতি হয়েছে। জীবন-ধারণের মানও উন্নত হয়েছে অনেক। বিগত একুশ বছরে যে এ-সব হয়েছে—তা চোখেই দেখতে পাচ্ছি। আর সবকিছুর মতো অগ্রগতি হয়েছে ভারতীয় রেলেও। তবে এ-গতি যমালয়গামী কি না—বলতে পারিনে। এ-টুকু বলতে পারি—নির্দিষ্ট সময় পার হলো একঘণ্টা, দু-ঘণ্টা করে। আমাদের পেটে নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলো কাঞ্চনজঙ্ঘা। অতিরিক্ত প্রায় চার-ঘণ্টা যন্ত্রণাভোগের পর ভূমিষ্ঠ হলাম গৌহাটি প্ল্যাটফরমে। এখনই ইনসেন্টিভ্ কেয়ার ইউনিটে রেখে ডেকাড্রন না দিলে রেল-রুগী বোধ হয় আর বাঁচবে না।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি রিক্সা। আর সব স্টেশনের বাইরে যেমন থাকে—এখানেও তেমন। কাছারি—একটি রাস্তার মোড়ের নাম। নেহেরু পার্কের পাশেই। এখান থেকেই বাস যায় সোজা কামাখ্যা মন্দির। স্টেশন থেকে পথ একটুখানি। হেঁটে গেলে মিনিট সাত আট। একেবারে সোজা পথ। কোন ঘুরপাক নেই। রিক্সাও যায়—তিন চার মিনিটে। শহর মাহাত্ম্য তো আছেই—গৌহাটি, শহর বলে কথা। তাই পথের তুলনায় ভাড়াও একটু বেশী। সঙ্গে দুটো জামা প্যাণ্ট ছাড়া আর কিছুই নেই। ঝাড়া হাত পা। টুকটুক করে হেঁটেই এলাম কাছারিতে।
মোড়েই দাঁড়িয়ে ছিল বাস। কাছারি থেকে কামাখ্যার মধ্যেই যাতায়াত করে। আর যায় না কোথাও। ছোট বাস। উঠে বসলাম বাসে। ধীরে ধীরে ভরে গেল যাত্রীতে। ছাড়লো।
সুন্দর চওড়া রাস্তা। এখান থেকে সোজা চলে গেছে বিমান বন্দরের দিকে। বাস চললো এ-পথ ধরেই। ডানদিকে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র। তার পাশ দিয়েই রাস্তা। শহর গৌহাটির উপর দিয়ে ফ্যান্সিবাজারকে বাঁয়ে রেখে বাস এসে থামলো কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশে। কাছারি থেকে ৭ কি. মি.। রাস্তা এখানে আলাদা হয়ে গেছে। সোজা রাস্তা যেটা—ভি. আই. পি. রোড চলে গেছে—গৌহাটি ইউনিভারসিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিমান বন্দর। ডানদিকে বাস বাঁক নিয়ে ক্রমাগত উঠতে লাগলো পাহাড়ে। চওড়া রাস্তা। একপাশে খাড়া পাহাড়। আর একপাশে খাদ-জঙ্গল। দেখতে দেখতে বাস উঠে এলো কামাখ্যা মন্দিরের কাছে। পাহাড়ে বাস উঠলো ৩ কি.মি.। কাছারি থেকে এই পর্যন্ত মোট ১০ কি.মি.। এলাম মাত্র কুড়ি মিনিটে। গৌহাটি পৌঁছানো মানেই কামাখ্যা পৌঁছানো। কলকাতা থেকে গৌহাটির দূরত্ব ৯৯৬ কি.মি.। রেলের মতে।

কামাখ্যা পাহাড়ে থাকার জন্যে কোন হোটেল বা লজ নেই। আছে কয়েকটা জল-খাবার আর পান বিড়ির দোকান। থাকতে হলে এখানে পাণ্ডাদের বাড়ীতেই

থাকতে হবে—নইলে গৌহাটিতে। অসংখ্য হোটেল আছে সেখানে। হোটেলে থাকলে কামাখ্যা ঘুরে চলে যেতে হবে আবার।
আমরা থাকবো কামাখ্যাতেই। তাই বন্ধু আর আমি উঠলাম এক পাণ্ডার বাড়ীতে। কামাখ্যা মন্দির থেকে পাণ্ডার বাড়ী—মাত্র দুমিনিটের পথ। পরের কথা একটু আগেই বলি। অপূর্ব, অমায়িক ব্যবহার এখানকার পাণ্ডাদের। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন জোর জুলুম নেই এখানে। যাঁর কাছে থাকবেন—তিনিই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। যাত্রীদের সঙ্গে পাণ্ডার ব্যবহার কি রকম হওয়া উচিত—আমার মনে হয়, ভারতের সমস্ত তীর্থের ধান্দাবাজ পাণ্ডা যারা—তাদের অন্তত একবার কামাখ্যা পাণ্ডাদের ব্যবহার দেখে আসা উচিত।
বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠানের কথা বাদ দিলে তেমন কোন কোলাহল নেই কামাখ্যা পাহাড়ে। এখানে যাদের বাড়ীঘর দেখছি—তা প্রায় সবই পাণ্ডাদের। বংশানুক্রমে বসবাস এদের। মনিহারী দ্রব্যের দোকান মাত্র কয়েকটা। বিক্রি হচ্ছে কামাখ্যার ফটো, মালা—এইসব। কোন হোটেল বা লজ নেই বলেই এখানকার পরিবেশটা এত সুন্দর।

একটু বিশ্রামের পর দু-বন্ধু বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। কামাখ্যা মন্দির চত্বরেই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। ভিতরে ঢুকলাম। কোন মূর্তি নেই। পীঠস্থান যেমন হয়—তেমনই।
সমতল থেকে ৫২৫ ফুট উচ্চতায় দেবীকামাখ্যার মন্দির। চারদিক লম্বা পাঁচিলে ঘেরা। এই মন্দিরের প্রবেশদ্বার দুটি। দুটিই সিংহদ্বার। প্রথমটির থেকে বিশ পঁচিশ পা এগোলেই দ্বিতীয় দ্বার। প্রথম দ্বারের পাশেই বিস্তৃত নাটমন্দির। নেমে এসেছে সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই হাতির পিঠে বিশ্বকর্মার মূর্তি। নিখুঁত নয়—ভাঙা। প্রাচীনত্বের ছাপ রয়েছে সর্বাঙ্গে। প্রবাদ আছে, প্রাচীনকালে কামাখ্যা মন্দির নিজ হাতে নির্মাণ করেছেন বিশ্বকর্মা নিজেই। তাই তাঁরই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে তাঁরই মূর্তি।
দ্বিতীয় দ্বারের কাছাকাছি রয়েছে একটি শ্মশান। শুধুমাত্র স্থানীয় পাণ্ডাদের কারও মৃত্যু হলে তাকেই দাহ করা হয় এই শ্মশানে।
শক্তিপীঠ কামাখ্যা—তন্ত্রসাধন ক্ষেত্র। মন্দিরের সমস্ত কাজই সম্পন্ন হয় তন্ত্রমতে। তন্ত্রের যন্ত্রমের উপরেই নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণ মন্দিরটি। পণ্ডিতদের পরামর্শে তন্ত্রের নিয়ম মেনেই আজকের মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন কুচবিহারের রাজা।
একটু লম্বা ডিম্বাকৃতি গোলাকার মন্দির। উপরে পর পর চূড়া রয়েছে সাতটি। মূল মন্দির—ঠিক যেটির নীচে দেবী কামাখ্যার মূলপীঠ—সেটির চূড়ায় আছে তিনটি সোনার কলস। তার উপরে ত্রিশূল। সেটিও সোনার। কলসগুলি বসানো রয়েছে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। চূড়ার এই অংশটির নীচেই—মন্দিরের ভিতরে আছে কামাখ্যাদেবীর প্রতিনিধি মূর্তি। মন্দিরের পরের অংশের

চূড়াগুলিতে সোনা নেই।

মূল মন্দিরের বাইরে—দেয়ালের গায়ে, দু-কোণে রয়েছে দেবী সরস্বতী আর গণেশের মূর্তি। নীচে আছে নৃত্যরতা চব্বিশটি যোগিনীর মূর্তি—ছোট ছোট। যার উপরে গড়ে তোলা হয়েছে মন্দির। সারা দেয়ালে বড় মূর্তি আছে মোট চব্বিশটি। তার মধ্যে গোঁফদাড়িয়ালা শিব (এটাই শাস্ত্রসম্মত), নারায়ণ এবং রামচন্দ্রের মূর্তিও আছে। বড় মূর্তিগুলিকে রাগ এবং ছোটগুলিকে বলা হয় রাগিনী।

যাত্রীদের অধিকাংশই মন্দিরে প্রবেশ করেন প্রথম সিংহদ্বার দিয়ে। আমরাও কবলাম প্রথমটি দিয়ে। দরজার দু-পাশের দেয়ালে আছে দ্বাররক্ষী দুটি মূর্তি—নন্দী ভৃঙ্গী। মন্দিরের গায়েই একটি অলিন্দ। তার মধ্যে খোদিত মূর্তিটি শংকরাচার্যের। মঙ্গলচণ্ডী, কল্কীঅবতার, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, বটুক ভৈরব, ভোগের ঘরে সত্যনারায়ণ, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ, রাজভ্রাতা চিলা রায, দেবী অন্নপূর্ণা, দ্রোণাচার্য্য, নীলকণ্ঠ মহাদেব, কপিলমুনি, মনসাদেবী এবং জরৎকারু মুনির মূর্তি খোদিত আছে মন্দিরের দেয়ালে—চারপাশে। ভিতরে ঢুকলে প্রথম ভাগেই দেখা যায় এগুলি।

মন্দিরের প্রথম অংশেই স্থাপিত আছে পাথরে খোদিত পঞ্চরত্নের সিংহাসন। তার উপরে দেবী দুর্গার দশভুজামূর্তি—অষ্টধাতুতে নির্মিত। এটি দেবী কামাখ্যার প্রতিনিধি মূর্তি। কামেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। শিব এখানে কামেশ্বর। পূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় এখানেই। কারণ মূল গর্ভমন্দিরে কোন মূর্তি নেই। দেবী কামাখ্যা এখানে শিলাময়ী। প্রতিনিধি মূর্তিটিকে ভোগ মূর্তিও বলা হয়। প্রথমে এই মূর্তি দর্শন করে পরে যাত্রীরা যান গর্ভমন্দিরে—মহামুদ্রা যোনি পীঠে।

দশভুজার মূর্তিটি যেখানে স্থাপিত আছে—সেখানে, উপরের ছাদটি বারোটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সামনেই নাট-মন্দির—দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয় এখানে। আছে হাড়িকাঠ। এগুলি সব মন্দিরের প্রথমাংশেই।

ভোগমূর্তির পিছনেই রয়েছে একটি দরজা। দশটি সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম নীচে। এটি দেবী কামাখ্যার গর্ভমন্দির। এখানেই দেবীর যোনিপীঠ। ক্ষেত্রটি চৌবাচ্চার মতো বাঁধানো। লম্বায় পাঁচ ছ-ফুট হবে। পাথরের প্রসারিত পীঠস্থান। একপাশ রুপো দিয়ে মোড়া। দেবী অঙ্গ—মাতৃঅঙ্গও বটে। তাই যোনিপীঠের শিলার উপর ঢাকা দেয়া রয়েছে একটি কাপড়। তার উপর বসানো আছে একটি সোনার মুকুট। ফুল আর মালা দিয়ে সাজানো। এর একপাশে খোলা থাকে একটু জায়গা—যাত্রীদের জন্য। যাতে দর্শন এবং স্পর্শ করতে পারে। দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রীদের আনা দ্রব্যসামগ্রী ও ভোগ নিবেদিত হয় এখানে।

মহামুদ্রা এই যোনিপীঠে হাত দিলে পরিষ্কার বোঝা যায়—সামান্য উঁচু এবং ফাটা। নারীর যোনিদেশ যেমন হয়—প্রস্তুরীভূত পীঠটিও ঠিক তেমন। ভিতর থেকে জল

উঠছে চুইয়ে চুইয়ে, অবিরত—শত শত বছর ধরে। এই জল বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। পড়ছে একটি কুণ্ডে। ব্যবহার করা হয় পবিত্র চরণামৃত হিসাবে।
যোগিণীতন্ত্রের একাদশ পটলে উল্লিখিত হয়েছে, মহামুদ্রা এই যোনিপীঠ দর্শন, স্পর্শ এবং জলস্বরূপ চরণামৃত পান করলে মানুষ মুক্ত হতে পারে দেবঋণ, পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ থেকে।

পৃথিবী রজঃস্বলা হন আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর যোগে। এই যোগে দেবীর মন্দির বন্ধ থাকে তিনদিন। খোলা হয় চারদিনের দিন। মন্দির খোলার পর প্রথমেই সমাপন করা হয় দেবীর স্নান এবং পূজাদি। তারপর পীঠস্থান দর্শন করেন দর্শনার্থীরা।
প্রবাদ আছে, অম্বুবাচীর এই যোগে তিনদিন চুইয়ে ওঠা জলধারার রঙ থাকে রক্তবর্ণ। যোনিপীঠের উপরে ঢাকা দেয়া বস্ত্র তখন লাল হয়ে যায়। লোক বিশ্বাস, সমস্ত কাজেই সিদ্ধিলাভ হয় এই রক্তবস্ত্র সঙ্গে থাকলে।
অম্বুবাচীর এই উৎসব উপলক্ষ্যে দূর-দূরান্তর থেকে আসে অগণিত তীর্থযাত্রী—বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী। উৎসব চলে মহা ধুমধামের সঙ্গে। তখন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র মন্দির-প্রাঙ্গণ।
মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের পরিসর স্বল্প। বিদ্যুতের আলো বাইরে আছে—ভিতরে নেই। অন্ধকারময় এই গর্ভগৃহে জ্বলছে শুধু প্রদীপের আলো। এতে মন্দিরের পরিবেশ হয়ে উঠেছে ভাবগম্ভীর। গর্ভগৃহের চারকোণে—দেয়ালে খোদিত ভৈরব মূর্তি আছে চারটি। আলো কম। তাই স্পষ্ট বোঝা গেল না। পূজারী বললেন, এরা চারজন এই গর্ভগৃহের রক্ষী। একদা দেবী কামাখ্যার প্রথম পূজারী ছিলেন কেন্দুকেলাই। তাঁরও একটি মূর্তি খোদিত আছে গর্ভমন্দিরের দেয়ালে।
দেবী কামাখ্যার মূলপীঠের পাশেই বাঁধানো আছে আরও একটি ক্ষেত্র। মূল যোনিপীঠের মতোই—কাপড়ে ঢাকা। দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অবস্থান এখানে—জানালেন পূজারী।
কথিত আছে, সমগ্র কামাখ্যা পাহাড়েই দেবী বিরাজমানা। তাই এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এত বেশী যে, দীক্ষিত ব্যক্তি কামাখ্যা পীঠের যে-কোন স্থানে নিজ ইষ্টমন্ত্র ১০ বার জপ করিলে ১০৮ বার জপের এবং ১০৮ বার জপ করলে পুরশ্চরণের ফললাভ করেন। মন্ত্রসিদ্ধি হয় এক লক্ষ বার জপ করলে।
গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এলাম মন্দিরের মধ্যভাগে। মাঝামাঝি জায়গায় দরজা আছে একটি। এখান থেকে মন্দিরে দ্বিতীয় সিংহদ্বার পর্যন্ত ফাঁকা চাতালের মতো নাটমন্দির। তীর্থযাত্রীরা এখানেই সম্পন্ন করে থাকেন তীর্থের কাজ, কুমারীপূজা, জপ-ধ্যান।
এই নাটমন্দিরের দেয়ালেও খোদিত আছে নানা দেবদেবী এবং অর্জুনের লক্ষ্যভেদ মূর্তি।

দরজার বাঁদিকে কুড়িটি হাত বিশিষ্ট দুর্গা এবং ডানদিকে দশভুজার মূর্তি। কিছু মূর্তি আছে—যার পরিচয় পাওয়া যায় না। এরই এক কোণে রয়েছে দেবী চামুণ্ডার বিগ্রহ। দেখলেই বোঝা যায়, বহুকালের প্রাচীন। অস্পষ্ট। সর্বাঙ্গে সিঁদুর মাখানো। এই বিগ্রহের পাশেই একদা আসন করে বসেছিলেন আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামঠাকুর। পাথরের একটি ফলকে লেখা আছে এখানে,

"মহাতীর্থ এই মাতৃপীঠে এক পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে পরমাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সহিত তদীয় গুরুদেবের মহামিলন সংঘটিত হয়।

যাঁহারা এই কাহিনী শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেন তদীয় "আমার জীবন" গ্রন্থে এবং অধ্যাপক ৺ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত "বেদবাণী"তে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মহামিলনের স্মারক এই ফলক কৈবল্যনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত ধামসমূহের চতুর্থ মোহন্ত শ্রীমৎ ভবতোষ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক কামাখ্যা পীঠের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মহামিলনস্থলে স্থাপিত হইল।"

একদা মহামুদ্রা এই মাতৃপীঠে গুরু এবং দীক্ষালাভ হয়েছিল বরেণ্যসাধক রামঠাকুরের। সেদিন মহাসমারোহে চলেছে অম্বুবাচী উৎসব। হাজার হাজার পুণ্যলোভী ভক্ত, নরনারী—এসেছেন দূর-দূরান্তর থেকে। সারা কামাখ্যা পাহাড় স্পন্দিত হয়েছে ভক্তপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের আনন্দমুখর কোলাহলে। এই উৎসবে সাধু-সন্ন্যাসী, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াবান তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, যোগী, মহাপুরুষ—তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। এঁরা রয়েছেন প্রচ্ছন্নভাবে। মহাশক্তির চরণতলে করবেন আত্মনিবেদন। উৎসব শেষে বেরিয়ে পড়বেন আপন সাধনার পথ ও তীর্থ পরিভ্রমণে।

রামঠাকুর তখন বয়সে একেবারেই বালক—রামচন্দ্র। তিনিও এসেছেন এই উৎসবে। গা ভাসিয়ে দিয়েছেন জনস্রোতে। সঙ্গে সাথীও জুটেছিল কয়েকজন। একসঙ্গে কেটেছে কয়েকদিন। আজকের এই ভীড়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে তারা—তা জানেন না রাম। অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাননি তাদের।

অম্বুবাচীর নিবৃত্তি হলো আজই। বন্ধ মন্দিরের দরজা খুললো। পুজো দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন পুণ্যার্থী নরনারীরা। ভীড়ের ভাঙন ধরলো মন্দির চত্বরে। ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেল আশপাশের বৃক্ষতল—যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন অনেকে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজেদের ডেরাডাণ্ডা উঠাতে।

বিষন্ন মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন বালক। কখনও মন্দির চত্বরে—কখনও পাহাড়ী পথের এখানে ওখানে। আজ সারাটা দিনই কেটেছে উপবাসে। আহার জোটেনি রাতটুকু। রাতটুকুও কাটবে হয়তো দিনের মতো।

রাত গভীর হলো—ধীরে ধীরে। অভুক্ত রাম বড় ক্লান্ত হলেন। অবসন্ন হলো দেহমন। আজ আর কিছু জুটলো না কপালে।

কামাখ্যা মন্দিরের ভিতরে নাটমন্দিরের চত্বর। কুমারী পুজো হয় তারই কোণে

কোণে। সারাদিনের অজস্র ফুল আর বেলপাতা পড়ে আছে সেখানে। চামুণ্ডা মূর্তির পাশে একটু জায়গা পরিষ্কার করলেন রাম। তারপর বসলেন জপ-ধ্যানে।

রাত আরও গভীর হলো। গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে রয়েছে পাহাড়ের আর সকলে। একা জেগে বসে আছেন বালক রাম। হঠাৎ তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন এক জটাজুট সন্ন্যাসী। দীর্ঘদেহ—সুন্দর সুঠাম। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। আজানুলম্বিত বাহু। দেহ থেকে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ আলোয় ভরে উঠলো নাটমন্দিরের চত্বর।

এ সন্ন্যাসীর মূর্তি রামের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। মাত্র কয়েক বৎসর আগেই স্বপ্নে দেখেন এই সন্ন্যাসীকে। স্বপ্নেই দিয়ে গেছেন বীজমন্ত্র। সেই মন্ত্রই জপ করে এসেছেন এতদিন। চৈতন্যময় মন্ত্র। তাই ঘরে মন বসেনি রামের। স্বপ্নলব্ধ গুরুব খোঁজেই বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। অথচ সকলেই জানে—রাম বেরিয়েছে কর্মের সন্ধানে।

জীবনের একমাত্র পরমাশ্রয় আজ সামনে—দাঁড়িয়ে। এতদিন যাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছেন পথে প্রান্তরে। মুহূর্ত দেরী করলেন না বালক। জড়িয়ে ধরলেন মহাপুরুষেব চরণদুটি।

সন্ন্যাসীর ইসারায় উঠে দাঁড়ালেন। বেরিয়ে এলেন নাটমন্দির থেকে। তারপব আঁকাবাঁকা পথে সন্ন্যাসী চলেছেন আগে—পিছনে বালক রাম।

বর্ষণক্লান্ত আষাঢ়ের আকাশ। ভাঙা মেঘের ফাঁকে এক টুকরো চাঁদ। গভীর ঘন জঙ্গল। হালকা জ্যোৎস্নায় ভরা বনপথ। পাকদণ্ডীর পথে এলেন দেবী ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সামনে। পাহাড়ের সানুদেশ স্পর্শ করেই বয়ে চলেছে উত্তাল ব্রহ্মপুত্র।

আরও একটু এগিয়ে গেলেন দুজনে। সামনেই পড়লো আর একটি পাহাড়ের চড়াই। রামকে অনুসরণ করতে বললেন সন্ন্যাসী। এবার জঙ্গলের মধ্যেই দেখা গেল একটি গুহা। প্রবেশ করলেন মহাপুরুষ—সঙ্গে রাম। তারপর প্রদীপ জ্বালালেন চকমকি ঠুকে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছেন বালক। বিশ্রামের পর দুটি ফল খেতে দিলেন মহাপুরুষ। তারপর তৃণ শয্যায় শোয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, বেটা, তুমি যে আসবে তা আমি জানতাম। তাই তোমার আহার ও শয্যার ব্যবস্থা করেই রেখেছিলাম।

ভোরের হাল্কা আলো ফুটে উঠেছে আকাশে। মহাপুরুষ ডেকে তুললেন রামকে। স্নান সেরে আসতে বললেন ব্রহ্মপুত্র থেকে। আনন্দে বিহ্বল-চিত্ত রাম। বনপথ দিয়ে সোজা নেমে গেলেন ব্রহ্মপুত্র নদে। স্নান সেরে ফিরে এলেন পর্বত গুহায়।

অনুষ্ঠান করে দীক্ষা দিলেন সন্ন্যাসী। অবাক হলেন রাম। সেই একই মন্ত্র—

স্বপ্নে যে মন্ত্র পেয়েছিলেন তিনি। স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র উচ্ছিষ্ট না হলে ইষ্টলাভ হয় না। আজকের এই আনুষ্ঠানিক দীক্ষা সেইজন্যেই।
কামাখ্যা পাহাড়ে সেদিনের দীক্ষা বালক রামের জীবনে এনে দিল এক অকল্পনীয় পরিবর্তন। ধীরে ধীরে স্ফুরণ ঘটলো অধ্যাত্ম-শক্তির। মহাশক্তিধর সাধক রাম ব্রহ্মজ্ঞরূপে পরিচিত হয়ে উঠলেন সারা ভারতের অধ্যাত্ম সমাজে। লোকপূজ্য হলেন শ্রীরামঠাকুর নামে।

আবার আসি মন্দিরের কথায়। অশ্বমুখ আর গোমুখ নামে দুটি গন্ধর্বের মূর্তি আছে নাটমন্দিরের বাইরের দেয়ালে। মূল মন্দিরের বাঁ দিকে—বাইরে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং ডানদিকে রয়েছে অষ্টভুজা কালীমূর্তি। ঘণ্টার কাছে আছে চক্রভৈরবের মূর্তি।
কামাখ্যা মন্দিরের সামনেই রয়েছে সৌভাগ্যকুণ্ড। দলে দলে তীর্থযাত্রীরা স্নান-তর্পণ করেন এখানে। পরে পূজা দেন মন্দিরের গর্ভগৃহে। ভক্তকণ্ঠে কামাখ্যা মায়ের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ-বাতাস। অপূর্ব এক প্রাণচঞ্চলতা জেগে ওঠে সমগ্র পাহাড়ের নিরেট বুকে—বৃক্ষলতাদিতে।
সৌভাগ্যকুণ্ড দেবী কামাখ্যার ক্রীড়া পুষ্করিণী। বাঁধানো ঘাটে—টিনের চালা। ইটের পাঁচিল দিয়ে দু-ভাগে ভাগ করা আছে কুণ্ডটি। এটি করেছেন দ্বারভাঙার মহারাজা। একটি ভাগ সাধারণ মানুষ আর তীর্থযাত্রীদের স্নানের জন্য। অপরটির জল দেবীর স্নান, ভোগ, পূজা ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য। সিঁড়ি দিয়ে নামতে এই কুণ্ডের ডানপাশে রয়েছে গণেশের বিগ্রহ। সিঁদুর রাঙানো। যাত্রীদের অনেকে পারলৌকিক ক্রিয়াদিও সম্পন্ন করে থাকেন এখানে। কুণ্ডটি দেবরাজ ইন্দ্রের কীর্তি বলে কিংবদন্তী আছে।
এই কুণ্ডের জল কখনও শুকোয় না। এর ভিতরে পাঁচটি ধারায় জল আসে পাথর ফুঁড়ে। এটি ছাড়াও আছে আরও কয়েকটি কুণ্ড। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কাছে গয়াকুণ্ড, ব্রকেশ্বর শিব মন্দিরের কাছে দুর্গাকুণ্ড, শঙ্খেশ্বরী মন্দিরের কাছে অমৃতকুণ্ড। স্কুলের পিছনে আছে ঋণমোচন কুণ্ড। সৌভাগ্য-কুণ্ড ছাড়া আর কোন কুণ্ডেই যাত্রীদের যেতে বা স্নান করতে দেখা যায় না।
কামাখ্যা পাহাড়েই রয়েছে মহাদেবের পঞ্চপীঠ। কামাখ্যা মন্দিরের পূর্বদিকে কামেশ্বর শিব। মন্দির-মধ্যে আছে একটি কুণ্ড—কামকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। কামেশ্বরের পূর্বে সিদ্ধেশ্বর শিব, উত্তরে তৎপুরুষ শিব নামে কোটি শিব লিঙ্গ, ভৈরবী মন্দিরের ভিতরে হেরুক ভৈরব—অঘোরনাথ শিব এবং কামাখ্যা মন্দিরের পশ্চিমে দুর্গাকূপের কাছে প্রতিষ্ঠিত আছে আম্রাতকেশ্বর শিব। এরই কাছে বয়ে চলেছে সিদ্ধগঙ্গা নামে একটি জলধারা।
বিশাল বিস্তৃত এলাকা নিয়ে কামাখ্যা নয়। এখানে কয়েকদিন থেকে—দেখে নেয়া যায় সবকিছু। আবার ঘণ্টা চার পাঁচেক হাতে নিয়ে গেলেও মোটামুটি সবকিছু

দেখতে অসুবিধে হয় না। তবে পাহাড়ী জায়গা। অল্প ঘোরাঘুরিতেও ক্লান্তি আসে তাড়াতাড়ি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যেভরা প্রাচীন তীর্থ এই কামাখ্যা। কামরূপ জেলার অন্তর্গত। তন্ত্রসাধনার সিদ্ধ-পীঠ। প্রাচীন-কাল থেকেই তন্ত্রের মারণ, উচাটন ও বশীকরণের ক্ষেত্র বলে কথিত। বহুকাল ধরেই একটি জনশ্রুতি আছে—পুরুষেরা কামাখ্যায় গেলে অনেকেই আর ফেরে না। ভেড়া বানিয়ে রাখে। এ-কথা অনেকাংশে সত্য। তবে মন্ত্রের সাহায্যে—বশীকরণ করে নয়। আসাম পার্বত্য প্রদেশের অধিকাংশ মেয়েদের গায়ের রঙ যেমন সুন্দর—তেমনই সুন্দরী। কামাখ্যার বেশীরভাগ মেয়েরাও এ-থেকে বাদ নয়। অসম্ভব পরিশ্রমীও। বহুপূর্বে—এখানে, এই কামাখ্যায় এলে তাদের অসাধারণ রূপের আকর্ষণে আকর্ষিত এবং বশীভূত হতো অনেক পুরুষই। ফলে অনেকক্ষেত্রে অনেক ভবঘুরে বা সাধারণ যাত্রী আর বাড়ী ফিরতো না। রয়ে যেত। যে কোনভাবে তাদের অনুগ্রহলাভ করে—তাদের উপরেই নির্ভর করে চলতো। অনেক সময়েই গড়ে তুলতো সংসার জীবন। এ-সবক্ষেত্রে পুরুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই থাকতো না এদের কাছে। স্ত্রী পরিচালিত পুরুষদের স্ত্রৈন অর্থাৎ ভেড়া বলা হয়। এখানে এসে যেসব পুরুষ আর ফিরতো না—তারা ওই ভাবেই কাটাতো তাদের জীবন। এমন ঘটনা কদাচিৎ কিছু পুরুষের জীবনে কখনও ঘটে থাকতে পারে। এখনও সেই ধারণাই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—অনেকে। এটাই কামাখ্যায় পুরুষের ভেড়া হওয়ার মূল রহস্য।
শুধু কামাখ্যায় কেন—সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশে, এমন কোটি কোটি ভেড়া ঘুরে বেড়ায় আজও। যেমন, অনেকক্ষেত্রে সুন্দরী স্ত্রীর কাছে স্বামী থাকে ভেড়া হয়ে। পুরুষ ভেড়া হয়ে থাকে স্ত্রীর বাপের বাড়ীর সম্পত্তির লোভে। বদরাগী স্ত্রীর কাছে শান্ত স্বামীও ভেড়া হয়ে যায় অশান্তির ভয়ে। চরিত্রহীনা স্ত্রী—আত্ম ও সামাজিক সম্মান এবং লোক-লজ্জার ভয়ে ভেড়া হয়ে যায় স্বামী। পারিবারিক শান্তি ও অখণ্ডতা বজায় রাখতে অনেক জাঁদরেল স্বামীও ভেড়া হয়। উপার্জনশীলা স্ত্রীর কাছে অক্ষম আর্থিক দুর্বল স্বামী, আর সর্বোৎকৃষ্ট ভেড়া বনে যায়—যারা মোটা টাকা পণ নিয়ে বিয়ে কিংবা স্ত্রীর বাপের বাড়ীর সম্পত্তিভোগ করে—নিজের মুরোদে না করে। এ-সব কোন মন্ত্রে বা বশীকরণে হয় না। সুতরাং একক্কালে কামাখ্যায় ভেড়া বানানোর কথাটা সত্য—অন্যভাবে।
যাইহোক, কাছারি থেকে কামাখ্যা আসার পথে—একটা মাত্র বাসস্টপ। ডান দিকেই খেয়া ঘাট। এখান থেকে নৌকায় পার হলেই—উমানন্দ। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যেই ছোট্ট একটি দ্বীপ। নাম—পীকক আইল্যান্ড। পার হলাম নৌকায়। ছোট্ট একটি শিব মন্দির আছে এখানে। উঠতে হয় কিছু সিঁড়ি ভেঙে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ—উমানন্দ। সমস্ত শক্তি পীঠেই শক্তির অবস্থান—সঙ্গে ভৈরবরূপী শিবেরও।

তাই এখানে দেবী কামাখ্যার ভৈরব—উমানন্দের অবস্থান। এখানে মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে। পৌরাণিক মতে, এই দ্বীপের প্রাচীন নাম ভস্মাচল। শিবের রোষে কামদেব ভস্মীভূত হয়েছিলেন এখানে। খুব অল্প সময়ই লাগে এটি দেখতে। রাত্রে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রয়োজনও হয় না।

কামাখ্যা—পৌরাণিক ও অতীত

কামরূপের কথা আছে বিভিন্ন তন্ত্র-গ্রন্থে। আর আছে কালিকা-পুরাণ, মহাভারতেও। কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। মহাভারতের বনপর্ব থেকেই জানা গেছে এ-কথা। একদা এইক্ষেত্রে বসেই নক্ষত্রাদি গণনা এবং বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি করেছিলেন ব্রহ্মা—তাই নাম হয়েছে এর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।
কামরূপ নাম হওয়ার বিষয়ে কালিকা পুরাণের ৫১ অধ্যায়ে সুন্দর একটি কাহিনী আছে।
দক্ষরাজের যজ্ঞভূমিতে দেহত্যাগ করলেন সতী। পরে সে দেহ খণ্ডিত হলো বিষ্ণু-চক্রে। প্রায় পাগল হলেন মহাদেব—সতী বিরহে। চলে গেলেন দুর্গম হিমালয়ে। অনাহারে থেকে আত্মমগ্ন হলেন ঘোর তপস্যায়।
এদিকে দেহত্যাগের পর সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ করলেন গিরিরাজের গৃহে—মেনকার গর্ভে। নাম হলো সতীর—গিরিজা, পাবর্তী।
তারকাসুর নামে এক অসুর তপস্যা করলেন ব্রহ্মার। প্রীত ও প্রসন্ন ব্রহ্মা বর দিলেন অসুরকে, একমাত্র মহাদেবের ঔরসজাত সন্তান ছাড়া কেউই বধ করতে পারবে না তাকে। ব্রহ্মার বলে বলীয়ান হলেন অসুর। শুরু করলেন অত্যাচার। দেবতা মানুষ—সকলেই হয়ে উঠলেন অতিষ্ঠ।
এই সময় ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা শরণাপন্ন হলেন ব্রহ্মার। চিন্তিত হলেন তিনি। ভেবে দেখলেন, তারকাসুরকে বধের জন্য মহাদেবের সংসারী হওয়া প্রয়োজন। তাঁর বীর্য হতে উৎপন্ন সন্তান ছাড়া কিছুতেই বধ করা যাবে না অসুরকে।
ইতিমধ্যে নারদ জানতে পারলেন পার্বতীর কথা। সতী আবার জন্ম নিয়েছেন গিরিরাজের গৃহে। মহাদেব এবং তারকাসুরের সমস্ত বিষয় জানিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন নারদ। রাজী হলেন গিরিরাজ, পত্নী মেনকাও। এ-সংবাদে আনন্দিত হলেন দেবতারা।
এরপর নারদের পরামর্শে মহাদেবের তপস্যাক্ষেত্রে যান পার্বতী। সেবা, পরিচর্য্যা করেন প্রতিদিন। ধ্যানমগ্ন থাকেন মহাদেব। এইভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন।
উপায় না দেখে ব্রহ্মা এবার পরামর্শ দিলেন দেবতাদের। পরামর্শ মতো দেবতারা সকলেই গেলেন ইন্দ্রের কাছে। দেবরাজ শরণাপন্ন হলেন কামদেবের। অনুরোধ

রক্ষা করলেন তিনি। গেলেন মহাদেবের তপস্যাক্ষেত্রে—সঙ্গে পত্নী রতিদেবীও। কামদেব নিক্ষেপ করলেন ফুলশর। এ-শরে দেহ-মন হয় কাম জর্জরিত। মুহূর্তেই ধ্যানভঙ্গ হলো মহাদেবের। ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলেন না তিনি। তৃতীয় নয়নের আগুনে ভস্মস্তূপে পরিণত হলেন কামদেব।

এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিষাদগ্রস্থ হলেন পার্বতী—দেবতারাও। তখন সকলে কথা দিলেন রতিদেবীকে, ক্রোধ উপশম হলেই তাঁর স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন মহাদেব। এবপর ক্রমে শান্ত হলেন মহাদেব। দেখলেন, পার্বতী দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। চিনতে পারলেন পূর্ব-সতী—পার্বতীকে। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠলো মুখমণ্ডল। অভিমানে চলে গেলেন তপস্যাস্থল পরিত্যাগ করে।

পার্বতীও ছাড়ার পাত্রী নন। এবার মহাদেবকে লাভ করার জন্য তিনিও ব্রতী হলেন কঠোর তপস্যায়। সিদ্ধিলাভ করলেন অচিরেই। ব্রহ্মচারীর বেশে দেখা দিলেন মহাদেব। বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন পার্বতীকে।

বিবাহের দিন ঠিক করলেন নারদ। নির্ধারিত দিনে বিবাহ আসরে একে একে উপস্থিত হলেন সমস্ত দেবদেবীরা। প্রাচীন ঋষিরাও বাদ গেলেন না এই অনুষ্ঠানে। এসেছেন দুঃখিনী রতিও।

মহাদেবও বসে আছেন আসরে। শোকবিহ্বলা রতি। কামদেবের ভস্ম নিয়ে উপস্থিত হলেন সামনে। কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। বিষাদের ছায়া নেমে এলো সারা বিবাহ-আসরে।

স্বয়ং বিষ্ণু ছাড়াও অন্যান্য দেবতারা অনুরোধ করলেন কামদেবের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। হৃদয়ব্যথিত হলো মহাদেবের। করুণা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ভস্মরাশিতে। পুনরায় আবির্ভূত হলেন কামদেব। মহাদেবের অনুগ্রহে রতি ফিরে পেলেন তাঁর স্বামীকে।

তবুও রয়ে গেল একটু অস্বস্তি। জীবন ফিরে পেলেও কামদেব পেলেন না পূর্বের স্বরূপ। তখন দুজনেই স্তুতি এবং প্রার্থনা করলেন স্বরূপের জন্য। প্রসন্ন হলেন মহাদেব। নির্দেশ দিয়ে বললেন, নীলাচল নামে একটি পর্বত আছে ভারতবর্ষের ঈশান কোণে। সতীর যোনিমুদ্রা পড়ে গুপ্ত আছেন সেখানে। ওই পর্বতে গিয়ে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও মহিমা প্রচার করলে তবেই ফিরে পাবে পূর্বের রূপ।

অনুষ্ঠান শেষ হলো। দেরী করলেন না কামদেব, রতিদেবী। মহাদেবের নির্দেশে এলেন নীলপর্বতে। স্তব স্তুতি এবং পূজাদি করলেন যোনিপীঠে। প্রীত হলেন মহামায়া কামাখ্যা। পূর্বস্বরূপ ফিরিয়ে দিলেন কামদেবের। নীলপর্বতে কামদেব ফিরে পেলেন তাঁর পূর্ব-রূপ, তাই ক্ষেত্রটির নাম হলো—কামরূপ।

ক্রমেই দেবীর মাহাত্ম্য-কথা প্রচারিত হলো তিন-লোকে। স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা হলো কামদেবের। আহ্বান করলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে। পাথর দিয়ে নির্মাণ করলেন দেবী কামাখ্যার মন্দির। ছদ্মবেশেই এ-কাজ সমাপ্ত করলেন বিশ্বকর্মা। 'আনন্দাখ্য মন্দির' নামে মর্ত্যলোকে প্রচার করলেন কামদেব।

কথিত আছে, পুরাকালে অনেক তীর্থ ছিল এই কামরূপে। অধিকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে কালের প্রভাবে। কিছু বিলীন হয়েছে ব্রহ্মপুত্র-গর্ভে। বহু ঋষি, যোগী, মহাপুরুষ এবং তপস্বীদের তপস্যাক্ষেত্র এই কামরূপ—কামাখ্যায়। পৌরাণিক কাহিনী-সূত্রে জানা যায়, মহামুনি বশিষ্ঠদেব, গোকর্ণ এবং কপিলমুনির আশ্রম ছিল এই কামরূপে।

যোগিনীতন্ত্রে কামরূপ দেশটিকে ভাগ করা হয়েছে চারভাগে। কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণ বা ভদ্রপীঠ এবং সৌমার পীঠ। বর্তমানে দেবী কামাখ্যা যেখানে প্রতিষ্ঠিতা আছেন—সেটিই পুরাকালে কামপীঠ নামে অভিহিত ছিল। ব্যাঘ্রদ্বার, হনুমন্ত-দ্বার, স্বর্গদ্বার এবং সিংহদ্বার—এই চারটি সিঁড়ি পথ নিয়েই কামাখ্যা পাহাড়। পৌরাণিক মতে, বরাহরূপী নারায়ণের ঔরসে নরকাসুরের জন্ম হয় ধরিত্রীর গর্ভে। একদা এই পাহাড়ে ওঠার সিঁড়িগুলি নির্মাণ করেন তিনি।

কামরূপে মহামুদ্রা যোনিদেশ যে স্থানটিতে পড়েছিল—তার নাম কুব্জিকা পীঠ। মহামায়া সতীও বিলীন হন সেই স্থানটিতে। এই পর্বতে সতীর যোনিদেশ পড়ায়, পর্বতের বর্ণ হয় নীল—তাই কামাখ্যা পাহাড়ের আরও একটি নাম নীলাচল বা নীলপর্বত।

সতীর যোনিমণ্ডল এই পর্বতে পড়ে তা পরিণত হয়েছে শিলায়। শিলায়িত যোনিতেই বিরাজ করছেন দেবী কামাখ্যা। এটির স্পর্শেও মানুষের মোক্ষলাভ হয়। আরও অনেক দেবদেবী অবস্থান করছেন এই পর্বতে। তবে নীলাচলে যোনিমণ্ডল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর কোথাও নেই। এ-সব কথা উল্লিখিত হয়েছে কালিকা-পুরাণের ৬২ তম অধ্যায়ে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে, মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে মহাযোগস্থল—যেখানে পড়েছিল সতীর যোনিদেশ। সমস্ত তীর্থের মধ্যে এটি তীর্থচূড়ামণি। এই ক্ষেত্রটির অধিষ্ঠাত্রীদেবী তথা ভৈরবী স্বয়ং দেবী কামাখ্যা বা নীলপার্বতী।

কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে উল্লিখিত আছে, সর্বকামনার অনুরূপ ফললাভ হয় বলেই তীর্থের নাম হয়েছে কামরূপ।

কালিকা-পুরাণের মতে, তিনটি শৃঙ্গ নিয়েই নীলাচল পর্বত। পূর্বদিকে ভুবনেশ্বরী মহাপীঠ যেখানে—সেটি ব্রহ্মপর্বত। মাঝখানে মহামায়া সতীর যোনিপীঠ যেখানে—শিবপর্বত। পশ্চিমের পর্বতটি বরাহ বা বিষ্ণুপর্বত। শোনা যায়, বহুকাল আগে বরাহ পর্বতে একটি কুণ্ড ছিল—বরাহকুণ্ড। বর্তমানে কালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে।

পৌরাণিক কথায়, এই পর্বতগুলির উচ্চতা ছিল একশো যোজন। সতীঅঙ্গ পড়ায় তার ভার সহ্য করতে অক্ষম হয় নীলপর্বত। কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশঃ বসে যেতে থাকে পাতালে। এই অবস্থায় পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ ধারণ করলেন তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। তবুও বসে যেতে থাকে নীলপর্বত। তখন অনন্যোপায়

হয়ে স্বয়ং এলেন মহামায়া। পর্বতশৃঙ্গগুলি ধারণ করে আকর্ষণ করলেন নিজে। বন্ধ হলো পাতালে বসে যাওয়া। তখন তিনজন দেবতার নামানুসারেই নাম হলো পর্বতশৃঙ্গের।

ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে একদা মানুষ ছুটে এসেছে—আজও আসে কামাখ্যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। তখন হিন্দুরাজা ভাস্কর বর্মণের রাজত্বকাল। হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন কামাখ্যা দর্শনে। এ-কথা জানা যায় তাঁরই লেখা ভারত বিবরণী থেকে।
ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতেও উল্লিখিত হয়েছে হরিদ্বারের মতো হিন্দু-তীর্থ এই কামাখ্যার কথা।
বর্তমান নাম কামরূপ। বহুপূর্বে এর নাম ছিল ধর্মারণ্য। মহাকবি কালিদাসও কামরূপের উল্লেখ করেছেন তাঁর রঘুবংশ-এ।
মহাযোগী গোরখনাথের জন্ম কোথায়—কোন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি—তা সঠিক জানা যায়নি। গবেষকগণ তাঁর বাণী এবং রচনার বিশ্লেষণ করে মোটামুটি একটা ধারণা করেছেন—আনুমানিক দশম শতাব্দীতে গোরখনাথ পূর্ব-ভারতের সিদ্ধপীঠ কামরূপে আবির্ভূত হন।
আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ বালানন্দ ব্রহ্মচারী। একদা এলেন এই কামাখ্যা তীর্থে। পরমানন্দে দর্শন করলেন মহামুদ্রা যোনী-পীঠ। কয়েকদিন রয়ে গেলেন পাহাড়ে। চলতে লাগলো সাধনভজন। তারপর এই অঞ্চলের অরণ্য পরিভ্রমণের সময় হঠাৎ একদিন আক্রান্ত হলেন কলেরায়। নির্জন পাহাড়। চিকিৎসক নেই—ওষুধেরও কোন ব্যবস্থা নেই। ভাবলেন, মৃত্যু তাঁর অনিবার্য।
অবসন্ন শরীর বালানন্দের। উত্থান শক্তি নেই। নিস্পন্দভাবে শুয়ে আছেন পাহাড়ের কোলে। অন্তরে চলেছে শুধু পরমাত্মার ধ্যান-জপ। এমন অবস্থায় হঠাৎ এক দিব্য কুমারী মূর্তি আবির্ভূতা হলেন তাঁর সামনে। অভয় দিলেন—মৃত্যু হবে না। শুধু আদেশ দিলেন—অবিলম্বে স্থান পরিবর্তন করতে। অদৃশ্য হলো কুমারী মূর্তি। এরপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন মহাসাধক বালানন্দ।
ঘুম ভাঙলো পরদিন ভোরে। দেখলেন, মারাত্মক রোগ তাঁর নিরাময় হয়ে গেছে কোন এক অলৌকিক মন্ত্রবলে। দেবীর নির্দেশ পালন করলেন। স্থান পরিত্যাগ করলেন অচিরেই।

কামাখ্যা মন্দিরের আবিষ্কার ও মাহাত্ম্য প্রচার

পুরাণে উল্লিখিত কামদেব প্রতিষ্ঠিত কামাখ্যা মন্দিরটি আজ আর নেই। কালের প্রভাবেই সেটি বিলীন হয়ে যায়। স্থানটি পরিপূর্ণ হয় জঙ্গলাদিতে। ফলে লুপ্ত হয় দেবীর প্রচার ও মাহাত্ম্য। এই লুপ্ত হওয়ার পিছনেও আছে ছোট্ট একটি পৌরাণিক কাহিনী।

কালিকা-পুরাণে বর্ণিত আছে, পুরাকালে একসময় মহামুনি বশিষ্ঠদেব তপস্যা করতেন কামরূপের সন্ধ্যাচল পর্বতে। তখন কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করতেন নরকাসুর। একদিন বশিষ্ঠদেব এলেন কামাখ্যা মন্দিরে—মাতৃদর্শনে। বাধা দিলেন নরকাসুর। কিছুতেই দর্শন করতে দিলেন না বশিষ্ঠদেবকে। বাধা পেয়ে অভিশাপ দিলেন মুনি, নরকাসুর যতদিন বেঁচে থাকবে—ততদিন পর্যন্ত মন্দির থেকে অন্তর্হিতা থাকবেন দেবী কামাখ্যা। ফলে বশিষ্ঠের অভিশাপে অন্তর্হিতা হলেন দেবী। পড়ে রইলো শূন্য মন্দির। কালক্রমে মন্দির লুপ্ত হয়ে পূর্ণ হলো জঙ্গলাদিতে।

তারপর শত শত বছর গেল পার হয়ে। অবস্থার কোন পরিবর্তনই হলো না। অষ্টম শতাব্দীতে এলেন আচার্য শংকর। তখন সারা ভারতবর্ষব্যাপী চলেছে তাঁর বৈদিক-ধর্মের পুনঃস্থাপনের কাজ। তিনি কামাখ্যায় এসে সংস্কার করলেন এই মহাপীঠের। কালের প্রভাবে আবার তা লুপ্ত হলো না। তবে কামাখ্যা বিষয়ে কোন আকর্ষণও রইলো না মানুষের। এইভাবেই চলতে থাকলো—রয়ে গেল কামাখ্যা।

১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন পালবংশের রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল। তিনি রাজত্ব করতেন গৌহাটির পশ্চিমখণ্ডে। কান্যকুব্জ থেকে কিছু সদ্‌ব্রাহ্মণ আনলেন তিনি। তাঁদের মাধ্যমেই পূজা চলতে থাকলো দেবী কামাখ্যার। কালক্রমে তা বন্ধ এবং লুপ্ত হলো।

এর অনেক পরের কথা। কোচবিহারের রাজা তখন বিশ্বসিংহ। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর—একদা কামরূপ অভিযান করলেন তিনি। যুদ্ধে লিপ্ত হলেন আহোমরাজের সঙ্গে।

একদিন নৈশ অভিযানে বেরিয়েছেন রাজা বিশ্বসিংহ। সঙ্গে রয়েছেন সহোদর শিবসিংহ। অন্ধকার রাত্রির অভিযান। আকস্মিকভাবেই রাজা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তাঁর সেনাদল থেকে। পথভ্রষ্ট হলেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন কামাখ্যা পাহাড়ে।

পাহাড়ে ওঠার ফলে তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত হলেন রাজা—সঙ্গী ভ্রাতাও। জলের

সন্ধান করতে লাগলেন পাহাড়ে। গভীর রাত। জল পাবেন কোথায়? একটা মানুষও তাঁর নজরে এলো না। ক্লান্ত পায়ে—উদ্দেশ্যহীনভাবেই চলেছেন রাজা বিশ্বসিংহ। হঠাৎ চোখ পড়লো—একটি বটবৃক্ষের তলায়। দেখলেন, উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে বৃক্ষতল। এগিয়ে গেলেন। এবার দেখলেন, এক বৃদ্ধা পূজা করছেন একটি পাথরের স্তূপ। ক্লান্ত ভ্রাতৃযুগলের প্রাণে সঞ্চার হলো আনন্দের। তৃষ্ণার্ত তাঁরা। জলের সন্ধান জানতে চাইলেন বৃদ্ধার কাছে। সামনেই জলের সন্ধান দিয়ে বললেন, বৃক্ষের গোড়ায় বিশ্রাম করতে।

ঝরণার সুমিষ্ট জল পান করে এলেন দুজনেই। বিশ্রামরত অবস্থায় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন বিশ্বসিংহ—এই পাথরের স্তূপটি কি এবং কিসের পূজা করছেন তিনি?

উত্তরে বৃদ্ধা জানালেন, নীলাচল পর্বতের এই জঙ্গলেও বাস করে কিছু মানুষ। তারা স্তূপটিকে দেবীর আসনজ্ঞানে বিশ্বাস এবং ভক্তিসহকারে পূজা করে। সুখ-দুঃখে, বিপদ আপদে এখানে পশুপাখিও বলি দেয। তাদের গরু ছাগল বা কোন কিছু হারালেও মানত করে। প্রত্যেকেরই কামনা পূর্ণ হয়। এই স্থানটি খুবই জাগ্রত। কেউ এই দেবীর শরণাপন্ন হলে তাঁর সমস্ত মনোবাসনাই পূর্ণ হয়।

রাজা বিশ্বসিংহ আকৃষ্ট হলেন বৃদ্ধার কথায়। বিশ্বাসও করলেন। নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত কামনা করলেন মনে মনে। যদি এই কামনা পূরণ হয়—তাহলে এখানে সোনার মন্দির গড়ে, করবেন নিত্যপূজার ব্যবস্থা।

রাত কেটে গেল ধীরে ধীরে। আলো ফুটে উঠলো আকাশে। চলে গেলেন সেই ঝরণার ধারে—রাতে যেখানে জলপান করেছিলেন তিনি। তারপর হাতের হীরের আংটি খুলে ফেলে দিলেন জলে। মনে মনে বললেন, দেশে ফিরে কাশীর গঙ্গায় যাবেন স্নান করতে। সেখানে যদি এই আংটি পান—তাহলে এই দেবীর সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবেন তিনি।

নেমে এলেন নীলাচল পর্বত থেকে। মিলিত হলেন হারিয়ে যাওয়া সেনাদলের সঙ্গে। তারপর কালক্রমে মহামায়ার ইচ্ছায় হলো নিষ্কণ্টক রাজ্য-ভোগ। রাজা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রাজকার্যে। কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর। ভুলে গেলেন মানতের কথা।

একদা বিশ্বসিংহ গেলেন কাশীতে। স্নানে নেমেছেন গঙ্গায়। হঠাৎ দেখতে পেলেন জলের মধ্যে তাঁরই হাতের আংটি। মনে পড়ে গেল, নীলাচল পর্বতে সেই গভীর রাতের অসহায় অবস্থা আর প্রতিশ্রুতির কথা।

ফিরে এলেন দেশে। পণ্ডিতদের আহ্বান করে জানালেন আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার কথা। পণ্ডিতেরা বিভিন্ন পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করে জানালেন, নীলাচল পর্বতে ওই স্থানটি আর কিছুই নয়—মহামায়া কামাখ্যাদেবীর মহামুদ্রা যোনি পীঠ। সতীর একান্নপীঠেরই একটি।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে রাজা বিশ্বসিংহ আবার এলেন নীলাচল পর্বতে। সঙ্গে অসংখ্য রাজকর্মচারী। উদ্দেশ্য—মন্দির নির্মাণ। স্থাপন করলেন শিবির।

প্রথমে পরিষ্কার করা হলো গভীর জঙ্গল। তারপর খননের কাজ শুরু হতেই বেরিয়ে পড়লো পূর্বে নির্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ—যোনিমুদ্রাসহ মূল পীঠস্থানও।

পূর্বে নির্মিত ভিতের উপরেই শুরু করলেন পরবর্তী নির্মাণের কাজ। সারাদিন ধরে কাজ হয়। অথচ সকালে উঠে দেখেন—কে বা কারা ভেঙে দিয়েছে নির্মিত অংশ। এটা চললো বেশ কয়েকদিন ধরে। কোন কারণ খুঁজে পেলেন না রাজা বিশ্বসিংহ। দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি। প্রার্থনা জানালেন দেবীর উদ্দেশ্যে—কোন ত্রুটি বা অপরাধ থাকলে ক্ষমা করতে। রাত্রে স্বপ্নাদেশ পেলেন—সোনার মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজা। তাই মন্দির খসে পড়ছে দেবীর ইচ্ছায়। রাজা সকাতরে জানালেন তাঁর অক্ষমতার কথা—অত সোনা কোথায় পাবেন তিনি। এই ভুলের জন্য অপরাধ ক্ষমা চাইলেন দেবীর কাছে।

দেবীর আদেশ হলো। প্রতি ইটের খণ্ডে দিতে হবে এক রতি করে সোনা। রাজী হলেন রাজা। আবার শুরু হলো মন্দির নির্মাণের কাজ। শেষও হলো। দেবীর পূজাও চললো নিয়মিতভাবে—নিষ্ঠার সঙ্গে।

মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বের অন্তিম অবস্থা। গোলযোগ শুরু হলো বাংলার আধিপত্য নিয়ে। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ। গৌড়ে রাজত্ব করছিলেন তখন নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ। তাঁকে হত্যা করলেন মাহমুদ শাহ। হলেন গৌড় রাজ্যের অধিপতি।

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। শেরশাহ বিতাড়িত করলেন মাহমুদ শাহকে। অধিকার করলেন গৌড়।

পাঠান সেনাপতি কালাপাহাড়। তখন প্রবল প্রতাপ তাঁর। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ করলেন কামরূপ রাজ্য। হিন্দুধর্মের অব্যাহত গৌরব ও গতি ধ্বংস করাই ছিল তখন কালাপাহাড়ের একমাত্র লক্ষ্য—উদ্দেশ্য। কামাখ্যা মন্দিরের খ্যাতির কথা তাঁর স্মরণে ছিল। এলেন নীলাচল পর্বতে। দেখলেন, কোন বিগ্রহ নেই কামাখ্যায়। ক্রোধে ভেঙে নষ্ট করে দিলেন বিশ্বসিংহ নির্মিত মন্দিরের উপরিভাগ, প্রাচীর এবং অন্যান্য বিগ্রহ।

এই সময় কোচবিহারের রাজা ছিলেন নরনারায়ণ। তখন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন আহোম-রাজের সঙ্গে। উদ্দেশ্য—রাজ্য বিস্তার। যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় নজরদারির অভাব হলো। ফলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হলো না পাষণ্ড কালাপাহাড়ের আক্রমণ। ধ্বংস হলো মন্দির।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। রাজা নরনারায়ণ আবার নতুন করে নির্মাণ করলেন কামাখ্যা মন্দির। পরবর্তীকালে আরও একবার ক্ষতিগ্রস্ত হলো মন্দিরটি। তবে মুসলমান আক্রমণে নয়। ভূমিকম্পে—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। কোচবিহারের রাজদরবার থেকেই গেল সাহায্য। সারিয়ে তোলা হলো মন্দির। এত কাণ্ডের পর এখন মন্দিরটি

দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরভাবে—অক্ষত অবস্থায়। কালাপাহাড়ের কালো হাতের চিহ্ন আজও কিছু বর্তমান আছে এই মন্দিরে। ভগবান বেঁচে আছেন—ভক্তের অন্তরে। কালাপাহাড়ও বেঁচে আছেন—মরে গিয়ে, ইতিহাসে।

দশমহাবিদ্যা মন্দির—দেবী ভুবনেশ্বরী

কামাখ্যা পাহাড়ে বাস স্ট্যান্ড যেখানে—সেখানে দাঁড়ালেই ডানদিকে সোজা চলে গেছে একটা রাস্তা। পাহাড়ী পথে—পিচের রাস্তা। এখন অটো, মোটর যায়। আগে যেতো না। ওটা দেবী ভুবনেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা। ও-পথ ধরেই এগিয়ে চললাম। পাহাড়ী পথে চড়াই উৎরাই হয়। এ-পথ তেমন নয়। ধীরে ধীরে—অল্প চড়াই। উঠতে কোন কষ্টই হয় না।

এ-পথের বাঁদিকে খাড়া পাহাড়। ডানদিকে গভীর খাদ—জঙ্গলে ভরা। দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছ—নানা ধরনের। তার ফাঁক দিয়েই দেখা যায় ব্রহ্মপুত্র—শহর গৌহাটি। দেখতে দেখতেই এগিয়ে চলি।

অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। চলেছি দু-বন্ধু। কোন চিন্তা নেই মনে। মন আনন্দেই চলেছে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পথ ধরে। একেবারে খাড়া পথ নয়। তাই প্রয়োজন হয় না বিশ্রামের। তবুও বসি, দেখি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—মন ভরে।

প্রায় মিনিট কুড়ি চলার পর এলাম ভুবনেশ্বরী মন্দির। মূল মন্দিরের কিছুটা আগের থেকেই বাঁধানো সিঁড়ি। যাত্রীদের জুতো খুলে রাখতে হয় এখানে। কামাখ্যা মন্দির থেকে ১৬৫ ফুট উপরে। সমতল থেকে এর উচ্চতা—৬৯০ ফুট।

এবার এসে দাঁড়ালাম একেবারে মন্দিরের সামনে। ডান পাশেই ভাঙা একটা টিনের চালা ঘর। এর পিছনেই একজোড়া বেলগাছ। গোড়ায় পোতা আছে একটি বড় এবং ছোট ছোট কয়েকটি ত্রিশূল। সিঁদুর মাখানো।

স্থানীয় পাণ্ডাদের মাধ্যমে জানা গেছে, একদা স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী এলেন নীলাচল পর্বতে—কামাখ্যা দর্শনে। এখানকার মনোরম পরিবেশে আকৃষ্ট হলেন তিনি। সাধনারই উপযুক্ত স্থান। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সামনে—জোড়া বেল গাছের গোড়ায় বসলেন আসন করে। অচিরেই সিদ্ধিলাভ করলেন নিগমানন্দ।

সামান্যতম শিল্পের ছোঁয়া নেই ভুবনেশ্বরী মন্দিরে। ছোট্ট গোলাকার মন্দির। একেবারেই সাদামাটা। তবে চেহারায় বোঝা যায়—এ-মন্দির বহুকালের প্রাচীন। পুরাণের মতে, ব্রহ্ম-পর্বত শিখরে দেবী ভুবনেশ্বরী মন্দির। এটি নীলাচল পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর।

টিনের চালার বাঁ-পাশেই দেবী মন্দির। এ-মন্দির তিনভাগে ভাগ করা। প্রথম-

ভাগে যাত্রীরা বসতে পারেন—নাটমন্দির। এখান থেকে ভিতরে যেতে আকারহীন একটি মূর্তি শোয়ানো আছে দরজার বাঁ-পাশে। সিঁদূর রাঙানো। এই মূর্তিটির নাম—ভেদীমা।

এই মূর্তিটিকে পাশে রেখে ঢুকলাম ভিতরে—দ্বিতীয় ভাগ। নাটমন্দিরের মতো। তবে জায়গা অনেক ছোট। দেয়ালে খোদাই করা আছে কয়েকটি মূর্তি—অস্পষ্ট এবং পরিচয়হীন।

মন্দিরের দ্বিতীয় অংশ ছেড়ে এগিয়ে গেলাম কয়েক পা। অন্ধকারময় গর্ভগৃহ। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম নীচে। ছোট্ট প্রদীপ জ্বলছে একটা। কোন বিগ্রহ নেই মন্দিরে। দেবী কামাখ্যার মতো পীঠ। চারপাশ বাঁধানো। এখানেও জল উঠছে—চুইয়ে চুইয়ে। সাজানো রয়েছে জবা আর নানা ফুল দিয়ে। এটিই দশমহাবিদ্যার অন্যতম—দেবী ভুবনেশ্বরী। এর পাশেই রয়েছে চৌকো পাথরের একটি খন্ড—অস্পষ্ট খোদিত একটি বিগ্রহ।

বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। গেলাম মন্দিরের পিছনে। এখানে রয়েছে বেশ বড় একটি পাথর-খণ্ড। সামনেই একটি প্রাচীন বটগাছ। পাথর-খণ্ডের উপরে বসে চারদিকে তাকালে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে—তা কখনও ভোলার নয়। অপূর্ব এক আনন্দের সৃষ্টি হয় মনে—অবর্ণনীয়। পাহাড়ের এই চূড়া থেকে উত্তরদিকে তাকালে, দূরে—বহুদূরে দেখা যায় অসংখ্য তুষারাবৃত পর্বতমালা—সারি সারি। নীচে তাকালে—খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র। অনেক বাধা অতিক্রম করে এসেছে মানস সরোবর থেকে। তীব্রনাদে বয়ে চলেছে দেবী কামাখ্যার পাদদেশ—নীলাচল পর্বত স্পর্শ করে। দেবীর পাদস্পর্শে পবিত্র হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। গঙ্গার মতোই পবিত্র। অনন্ত পাপরাশি ধুয়ে মুছে যায়—যারা বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে স্নান করে মানসের মানসপুত্র—ব্রহ্মপুত্রে। শত শত বছর ধরে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র—বয়ে চলেছে তীব্বতের বৌদ্ধ আর ভারতের হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন করতে করতে।

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পিছনের দিকটাই পূর্বদিক। এখান থেকে বহুদূরে বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর, পর্বতশ্রেণী, ব্রহ্মপুত্রে দ্বীপের মধ্যে উমানন্দ ভৈরবের মন্দির, শহর গৌহাটির রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর—এত মনোরম, এত সুন্দর—যেন ছবির মত দেখায়। প্রকৃতির এমনই বিচিত্র রূপ—এমনই তার বাহার—একটি স্থানের সঙ্গে তুলনা করা চলে না অপরটির। ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃতির রূপও ভিন্ন। গঙ্গার রূপ গঙ্গোত্রীতে এক —হরিদ্বারে আর এক—একই গঙ্গার রূপ প্রয়াগে ভিন্ন। তাজমহলের সামনে দাঁড়ালে এক রূপ—এই তাজমহলেরই আর এক রূপ আগ্রা ফোর্টে, শাহজাহানের কারাগার থেকে—যমুনাতীরে। প্রকৃতির রূপের সঙ্গে ভাবেরও এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটে—স্থান পরিবর্তনে।

গৌহাটি আর কামাখ্যা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পিছনে এই পাথর-খণ্ডের উপর না বসলে।

কামাখ্যা পাহাড়ের সমস্ত কিছুই ঘুরে দেখেছি। আশ্রয় নিয়েছি এক পাণ্ডার বাড়ীতে। আজ সারাদিন আর কোথাও বেরোইনি। ওখানেই ছিলাম। সন্ধ্যার খানিক আগে। টুকটুক করে উঠে এলাম ভুবনেশ্বরী মন্দিরে। একাই এসে গেলাম। বেলা আছে সামান্য। নামার সময় উৎরাই। বেশী সময় লাগবে না। তাই চিন্তা নেই মনে। এ-সময় লোকজন বা তীর্থযাত্রীও তেমন চোখে পড়লো না। বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। প্রণাম সেরে বেরিয়ে এলাম ভুবনেশ্বরী মন্দির থেকে। মন্দিরের পাশেই ভাঙা টিনের চালা দেয়া একটা ঘর। অবশ্য এর দু-দিকই খোলা। হঠাৎ চোখ পড়লো এক জটাজুটের প্রতি। বসে আছেন বারান্দারই এক কোণায়। সঙ্গে ঝোলা-টোলা কিছু দেখলাম না। ছিপছিপে চেহারা। কপালে লাল-টকটকে ফোঁটা। পরনে লাল চেলি একটা। একেবারে তেলচিটে মারা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ছোট নয়—বড় বড় গুটি। দু-বাহুতেও রয়েছে। সারা গায়েই ছাই মাখা। যেন ফরসা হয়ে আছে। আদতে ফরসা নয়। চোখ দুটো টানা টানা নয়। বড়—গোল গোল। ভয় লাগে না। তাকালে গায়ে একটা শিহরণ জাগে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে চোখ দুটোয়।

একেবারে ছোটবেলা থেকেই—কোন সাধুকে দেখে আমার ভয় করেনি কখনও। তাই কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। প্রণামী হিসাবে কিছু পয়সা বের করলাম পকেট থেকে। পায়ের কাছে রাখতে যেতেই ইসারায় নিষেধ করলেন সাধুবাবা। মুখে কোন কথা বললেন না। ইসারাতেই পয়সাটা রাখতে বললেন পকেটে। এতক্ষণ বসেছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ালেন।

মন্দিরে প্রণাম আর সাধুবাবার কাছে আসা—এতেই কেটে গেল প্রায় মিনিট দশেক। সন্ধ্যাও নেমে এসেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সাধুবাবা আমার চোখের উপর রাখলেন তাঁর দৃষ্টিটা। মাত্র কয়েক মুহূর্ত। বেশ বুঝতেই পারলাম—সমস্ত শক্তিই যেন চলে গেল সাধুবাবার কাছে। কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললাম। এবার কেমন যেন ভয়েতেই ঘেমে উঠলাম। ইসারায় অভয় দিলেন সাধুবাবা। ভয়ের কিছু নেই। তারপর বললেন অনুসরণ করতে। তাও ইসারায়। এই পর্যন্ত একটা কথাও বললেন না। হাঁটতে শুরু করলেন—ধীরে ধীরে। অনুসরণ করলাম সাধুবাবাকে—বিবশভাবে।

বেশ কিছুক্ষণ চললাম। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি—বুঝতেই পারলাম না। এলাম একটা গুহামুখে। জায়গাটা বেশ ঝোপেঝাড়ে ঘেরা। কামাখ্যায় আমার এই প্রথম আসা। পথঘাটের কিছুই চিনি না। এসেছি আজ তিনদিন হলো। এদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার হুঁস নেই—কতটা সময় কাটলো। দাঁড়িয়ে

আছি সাধুবাবার একেবারে কাছাকাছি। অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারলাম—ইসারায় ঢুকতে বলে নিজে ঢুকে গেলেন গুহায়।
ভয়ে তখন আমি আর আমার ভিতরে নেই। আকর্ষণ যে কাকে বলে—তা জীবনে উপলব্ধি করলাম এই প্রথম। বুঝতে পারছি সবকিছুই। জ্ঞান রয়েছে ভিতরে। অথচ আমার কিছু করারই নেই।
ভিতরে ঢুকে একটা লম্ফ ধরালেন সাধুবাবা। আলো হলো। ভিতরে ঢুকলাম। মাথাটা একটু নীচু করেই। দেখলাম, ছোট্ট একটা ধুনী জ্বলছে। আগুন তত জোরালো নয়। এতক্ষণ পর মুখ খুললেন সাধুবাবা,
—বইঠ্ বেটা।
বলে বসলেন ধুনীর ও-পাশে। বিপরীত দিকে বসলাম আমি। মুখোমুখি হয়ে। গুহা-মুখটা রইলো আমার পিছনে। ছোট্ট গুহা। ভ্যাপসা একটা গন্ধ। প্রথমে ঢুকতেই গন্ধটা লেগেছিল। তারপর আর বোধ হলো না। সয়ে গেল। ভিতরে হাত পনেরো লম্বা। ব্যস, আর এগোনোর উপায় নেই। গুহা শেষ। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় তবে মাথাটা ঝুকিয়ে। একেবারে নিস্তব্ধ পরিবেশ। ভিতরে রয়েছে খান কয়েক মড়ার খুলি। ধুনির পাশে। পিছন ফিরে দেখলাম, গাঢ় অন্ধকার। ধুনী থেকে ধোঁয়া উঠছে। একভাবে তাকানো যাচ্ছে না। সামান্য জ্বালাজ্বালা করছে চোখ দুটো।
প্রথম কথাতেই বুঝেছিলাম—সাধুবাবা হিন্দীভাষী। এবার বেশ গম্ভীর স্বরেই বললেন,
—বেটা, তোর প্রণামী নিইনি বলে দুঃখ করিস্ না। আমি কখনও কারও দান গ্রহণ করি না।
চুপ করেই বসে আছি। কোন কথা নেই মুখে। ভয়েতে গলা শুকিয়ে যেন আরবী খেজুর হয়ে আছে। তবে উৎকণ্ঠা অনেকটা কমেছে। এবার তিনি বললেন,
—আমি কারও কোন ক্ষতি করিনি—করতেও শিখিনি। তোকে দেখে আমার ভালো লাগলো। তাই নিয়ে এলাম এখানে। তোর ব্যবহারেও খুব খুশী হয়েছি আমি। কারণ আজকাল তো সাধু-সন্ন্যাসীদের কেউ বড় একটা সাহায্য করে না—তাই। তা বেটা, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
কথা বললেন এইটুকু। মনের ভয় কেটে গেল অনেকটা। বললাম,
—কলকাতা থেকে এসেছি। এখন পাণ্ডার বাড়ী থেকে—ভুবনেশ্বরী মাকে দর্শন করতে।
আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,
—বাবা, আপনি কি তন্ত্রসাধক—মায়ের উপাসনা করেন?
এ-কথার উত্তরে হ্যাঁ বা না—কিছুই বললেন না। ভাবটা এমন—শুনেও শুনলেন না। এবার বসে রইলেন চোখ বুজে। আমার ভিতরে এক অদ্ভুত অস্বস্তি হতে থাকলো। কি করবো—কোথায় যাবো—কি হবে আমার—কিছুই বুঝে উঠতে

পারলাম না। একটা অসহায়ভাব দেখা দিল মনে। কেটে গেল প্রায় মিনিট দশেক। তারপর চোখ খুলতেই বললাম,
—আপনি কি কামাখ্যাতে থাকেন—না অন্য কোথাও ?
এবার উত্তর দিলেন,
—আমার কোথাও ডেরা নেই। এখানে আছি বছরখানেক হলো। একটা বিশেষ সাধনের জন্য এসেছিলাম। সিদ্ধিলাভ হয়েছে। মায়ের ক্ষেত্র যে—হবে না!
বলে হাতজোড় করে একবার নমস্কার জানালেন কামাখ্যা মায়ের উদ্দেশ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম,
—এখান থেকে যাবেন কোথায় ?
সাধারণভাবেই বললেন,
—যাবো কোথায়—কিছুই জানি না। সাধুদের কি কোন ঠিকানা আছে ? যাদের ঠিকানা আছে—সাইনবোর্ড আছে—তারা আবার সাধু নাকি ? ওগুলো থাকা মানেই গৃহীদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাওয়ার স্থায়ী ধান্দা।
এবার আগের কথার সূত্র ধরেই বললাম,
—বাবা, সিদ্ধিলাভের জন্য এখানে এসেছেন বললেন। ওটা তো যে কোন জায়গাতেই হতে পারে। কারণ মন আর মন্ত্রের উপরেই তো সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে।
কথাটায় ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন সাধুবাবা। আবার মুখেও বললেন,
—কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস্। ভগবান সর্বত্রই বিরাজ করছেন। তবে বেটা, স্থানের মাহাত্ম্য তো একটা আছেই—যেটা মন্ত্রসিদ্ধিতে দারুণভাবে কাজ করে। আর মনটা কাজ করে পরিবেশের উপর। ইস্কুলের পড়ার মনটা কি হাটের পরিবেশে হয় ? তাহলে ফুলশয্যার রাতের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা কেন! ঠিক কিনা বল্ ?
এখন ভয়টা আমার সম্পূর্ণই কেটে গেছে। মনে মনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছি। বললাম,
—বাবা মনের কথাই যখন উঠলো, তখন মন নিয়েই একটা প্রশ্ন করি। মনের শক্তি বাড়ানো যায় কিভাবে ? সাধন-ভজন, জপ-তপে মনের শক্তি বাড়ে—এ-কথা বলেন, যাঁরা এ-পথে আছেন। যারা তা করতে পারে না—তাদের কি উপায়ে মনের শক্তি বাড়ানো সম্ভব ?
এ-রকম একটা প্রশ্ন করবো এখন—সাধুবাবা ভাবতেই পারেননি। আলো-আধারে মুখটা দেখে তাই-ই মনে হলো। এতক্ষণ পর সাধুবাবা ধুনীর কাঠটা একটু খুঁচিয়ে দিলেন। কাঠের ছাইটা ঝরে পড়লো। একটু ধুনো ছিটিয়ে দিয়ে বললেন,
—এটা তো খুব সহজ রে। কোন ব্যাপারে কিছুই ভাববি না—দেখবি, মনের শক্তি আপনা থেকেই বেড়ে যাবে—জপ তপ না করলেও। মেপে কথা বলবি।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটাও না। তাতেও মনের শক্তি বাড়ে। তাছাড়া যে কোন বিষয়ে, সেটা সুখ-দুঃখ—যাইহোক না কেন—শুধু একবার ভেবে নিতে হবে—যা হবার তা হবে—যা হবে দেখা যাবে—এই ভাব-এ কেউ যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তো মনের শক্তি আপনা থেকেই বেড়ে যাবে। প্রকৃত ও যথার্থ কোন ভাবনার বাইরে যে ভাবনা—সেটাই তো মনের শক্তি নষ্ট করে। আর তার থেকেই তো সংসারের যা কিছু অনাসৃষ্টি, অশান্তি। মুখে যতটা সহজে বললাম—কাজে করা ততটা সহজ নয়। দীর্ঘদিনের অভ্যাসেই মনকে এই ভাব-এ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এতে বেড়ে যাবে মনের অদম্য শক্তি। একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা বলে আর কিছুই থাকবে না।

বাঘছালের উপরেই বসে আছেন সাধুবাবা। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ নজর পড়লো। কৌতূহল সামলাতে না পেরে বললাম,

—বাবা, আপনি তো দেখছি বাঘছালের উপর বসে আছেন। এই আসনে বসে জপ করলে কি বিশেষ কোন ফল লাভ হয়?

কথাটা শুনে মুখের দিকে তাকালেন। এবার সাধুবাবা মুখে হালকা হাসির ভাব এনে বললেন,

—হাঁ বেটা, আসনের গুণ তো একটা আছেই। আর সেইজন্যেই তো অন্যের জপের আসনে বসতে নেই—নিজের আসনেও কাউকে বসতে দিতে নেই। এমনকি স্পর্শও নয়।

কারণ জানতে চাইলে সাধুবাবা বললেন,

—একই আসনে বসে প্রতিদিন জপ করতে থাকলে—জপ-মন্ত্রের শক্তি ক্রমে গেঁথে যায় আসনে। ধীরে ধীরে আসন সিদ্ধ হয়ে ওঠে। এটা হয় অলক্ষ্যেই। মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আসন প্রভাবিত হয়। ফলে মন যত চঞ্চল, অস্থির বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হোক না কেন—আসনে বসামাত্রই পূর্বজপের প্রভাব ক্রিয়া করে দেহ ও মনের উপর। ফলে দ্রুত স্থির হয়ে যায় মন। যার জন্যেই তো নিজের জপের আসনে কাউকে বসতে, এমনকি স্পর্শও করতে দিতে নেই।

রাত বেড়ে চললো। ভয়টা এখন একেবারেই মুছে গেছে মন থেকে। তবে একটু অস্থির হয়ে উঠলাম। পাণ্ডার বাড়ীতে আমার বন্ধু আছে। সে জানে না আমি কোথায় আছি। জানি, চিন্তায় সে অধীর হয়ে উঠেছে। চারদিক এখন অন্ধকার। কোনভাবেই ফেরার উপায় নেই। এইটুকু ভাবতেই অন্তর্যামী সাধুবাবা বললেন,

—কোন চিন্তা করিস্ না। তোর বন্ধু যাতে তোর জন্যে কোন চিন্তা না করে, উদ্বিগ্ন না হয়—তার ব্যবস্থা আমি করেছি। ও-সব কিছু ভাবিস্ না।

বুঝলাম, আমার মনের কথা অবগত হয়েছেন সাধুবাবা। এতে মোটেই অবাক হলাম না। নিশ্চিন্ত হলাম। কারণ এই বিষয়টার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় আছে। একবার নয়—বহুবার। আর ভাবলাম না। সাধুবাবারও নিশ্চিন্ত মুখটা দেখলাম। আসন প্রসঙ্গে তিনি বললেন,

—বেটা, এক এক আসনে বসে জপের ফল আলাদা। সাধারণ জপ পুজোপাঠের জন্য কম্বল বা পট্টবস্ত্রের আসনই ভালো। তবে ধর্মলাভ এবং কাম্যবস্তুর সাধনায় কম্বলের আসনই শ্রেষ্ঠ। তার রঙ যদি গাঢ় লাল হয়তো আরও ভালো। কৃষ্ণসার কিংবা হরিণের চামড়ার আসন জ্ঞান এবং বাকসিদ্ধির ক্ষেত্রেই সর্বোৎকৃষ্ট। আর মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো কুশের আসন।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা? 'না'—বলাতে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর আবার শুরু করলেন,

—পাথরের আসনে বসে জপ করতে নেই—রোগব্যাধি হয়। কাঠের আসনেও নয়—সাংসারিক উন্নতিতে ব্যাঘাত ঘটে। শুধু মাটিতে বসে জপ করলে বাড়ে দুঃখ। তবে মেয়েদের অশৌচ চলাকালীন আসনে বসতে নেই। জপ করতে হয় মাটিতে বসে। শুকনো ছোবড়া জাতীয় কোন কিছু দিয়ে তৈরী আসনে বসে জপ করলে নষ্ট হয় সম্মান, যশ। বাঘছালের আসনে বসে জপ করতে নেই গৃহীদের। সংসারের অমঙ্গল অনিবার্য। অদীক্ষিত গৃহী যারা—তাদেরও কৃষ্ণসার কিংবা হরিণের চামড়ার আসনে বসে পুজোপাঠ করতে নেই। সংসারত্যাগীদের বাঘছালের আসনে বসে জপ—মোক্ষলাভের সহায়ক।

এবার প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, আসনের যেমন বাদ বিচার আছে—তেমন বিভিন্ন দেবদেবীর পুজায় নিবেদিত ফল বা ফুলের কি সেরকম কিছু নিয়ম আছে?

এ-প্রশ্নে সাধুবাবা খুব খুশী হলেন। এটা মুখ দেখেই মনে হলো। বললেন,

—আছে বৈ-কি! স্নান করে ওঠার পর গাছ থেকে ফুল তুলে দেবতার পুজা করতে নেই। সে ফুল দেবদেবীরা গ্রহণ করেন না। পুজোয় কোন ফলও হয় না। তাই স্নানের আগেই ফুল তুলতে হয়। ফুল কখনও ধুয়ে পুজোয় দিতে নেই। ধোয়া ফুলও দেবতারা গ্রহণ করেন না। পরে থাকা বস্ত্রে ফুল রাখতে নেই। রাখলে তা পুজোয় দিতে নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাজার থেকে কেনা বাসি ফুল, আবার অনেক সময় আজ ফুল তুলে রেখে কাল যদি সেই ফুলে পুজো করা হয়—তাতে কি কোন অপরাধ হয়?

হাসতে হাসতে বললেন সাধুবাবা,

—অপরাধ আর কি! তবে বেটা, মলিন বা ছেঁড়া, মাটিতে পড়ে চেপ্টে যাওয়া, গন্ধশোকা হয়েছে এমন আর বাসি ফুল কখনও পুজোয় দিতে নেই। এগুলোকে অশুদ্ধ ফুল বলে। তবে শিউলীফুল মাটিতে পড়লে তা কখনও অশুদ্ধ হয় না। তাই ধুয়ে নিয়ে পুজোয় দিলে সে ফুল দেবতারা গ্রহণ করে না। শ্মশানে লাগনো গাছের ফুল যত সুন্দরই হোক—তা পুজোয় একেবারেই নিষিদ্ধ। বিষ্ণুপুজোয় কখনও ফুলের কুঁড়ি দিতে নেই।

কোন বিষয়ে প্রশ্ন তুলে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে একটু খুঁচিয়ে দিতে হয়। তারপর আর কথা বলতে নেই। তখন নিজেই তিনি জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা খুলে দেন। এখন হলোও তাই। বলতে লাগলেন,

—চাঁপা, পদ্ম, মালতী ফুল—বেলপাতা, তুলসী আর দূর্বা কখনও বাসি হয় না। এর প্রথম তিনটে ফুল দিয়ে একবার পূজা দেয়ার পর ওই ফুল পরদিন জল দিয়ে ধুয়ে আবার দেবতার পায়ে অর্পণ করতে পারিস্। তাতে কোন দোষ হয় না।

এ-কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, কারণগুলো তো ব্যাখ্যা করছেন না। এ-সবের কারণ কি—কেন ভালো—কি জন্যে দোষ?

হাসিমুখেই সাধুবাবা বললেন,

—এই বিশ্বসংসারে সমস্ত কিছুর কারণ আর উদ্দেশ্য কি মানুষের জানা সম্ভব? যে নিয়ম চলে আসছে—তা মেনে চলাই ভালো। তাতে ভালো হলে ভালো—না হলে, আর যাই হোক—ক্ষতি তো কিছু হয় না। প্রকৃতিই বল্ আর ভগবানই বল্—তাঁর উদ্দেশ্য আর সমস্ত রহস্য যেদিন মানুষ জানতে পারবে—সেদিন কি সে আর মানুষ রইবে বেটা!

এ-টুকু বলেই আবার ফিরে এলেন পূর্ব-প্রসঙ্গে,

—পোকা খাওয়া কিংবা বাসি ফুল দিয়ে পূজা করতে নেই। অভিশাপ দেন দেবতারা—যিনি পূজা করেন—তাকে। উগ্রগন্ধ অথবা একেবারেই গন্ধ নেই—এ-রকম ফুল আর জবা দিয়ে কখনও নারায়ণের পূজা করবি না। সুগন্ধী যেকোন ফুল আর জবা—যে কোন শক্তিপূজায় দিবি। ভোরবেলায়, সন্ধ্যাকালে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা আর দ্বাদশী তিথিতে তুলসীপাতা ছিঁড়তে নেই গাছ থেকে। এটা করলে নারায়ণের অঙ্গে আঘাত করা হয়। ওই সময় এবং দিনগুলিতে গাছ থেকে বেলপাতাও ছিঁড়বি না কখনও। বেলপাতার তিনটে ফলক না থাকলেও অসুবিধে নেই। শিবপূজায় দেয়া যাবে। আর সব সময়েই নিখুঁত ফল দিতে হয় পূজায়। দিলে দ্রুত কার্যসিদ্ধি হয়।

হাতে ঘড়ি নেই। বুঝতে পারছি না—রাত কত হলো! বেশ খিদেও পেয়েছে। সাধুবাবা যে রান্না করে খান—এমন কোন লক্ষণ কিছু দেখতে পেলাম না আশপাশে। পেটের চিন্তা মাথায় আসতে না আসতেই সাধুবাবা বললেন,

—খিদে পেয়েছে? ভাবিস্ না। সময় মতো খাবার এসে যাবে। আমার সাধনের সিদ্ধি দেখানোর জন্যই তো তোকে নিয়ে এলাম এখানে।

এই কথাটুকুতেই বুঝলাম—আজ একটা কিছু ঘটবে। ভিতরে একটু ভয় ভয় ভাব এলো। কিছু বললাম না। সাধুবাবাই বললেন,

—ভয় কিরে বেটা—কিচ্ছু ভয় নেই। আর কি জানতে চাস্—বল্?

একটু অভয় পেয়েই বললাম,

—বাবা, আপনার ফেলে আসা জীবনের কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। কেমন

করে—কেন এলেন এ-পথে ?

এ-কথায় মুখটা একেবারে মলিন হয়ে গেল সাধুবাবার। চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। মনে হলো, ভেবে নিলেন আমাকে তাঁর অতীত জীবনের কথা বলা ঠিক হবে কিনা। কাটলো আরও কিছুটা সময়। তারপর বললেন,

—ভগবানকে লাভ করবো—এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি এ-পথে। ঘর ছেড়েছি বড় দুঃখে। মা বাবা ভাই বোন—এই দুনিয়াতে কেউই নেই আমার। আমি যখন মায়ের পেটে—তখন বাবা মারা যায় সাপের কাপড়ে। বাপের অবর্ত-মানে এলাম পৃথিবীতে। জন্মের পর তিন মাস যেতে না যেতেই মা-ও গেলেন কলেরায়। একেবারে বাপ মা খেগো ব্যাটা আমি। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে !

লম্ফের আলোতে লক্ষ্য করলাম সাধুবাবার সজল চোখ-দুটো। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

—পৃথিবীতে এসে বাবাকে তো দেখলামই না। চিনতে পারলাম না মা-কেও। গ্রামেরই এক দুঃস্থ পরিবারে বেড়ে উঠলাম কোন রকমে। ইস্কুলের মুখ দেখিনি কখনও। লোকের লাথি-ঝাঁটা খেয়েই বেওয়ারিস্ জীবনের বারোটা বছর আমার কেটে গেল। বাপ মায়ের মৃত্যুর কথাটা শুনেছি জ্ঞান হলে—যাদের বাড়ীতে বড় হয়েছি অতিকষ্টে—তাদেরই কাছ থেকে।

সাধুজীবন--অথচ দু-চোখ থেকে টপ্‌টপ্ করে নেমে এলো কয়েক ফোঁটা জল। তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে—আমিও। সাধুবাবা বললেন,

—তখন আমি একেবারেই বাচ্চা। কাজ করবো কি ? কিছুই করতাম না বলে মারতো। একদিন বেদম মার মারলো আমাকে—যাদের কাছে থাকতাম—তারা। মার খেয়ে ভাবলাম, 'দূর শালা, সংসারে যখন আমার কেউ নেই, কিছুই নেই—তখন এখানে পড়ে শুধু শুধু মার খাই কেন ? বেরিয়ে পড়লাম একদিন। আর ফিরে গেলাম না গ্রামে। কার কাছেই বা ফিরবো—কে ছিল আমার ?

এতক্ষণ স্থির অবস্থায় বসেছিলেন সাধুবাবা। এবার হাত দুটো চোখের পাতা স্পর্শ করে নেমে এলো হাঁটুতে। এই অবস্থায় নিজেরই কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে থাকলো। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাড়ী ছিল কোথায়—এখন বয়েস কত হলো আপনার ?

মিনিট কয়েক পর উত্তর দিলেন,

—তিরুচিরাপল্লী। ঘর ছেড়েছি পঞ্চান্ন বছর আগে—তখন বয়েস আমার বারো। সঙ্গে সঙ্গেই বললাম,

—বাবা, আপনি তো তাহলে দক্ষিণ-ভারতের মানুষ। এত সুন্দর হিন্দী শিখলেন কি করে ? আপনার কথা শুনে ভেবেছিলাম—আপনি বোধ হয় বিহার, ইউ-পি-র হবেন।

এই কথাটুকুতেই মলিন মুখে সামান্য হাসি ফুটে উঠলো সাধুবাবার। মুহূর্তে তা মিলিয়েও গেল। বললেন,

বেটা, মাতৃভাষাটাই ভুলে গেছি আমি। গ্রাম ছাড়ার পর এখানে ওখানে ভিক্ষে করেই খেতাম। কু-বুদ্ধি আর পথ—এ-দুটোর কোন অন্ত নেই। পথই ধরলাম—পথে নেমে। তা-ছাড়া আর উপায় কি! পাল হাল আর মাঝি-হীন তরীতে একা বসে। ধাক্কা খেতে খেতে একদিন এসে গেলাম গয়ায়। যোগাযোগ হলো এক সাধুবাবার সঙ্গে। আকাশ গঙ্গা পাহাড়ে। রয়ে গেলাম তাঁর কাছে। তিনি ভিক্ষে করতেন—সঙ্গে থাকতাম আমি। থাকা খাওয়ার চিন্তাটা গেল। সেই সাধুবাবার কাছেই আমার দীক্ষা হয়েছে।

গুরুজীর বাড়ী ছিল উত্তরপ্রদেশে। গুরুজী আমার ভিখারীর মতোই থাকতেন। কিন্তু এত বড় মহাত্মা ছিলেন যে, দেখলে কারও বোঝার উপায় ছিল না। তেরো বছর বয়স থেকেই কথা বলে আসছি হিন্দিতে। সেইজন্যেই তো বুঝতে পারিস্‌নি।

সাধুবাবার গৃহত্যাগের কাহিনী শুনলাম। বলে গেলেন নির্বিকার-ভাবে। এবার জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনি তো এখানে আছেন বছরখানেক হলো। এর আগে ছিলেন কোথায় ?

এখন মুখের মলিন ভাবটা একেবারেই কেটে গেছে সাধুবাবার। বললেন,

—স্থায়ীভাবে কোথাও বাস করি না—থাকিও না। যখন যেখানে, যে তীর্থে মন চায—সেখানেই চলে যাই। ডেরা কোথাও করিনি কখনও—মনও চায় না।

প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেছেন নিশ্চয়ই ?

খুশীর ভাব নিয়েই বললেন,

—হাঁ বেটা, ভারতের সমস্ত তীর্থই ঘুরেছি আমি। তবে মানস সরোবর, কৈলাসে যাইনি কখনও।

সঙ্গে সঙ্গেই জানতে চাইলাম,

—এ-সব তীর্থ কি সব পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন—না, ট্রেনে বাসে ?

একটু অবাক চোখে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—যেখানে ট্রেন বা বাসের দরকার—সেখানে তাতেই চড়েছি। যেখানে হাঁটা পথ—সেখানে গেছি পায়ে হেঁটেই।

এবাব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলান,

—ট্রেন ভ্রমণে টিকিট কাটেন কখনও ?

এ-কথায় হেসে ফেললেন সাধুবাবা। বললেন,

—না, টিকিট কাটি না—কাটিনিও কখনও। কোথাও যাওয়ার দরকার হলেই ট্রেনে উঠে বসে থাকি। অনেক 'টিকট্' বাবু ট্রেনে উঠলে টিকিট চায় না। সাধু বলে ফিরেও তাকায় না। আবার কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে—কতদূর যাবো ? বলি—কিছু বলে না। চলে যায়। আবার কিছু কিছু 'টিকট্'বাবু আছে—যারা নামিয়ে দেয় ট্রেন থেকে। নেমে পড়ি। কিছু বলি না। বসে থাকি স্টেশনে।

পরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করি। এইভাবেই পৌঁছে যাই এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে।

এই পর্যন্ত বসে খুব হাসতে লাগলেন সাধুবাবা। হাসির কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন,

—বেটা, একটা মজার কথা শোন্। একবার দ্বারকা থেকে আসছি বৃন্দাবনে। আমেদাবাদ থেকে দিল্লী—দিল্লী থেকে আগ্রা হয়ে যাবো বৃন্দাবনে। ট্রেনে তো বসে আছি বেশ 'আরাম সে'। আগ্রা স্টেশনে শুরু হলে 'মেজিস্টর চেকিং'। টিকিট নেই। ধরে নিয়ে গেল আমাকে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—ভাড়া আর জরিমানা দিতে পারবো কিনা ?

বললাম—আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। তিনি আমায় সাতদিনের জেল দিলেন। কি আর করবো! চলে গেলাম জেলে।

ওখানে আমাকে দেখে তো সবাই অবাক। কারণ জানতে চাইলো—জেলখানায় সাধুবাবা কেন ? বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়েছি—সত্যি কথাই বললাম।

পুলিশ আর কয়েদীরা খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতো। কেউ কোন কাজই করতে দেয়নি আমাকে। দেখতে দেখতে কেটে গেল সাতটা দিন। যেদিন ছাড়া পেলাম—সেদিন জেলার সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—জেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো ? বৃন্দাবনের কথাই বললাম। আমাকে একটা 'পরচা' দিয়ে তিনি বললেন—ট্রেনে যদি কোন চেকার ধরে—তাহলে এটা দেখালেই ছেড়ে দেবে। আমার ঝুলিটা জমা দেয়া ছিল। সেটা ফিরিয়ে দিলেন। যখন চলে আসছি, তখন জেলার সাহেব আর কয়েকজন পুলিশ এসে প্রণাম করল আমাকে। অবাক হযে গেলাম। তারপর জোর করেই কিছু টাকা হাতে দিয়ে বললেন—যাও সাধুবাবা, এটা তুমি পথে খরচা করো। বেটা, আশীর্বাদ করার ক্ষমতা আমার নেই। ভগবানের কাছে শুধু প্রার্থনা করে বললাম—সুখে রেখো, আনন্দে রেখো ওদের।

এবার প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া মানে সরকারকে ফাঁকি দেয়া। আইনের চোখে এটা অপরাধ। সারা জীবনই তো বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে সরকারকে ফাঁকি দিয়েছেন। এতে কি আপনার পাপ হয়নি ?

হাসি মুখেই বললেন সাধুবাবা,

—বেটা, সবক্ষেত্রেই আমি মনে করি, যার অনেক আছে—তার দেয়া উচিত। যার কিছু আছে—তার কিছু দেয়া উচিত। থাকা সত্ত্বেও না দেয়াটা অপরাধ—পাপ। যার কিছু নেই—সে দেবে কোথা থেকে ? আমি তো বেটা নেংটি-সম্বল সাধু। আমার তো দেবার মতো কিছুই নেই। আমি তো চলি মানুষের দয়ার উপরেই। তারা দিলে খাই—না দিলে খাই না। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়লে আমার আর পাপ পুণ্যের কি আছে ?

এই প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, এ-তো গেল ট্রেনের কথা। বাসে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে—তখন কি করেন? সাধারণ ভাবেই বললেন,
—পয়সা না থাকলে ড্রাইভার কিংবা কণ্ডাকটারকে বলি। নিয়ে যেতে রাজী থাকলে বাসে উঠে পড়ি। নইলে আর একটা বাসে বলি। কেউ না কেউ রাজী হয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় কিছু না বলেই উঠে পড়ি বাসে। কণ্ডাকটার ভাড়াও চায় না—কিছু বলেও না। জায়গা মতো নেমে পড়ি। ওঠার পর কোন আপত্তি করলে নেমে যাই। তবে সে রকম কেউ করেনি কখনও।
এবার জানতে চাইলাম,
—এটা তো আপনার কাছাকাছি কোথাও যাওয়ার কথা বললেন। ভাড়া কম, তাই কিছু বলে না। বাস-যাত্রা যদি কখনও দূরপাল্লায় এবং ভাড়া যদি অত্যন্ত বেশী হয়—তখন তো কোন কণ্ডাকটার মেনে নেয় না। সে-ক্ষেত্রে কি করেন?
সাধুবাবা এবার একটু মুচ্‌কি হাসি হেসে বললেন,
—প্রথমে কণ্ডাকটারকে কাছাকাছি কোন একটা জায়গার নাম বলি। রাজী হয়—উঠে পড়ি। ঠিক সেই জায়গা এলেই নেমে পড়ি। আবার ওই একই কায়দায় পরের বাসে উঠি। এইভাবে বেশ কয়েকবার বাস পাল্টে পাল্টে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাই। দূর পাল্লায় তো ভাড়া বেশী—তাই একটা বাসে কখনও টানা যাওয়া যায় না। নিয়েও যায় না। নিজেরও বলতে লজ্জা করে। তাতে অনেক সময় গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে দেরী হয়। একদিনের জায়গায় দু-তিন দিনও লেগে যায়। তবে না করে না কেউই। শরীর ঠিক থাকলে অনেক সময় পায়ে হেঁটেও চলে যাই।
এই পর্যন্ত বলে সাধুবাবা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,
বেটা, অনেক রাত হলো। কথাও হলো অনেক। এবার কিছু খাওয়া দরকার—কি বলিস্?
খিদে তো আমার অনেক আগেই পেয়ে বসে আছে। সামান্য ঘুম ঘুম ভাবও আসছে। তাই সম্মতি জানালাম ঘাড় নেড়ে। কিন্তু আগেই লক্ষ্য করেছি, গুহায় খাবারের কোন বালাই নেই। অন্তত সাধুবাবার আশ-পাশে তেমন কিছু দেখছি না। তিনি বললেন,
—কি খেতে চাস্—বল্? খাওয়ার কোন চিন্তা নেই। এখানে যা খেতে চাইবি—তাই-ই পেয়ে যাবি।
একটু অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। বলে কি সাধুবাবা। এখন গভীর রাত—নির্জন। বসে আছি পাহাড়ের গুহায়। এখানে যা খেতে চাইবো—তাই-ই পাবো! ভাবলাম—অসম্ভব। আবার ভাবছি—হতেও পারে। তুকতাক্ করে কিছু আনলেও আনতে পারে। তবে অবিশ্বাসের ভাবটাই মনে এলো বেশী করে। সঙ্গে সঙ্গেই জোর দিয়ে সাধুবাবা বললেন,
—হাঁ বেটা, যো কুছ তু মাঙেগা—ওহি অভি মিল্ যায়গা। বোল্ বেটা—কোন্

খানা তু খানে মাঙ্‌তা—বোল্‌।
হতবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। কথা সরছে না মুখ থেকে। মিনিটখানেক কেটে গেল এইভাবে। তারপর একটু ভেবে নিয়েই বললাম,
—কিছু মিষ্টি আর তালশাঁস খাওয়াতে পারেন?
তালশাঁস বললাম এই কারণে—ওটার এখন অফ্‌-সিজিন। তাছাড়া গাছ থেকে তাল পেড়ে, কেটে—তবে তার শাঁস আনতে হবে—যা এই মুহূর্তে একেবারেই অসম্ভব। খাবারের ফরমাস শুনে হাসতে হাসতেই সাধুবাবা বললেন,
—কোই বাত নেহি। অভি—জরুর মিল যায়গা—এক মিনট্‌।
বলে চোখ বুজলেন তিনি। বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়তে লাগলেন। বুঝলাম না। চোখ খুললেন মিনিট দুয়েক পর। পাশ থেকে তুলে নিলেন একটা মড়ার খুলি। তারই পাশে ছিল কমণ্ডলু। একটু জল ঢাললেন তাতে। এবার খুলির জলটা ঢাললেন ধুনীতে। অদ্ভুত ব্যাপার—জল দিলেন, অথচ ধপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠে নিভে গেল। এবার নিভিয়ে দিলেন লম্ফটা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম—গুহার অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে গেল। ভরে উঠলো আলোয়। তীব্র নয়—অথচ অসম্ভব কমনীয় উজ্জ্বল আলো। চম্‌কে উঠলাম। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো সারা গায়ে। মুহূর্তেই সমস্ত সত্ত্বা যেন আমার লোপ পেয়ে গেল। অথচ ভিতরে জ্ঞান আছে। আলো কোথা থেকে এলো বুঝলাম না। মনে হলো পিছন থেকে। ফিরে তাকালাম—এক নজর। এবার সাধুবাবার দিকে। প্রসন্ন হাসিতে ভরা মুখ।
এক নজরে দেখলাম, অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে। এমন রূপ কোন মানুষের হয় বলে মনে হয় না। আমি অন্তত দেখিনি কখনও। তাঁরই সারাদেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। বয়েস আঠারো কুড়ি বাইশের মতো হবে। এটা আমার ওই এক নজরেরই আন্দাজ। তীব্র উজ্জ্বল ফরসা। রক্ত-মাংসের দেহ বলেই মনে হলো। করুণায় ভরা চোখ দুটো। ফালা ফালা। কাজল পরা মনে হলো। চোখ দুটো থেকে দয়া যেন উপছে পড়ছে। টিকালো নাক। সর্বাঙ্গ গোলাপী শাড়িতে ঢাকা। একনজরে পা পর্যন্ত দেখতে পাইনি—কোমরের একটু নীচ পর্যন্তই। দেহে এতটুকু উগ্রতা নেই। নিটোল স্নিগ্ধ দেহ। রূপের আলোয় গুহা যেন ভেসে যাচ্ছে। প্রকৃত রূপের যে আলো হয়—এঁকে দেখে আমার এই প্রথম ধারণা হলো। দেখলাম, দু-হাতে দুটো থালা। একনজরে এইটুকুই। তাকাতে পারিনি—ভয়ে। ইসারায় রাখতে বললেন সাধুবাবা। পিছনে থালা রাখার শব্দটা পেলাম। তারপর ধীরে ধীরে আলোটা মিলিয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল গুহা। আবার লম্ফ ধরালেন। ভাবতে লাগলাম, কে এই মেয়েটি—কোথায় থাকে—কি সম্পর্ক এই সাধুবাবার সঙ্গে—কোথা থেকে এলো মুহূর্তের মধ্যে—পলকে গেল কোথায়? অসংখ্য প্রশ্ন আসছে মাথার মধ্যে। বাহ্যজ্ঞান যেন লোপ পেতে বসেছে। আমি নির্বাক। সাধুবাবা ইসারাতেই বললেন—থালাটা সামনে নিতে। পিছন ফিরে

দেখলাম—কেউ নেই। বসা অবস্থায় থালা-দুটো এনে দিলাম সাধুবাবাকে। একটা নিজের কাছে রাখলেন। একটা দিলেন আমাকে।
থালার এক পাশে মিষ্টি সাজানো। অপূর্ব গন্ধ বেরোচ্ছে। আর এক পাশে একেবারে কাঁচ ছাড়ানো তালশাঁস—ছয়টি। খাবো কি! ভুলেই গেলাম খাওয়ার কথা। দেখছি আর ভাবছি—অন্তহীন ভাবনা। ভাবছি মেয়েটির রূপের কথাও। বাপ্‌রে—এত রূপ! মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সাধু-বাবার কথায় হোঁচট্ খেলো চিন্তাগুলো। হাসতে হাসতেই বললেন,
—খেয়ে নে। তোর তালশাঁস আছে তো? শোন্, ওর নাম মধুমতী। ওই আমার সব প্রয়োজন মেটায়। সব কাজই ও করে দেয়।
একটা কথাও সরলো না মুখ থেকে। বিস্ময়ে অভিভূতই হয়ে আছি। তিনি বললেন,
—অনেক সাধনার কথা আছে তন্ত্রে। তার মধ্যে আছে মধুমতী সাধনা। মধুমতী হলেন উপদেবী। সাধক যে ভাব-এ উপাসনা করেন—দেবী সেই ভাব-এই সাধকের মনোবাসনা পূর্ণ করে দান করেন বাঞ্ছিত ভোগৈশ্বর্য। এই সাধনায় আমি সিদ্ধি-লাভ করেছি। তোকে দেখানোর জন্যেই তো এখানে এনেছি। নে বেটা—খেয়ে নে। যা দেখলি—এ-সব কথা গিয়ে কাউকে বলিস্ না যেন। কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে গাঁজাখুরি গল্প। মাঝখান থেকে উপহাসের পাত্র হবি। কথাটা মনে রাখিস্।
ভাবনার শেষ নেই আমার। ভাবতে ভাবতেই শুরু করলাম খাওয়া। অসংখ্য প্রশ্ন এলো মনে। কোন্ কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করবো—বুঝে উঠতে পারলাম না। ফস্ করে বলে ফেললাম,
—মধুমতী থাকেন কোথায়?
এবার খাওয়া শুরু করলেন সাধুবাবা। অপূর্ব স্বাদ আর গন্ধ। এমন স্বাদের মিষ্টি জীবনে খাইনি কখনও। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে এক অদ্ভুত আনন্দের সঞ্চার হলো। খেতে খেতেই সাধুবাবা বললেন,
—আমি যখন যেখানে থাকি—তখন সেখানেই থাকেন মধুমতী। আমি যে ওঁকে লাভ করেছি—সাধনায়।
কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম,
—মধুমতীর যে দেহ দেখলাম—তা কি রক্তমাংসের? দেখে তো তাই-ই মনে হলো।
পরিতৃপ্তির হাসিতে ভরা মুখ সাধুবাবার। বললেন,
—তুই যে দেহ দেখেছিস্—তা রক্তমাংসেরই। আবার ও দেহ দিব্যদেহও করে দেখাতে পারে।
অসংখ্য প্রশ্ন কিলবিল করছে মাথার মধ্যে। ঠিক মতো করতে পারছি না। বললাম,

—বাবা, মধুমতী সাধনায় সিদ্ধিলাভের ব্যাপারটা আমার জানতে ইচ্ছে করছে—আপনি কি দয়া করে বলবেন ?

এ-কথা শুনে কেমন যেন মিইয়ে গেলেন সাধুবাবা। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে পরে বললেন,

—তুই সংসারে আছিস্। বয়সও অনেক কম। তাই এ-ব্যাপারে তোকে কিছু বলবো না। তবে মধুমতী সাধনা গুরুজী আমাকে শেখায়নি। বছরখানেকের উপর হলো—অত দিন তারিখ মনে নেই। এসেছিলাম কামাখ্যা মায়ের দর্শন আর একটা বিশেষ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে। প্রতিদিনই ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে এসে মায়ের পুজো দিতাম। একদিন স্নান সেরে উঠেছি—এমন সময় ডাকলেন এক সাধুবাবা। তিনি ঘাটেই বসেছিলেন। স্নানে নামবার সময় অত খেয়াল করিনি। ডাকতেই চোখ পড়লো। বৃদ্ধ—অতি-বৃদ্ধ—অশীতিপর বৃদ্ধ সেই সাধুবাবা কাছে ডেকে বললেন,

—বেটা, একটা সিদ্ধি নিয়ে আছি বহুকাল। আজ এই ব্রহ্মপুত্রেই 'দেহ ছাড়বো আমি'।

বলে মধুমতী সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র আর কৌশলটা শিখিয়ে দিলেন আমাকে। এক-রকম জোর করেই শিখিয়ে দিলেন। ও-সবে আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। তারপর আর কি ? সাধন যখন নিলাম—তখন লেগে গেলাম সাধনে। এ-সব সাধনে সিদ্ধি আসতে বেশী দেরী হয় না।

এই পর্যন্ত বললেন। তবে একনাগাড়ে নয়। একটু থেমে একটু খেয়ে—এইভাবেই। শেষ হলো খাওয়া। এবার থালাটা রেখে বললেন,

—মধুমতী সাধনার প্রক্রিয়াটা শিখিয়ে দিয়ে সাধুবাবা নেমে গেলেন জলে। ঘাটে বসেই লক্ষ্য করছি। ডুব দিলেন। এক মিনিট, দু-মিনিট করে কেটে গেল ঘণ্টাখানেক। তিনি আর উঠলেন না জল থেকে। এমন ঘটনায় একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলাম। আগাগোড়া ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটলো—ভাববার কোন অবকাশই পেলাম না। খারাপ হয়ে গেল মনটা। ফিরে এলাম মন্দিরে। ওনার কথা মতো সাধন করে সিদ্ধি পেলাম। রোজ ভুবনেশ্বরী মন্দিরের ওখানেই বসে থাকি। লোক আসে অনেক। কাউকেই ঠিক পছন্দ হয় না। আজ তোকে দেখেই বেশ ভালো লাগলো। তাই নিয়ে এলাম।

এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আমি আপনার কাছে গেলাম। আপনি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ইচ্ছা-শক্তি লোপ পেল আমার। কেমন যেন বিবশভাবে চলে এলাম আপনার সঙ্গে। আপনি কি তখন বশীকরণ করেছিলেন আমাকে ?

কথাটা শুনে খুব হাসলেন। বললেন,

—না না বেটা, ও-সব কিছু জানি না আমি। সাধন-ভজনে থাকলে, তপস্যা করলে—দৃষ্টি আর মনের শক্তি অনেক অ-নে-ক বেড়ে যায়। নিয়ত সাধন-ভজন

আর তপস্যায় আছেন যাঁরা—তাঁদেরই এটা হবে—হবে আপনা থেকেই। তোর থেকে অনেক বেশী আমার দৃষ্টি আর মনের শক্তি। ফলে তোর দিকে তাকানো-মাত্রই আমার মনের ইচ্ছাশক্তি তোর উপর প্রভাব সৃষ্টি করলো। তোর শক্তি পেরে উঠলো না। তাই বিবশভাবে—সুড়সুড় করে চলে এলি আমার সঙ্গে।

এবার যে প্রশ্নটা করলাম—তা নিজেও ভাবিনি। হঠাৎই করে ফেললাম,

—আচ্ছা বাবা, মধুমতী কি আপনাকে ক্যাশ টাকা দিতে বা ছাপতে পারে? তা যদি পারে—তাহলে আনে সে কোথা থেকে? যদি না পারে—তাহলে কেন সে পারে না? মধুমতী তো অনেক ক্ষমতারই অধিকারিণী? টাকার প্রয়োজন হলে—সে কেমন করে টাকা দেয় আপনাকে?

প্রশ্নটা শুনে হালকা একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল মুখে। একের পর এক—এত প্রশ্ন করছি, অথচ কোন বিরক্তিই নেই সাধুবাবার। প্রশান্ত মনেই উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন সমানে। এবার বললেন,

—না বেটা, মধুমতী টাকা ছাপতে পারে না। টাকার প্রয়োজন হলে লোকালয়ে বা কোন মন্দির চত্বরে বসে থাকি। তার আগে মধুমতীকে জানিয়ে রাখি আমার প্রয়োজনের কথা। এবার আমার প্রয়োজন মতো—যার টাকা আছে—এমন ব্যক্তিকে মধুমতী তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত করে নিয়ে আসে আমার কাছে। তারপর সে আপনা থেকেই—বিবশভাবে আমার প্রয়োজন মতো অর্থ দিয়ে যায়। এটা সকলের অলক্ষ্যেই করিয়ে দেয় মধুমতী। অর্থের প্রয়োজনে এইভাবেই আমি অর্থ পেয়ে থাকি। যে সব জিনিষ মানুষের সৃষ্টি—সে সব মধুমতী দেয় মানুষেরই মাধ্যমে—তাঁর শক্তির প্রভাব সৃষ্টি করে। আর প্রকৃতির সৃষ্টি যা—তা অতি সহজেই দিতে পারে নিজে।

আরও অনেক প্রসঙ্গে—অনেক কথাই হলো। কেটে গেল অনেকক্ষণ। শেষে সাধুবাবা বললেন,

—বেটা, ভোর হতে আর অল্প কিছু সময় বাকি আছে। আর কি জানতে চাস্ বল্?

কোনরকম দ্বিধা না করেই বললাম,

—মধুমতী সাধনায় সিদ্ধির ব্যাপারটা তো বাবা দেখতে পেলাম হাতে-নাতেই। এটা তো হলো বছরখানেক। তার আগে—ছোটবেলা থেকে এতগুলো বছর তো কেটে গেল সাধন-ভজনে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধনায় কি সিদ্ধিলাভ হয়েছে?

এ প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না সাধুবাবা। একটু অস্বস্তিও বোধ করলেন না। উত্তর দিলেন খুব স্বাভাবিকভাবেই,

—বেটা, যতক্ষণ এই দেহ আছে—ততক্ষণ সব পেয়েছি—বলি কি করে? এই দেহ যত ক্ষয় হতে থাকবে—ততই তাঁর কাছে পৌঁছাতে থাকবো।

আমি একেবারে সোজাসুজিই বললাম,

—অত মার-প্যাঁচের কথা বুঝি না বাবা। সহজ করে বলুন দেখি—তাঁর দর্শন

পেয়েছেন কিনা ?
স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে ভরে উঠলো সাধুবাবার উজ্জ্বল মুখখানা। নির্বিকারভাবেই বললেন,
—বেটা, খাওয়ার পর যতক্ষণ না আবার খিদে পাচ্ছে—ততক্ষণ বুঝতে পারা যায় না—হজম হয়েছে কিনা ? এখন আমার সেই অবস্থা।
শেষ কথা এই পর্যন্ত। আর কোন কথা হলো না। বসে শুধু ভাবতে লাগলাম। কেটে গেল আরও কিছুটা সময়। এবার সাধুবাবা বললেন,
—চল্ বেটা, ভোর হয়ে এলো।
বলে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম আমিও। প্রণাম করলাম। সাধুবাবা প্রথমে হাতদুটো জোড় করে ঠেকালেন কপালে। তারপর দু-হাত আমার মাথায় স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। মুখে কিছু বললেন না। গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম দু-জনে—আবছা অন্ধকারে। ভোর হতে তখনও একটু বাকি। হাঁটতে লাগলাম—পাশাপাশি। বেশ কিছুক্ষণ। ভাবতে ভাবতেই চলছি—রাতের কথা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন সাধুবাবা। কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার পথটা দেখিয়ে দিয়ে—চলে গেলেন হাসি-মুখে।

দেবী বগলা মন্দির

কামাখ্যা পাহাড়ে যেখানে বাস স্ট্যান্ড—তার ডান দিকে এগিয়ে যেতেই পড়লো ছোট্ট একটা তোরণ। আরও একটু এগিয়ে গেলাম। বাঁ-পাশেই শ্মশানকালীর মন্দির। একচালা ঘর। কোন চূড়া নেই। ভিতরে ছোট্ট কালো পাথরের দেবীমূর্তি।
এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। এবার ডানপাশেই নেমে গেছে একটা রাস্তা। এটা পাহাড়ী পথ। পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরী। সিঁড়ি নয়—পাথর পাতা। সোজা নেমে গেছে একেবারে নীচে—বড় রাস্তা পর্যন্ত। কামাখ্যা পাহাড়ে পায়ে হেঁটে ওঠার পথ। দু-পাশেই ঘন সবুজ জঙ্গল। অসংখ্য রকমের গাছে ভরা।
ও-পথে না গিয়ে সোজাই এগোলাম। কখনও উঁচু, আবার কখনও নীচু। একটু এবড়ো খেবড়ো। কিছুদূর যেতেই পড়লো সিঁড়ি। অল্প কিছু সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতেই—সমতল। এইভাবে ক্রমশ উঠলাম উপরে। একপাশে খাড়া পাহাড়। আর একপাশে খাদ—তত গভীর নয়। শান্ত গম্ভীর নির্জন পরিবেশ। লোকজন চোখে পড়লো না। এলাম বগলা মন্দিরের কাছাকাছি। আবার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে উপরে। এই সিঁড়ির পাশেই রয়েছে বেশ বড় আকারের চৌকো পাথরের খণ্ড। এতে খোদাই করা আছে—বগলামুখী যন্ত্রম্। তন্ত্রের কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপাদি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই সামনে পাথরের দেয়াল। এগোনোর উপায় নেই। আসলে নেমে এসেছে পাহাড়। এর গায়ে পাশাপাশি খোদাই করা আছে চারটে গণেশের মূর্তি—সঙ্গে কৃষ্ণও। যে দেয়ালে খোদিত আছে—তারই গা বেয়ে নেমে এসেছে পাহাড়ী ঝরণা। আসছে উপর থেকে। জল ঝরছে অবিরত। বন্ধ হয় না কখনও। এই জল ধরে রাখা হয়েছে দেয়ালেরই গায়ে একটা চৌবাচ্চা করে। পরিষ্কার জল। জানা গেল, দেবী কামাখ্যার ভোগ রান্না হয় এই জল দিয়েই।

সিঁড়ির শেষ প্রান্তে—যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি—বাঁ-পাশেই একটা মাঝারী আকারের ঘর। বেশ উঁচু। ইটের দেয়াল। এটাই দেবী বগলার প্রাচীন মন্দির। মন্দিরে ঢুকেই ডান-পাশে আবার একটা গণেশ-মূর্তি। এটাও পাহাড়ের গায়ে—যাকে দেয়াল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে—তারই গায়ে খোদাই করা। মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। পাথরের যোনি-পীঠ। মন্দিরের কোণে পাথরের উপর সিঁদুর লাগানো একটা জায়গায—ফুল আর মালা দিয়ে সাজানো। এটাই দেবী বগলা। মন্দির-মধ্যে রয়েছে একটি যজ্ঞকুণ্ড। বেশ বড়। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কিংবা কোন সাধকের প্রয়োজনেই নির্মিত হয়েছে এটা। মন্দিরের মধ্যে ডানপাশেই রয়েছে দেবীর ভোগ রান্নার ঘর।

সকালের পর পূজারী এখানে থাকেন না। আসলে যাত্রী সমাগম হয় না বললেই চলে। বসে থাকবেন কার আশায়! তাই যাত্রীদের প্রায় পূজো দেওয়া সম্ভব হয় না।

এখানকার পরিবেশটা এত নির্জন—বেশ ভয় ভয় করে। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। এখানে—এই কামাখ্যা পাহাড়ে চুরি ছিনতাই হতে শুনিনি। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে বগলা মন্দিরে যেতে মিনিট দশেক লাগে।

সিদ্ধেশ্বর মন্দির

বগলা মন্দির দর্শন করে আবার ফিরে এলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। এখানে দাঁড়ালে অর্থাৎ বগলা মন্দিরে যাওয়ার পথে বাঁ-পাশেই পড়বে সিদ্ধেশ্বর মন্দির। মাঝারী আকারের। দেখলেই বোঝা যায়—বহুকালের প্রাচীন এই মন্দির। এর সামনেই বিশাল প্রাঙ্গণ।

পায়ে পায়ে ঢুকলাম মন্দিরে। এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ-মূর্তি। লিঙ্গের মাথাটা একটু চটা—চকলা ওঠা। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন দেবী-মূর্তি নেই। স্তূপাকারে কিছু ফুল আর বেলপাতা রয়েছে এক জায়গায়। এটিতে সকলেই প্রণাম করে থাকেন দেবীজ্ঞানে। পুরোহিতের মাধ্যমে পূজো দেওয়া যায় না। কারণ কেউই থাকেন না এখানে। সারাদিনে কয়েকবার গিয়ে আমি অন্তত কাউকে দেখিনি। কোন উৎসব অনুষ্ঠানে হয়তো তাঁদের আবির্ভাব হয়—ভক্ত সমাগমের জন্য।

কামেশ্বর মন্দির

কামাখ্যা পাহাড়ে সমস্ত মন্দিরের গঠন-শৈলী একই ধাঁচের। একই সঙ্গে কারুকার্য—কোন মন্দিরেই নেই। বাসস্ট্যান্ড থেকে কামাখ্যা মন্দিরে আসার পথেই কামেশ্বর মন্দির। গোলাকার এই মন্দিরের চূড়ায় বসানো আছে তিনটি ত্রিশূল। মাঝারী আকারের মন্দির।

নাট-মন্দিরে কিছুই নেই—পেরিয়ে এলাম মন্দিরের গর্ভগৃহে। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামতেই বাঁধানো চৌবাচ্চা। বড় নয়—দু-তিনটে ইট বাঁধালে যতটা উঁচু হয়—ততটাই। তারই মধ্যে পীঠ। সর্বদাই চুইয়ে উঠছে জলধারা। ঠিক কামাখ্যা-পীঠের মতো। এ-জল কোথা থেকে আসছে—বোঝা যায় না। অন্ধকার গর্ভগৃহে বিদ্যুতের আলো নেই। এখানকার কোন মন্দিরের গর্ভগৃহেই নেই। বাইরে আছে। এতে আর যাই হোক—মন্দিরের পরিবেশটা বেশ ভাব গম্ভীর থাকে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে মন্দিরে। মূর্তি নেই—পীঠের উপর ছড়ানো রয়েছে কিছু ফুল।

দেবী ছিন্নমস্তা মন্দির

কামেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণে—পাশেই দেবী ছিন্নমস্তার মন্দির। দেখতে একেবারে কামেশ্বর মন্দিরের মতো। এই মন্দিরের সামনেই নাট-মন্দির—পেরিয়ে মূল-গর্ভমন্দিরে ঢোকার মুখে—পাশেই রয়েছে একটি পাথরের স্বস্তিক-চিহ্ন। আকারে বেশ বড়। তার সামনেই যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞবেদি।

অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও গর্ভগৃহে নামলাম সিঁড়ি ভেঙে। মাত্র ৭/৮ ইঞ্চি সিঁড়ির পাটা। একেবারে খাড়াই সিঁড়ি। নামতে হয় বেশ সাবধানে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে ছোট্ট একটা ঘিয়ের প্রদীপ। এখানেও ওই একই রকম—বাঁধানো বেদিতে দেবীর পীঠস্থান। ক্ষীণ জলধারা উঠছে চুইয়ে। বয়ে যাচ্ছে পীঠের পাথর বেয়ে। এরই উপর ছড়ানো রয়েছে কিছু ফুল—বেলপাতাও।

তারা মন্দির

কামাখ্যা মন্দিরের সামনেই তারা মন্দির। মন্দিরটি পড়ে কামাখ্যা মন্দিরের ডান পাশেই। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয় মন্দিরে। অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানে গর্ভ-গৃহ নেই। একটি অস্পষ্ট পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে

মন্দিরে। সাজানো রয়েছে ফুল আর মালা দিয়ে। মূর্তিটির বাঁ-পাশেই আছে একটি শিবলিঙ্গ—যজ্ঞ কুণ্ডও। অন্যান্য মন্দিরের মতোই-এর গঠন-শৈলী। নতুন কোন বৈচিত্র্য নেই।
কামাখ্যা মন্দিরের সামনেই—পূর্বদিকে অবস্থিত দেবী কমলা আর মাতঙ্গীর মন্দির। ষোড়শী—দেবী কামাখ্যারই নামান্তরমাত্র। তিনি অবস্থান করছেন দেবীর মূলপীঠে।

দেবী ভৈরবী মন্দির

সোজা একটা পথ চলে গেছে কামাখ্যা মন্দিরের পিছন দিকে। মন্দির চত্বর শেষ হলো—বড় একটা তোরণ—পেরোলেই বাঁ-পাশে একেবারে ঢালু একটা পথ। পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরী—সিঁড়ি নয়। সিঁড়ির মতো থাক্ থাক্ নেমে গেছে অনেকটা নীচে। ধীরে ধীরে নেমে আসতেই বাঁ-পাশে আবার একটা রাস্তা। একটু এগিয়ে যেতেই—দেবী ভৈরবী মন্দির। মন্দিরের চার-পাশেই স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ী ঘর। লোক বসতিও যথেষ্ট।
এই মন্দিরটি অন্যান্য দশমহাবিদ্যা মন্দিরের মতো নয়। সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের। কারুকার্যখচিত মন্দির। মন্দিরের ভিতরে বাঁধানো বেদিতে প্রতিষ্ঠিত আছে কয়েকটি শিলা। ফুল আর মালা দিয়ে সাজানো। এর পাশেই একটি ত্রিশূল। বেদির বাঁ-পাশে দেবী ভৈরবীর যন্ত্রম্। ডান পাশে হোমের জন্য একটি হোম-কুণ্ড। মন্দিরের দেয়ালে রয়েছে দশমহাবিদ্যার মূর্তি—প্রতিটিই সুদর্শন। মন্দিরের সামনেই—চাতালে রয়েছে একটি হাড়িকাঠ।

দেবী ধূমাবতী মন্দির

চারদিক পাঁচিলে ঘেরা কামাখ্যা মন্দির। মূল-মন্দিরের বাঁ-পাশে—ঠিক বিপরীত দিকে, পাঁচিলের দেয়াল থেকেই নীচে নেমে গেছে একটা রাস্তা। সিঁড়ি ভেঙে একটু নামলেই দেবী ধূমাবতী মন্দির। আগের দেখা মন্দিরগুলির মতো এটি। কোন পার্থক্য নেই। মন্দিরের মাথায় পদ্মের উপর কলস বসানো—তার উপরে ত্রিশূল।
এই মন্দিরের নাট-মন্দিরটি একেবারে ছোট। ভিতরে গর্ভগৃহ সেই একই রকমের। নামতে হয় কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে। জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ। দেবীর যোনিপীঠ বাঁধানো আছে—চৌবাচ্চার মতো। ফুল বেলপাতা দিয়ে সাজানো।
ধূমাবতী মন্দির দর্শন করে আবার ফিরে এলাম কামাখ্যা মন্দির চত্বরে।

সন্ধ্যাচল পর্বতে—বশিষ্ঠ আশ্রম

আজকের আধুনিক শহর গৌহাটি—প্রাচীনকালের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। গড়ে উঠেছে ব্রহ্মপুত্র তীরে। এই শহরের গোড়া পত্তনের কথা পাওয়া যায় কালিকা-পুরাণ আর যোগিনী তন্ত্রে। রাজা নরকাসুরই এই রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। মহাভারতের ভগদত্ত—যিনি বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে—তাঁরই পিতা রাজা নরকাসুর।

কামাখ্যা পাহাড় থেকে এলাম কাছারি বাস স্ট্যাণ্ডে। এখান থেকে বাস যায় বশিষ্ঠ আশ্রম। লোকাল বাস। ঘন ঘন সার্ভিস। উঠে পড়লাম একটায়। ভাড়া বেশী নয়।

বাস চললো শহর গৌহাটির মধ্যে দিয়ে। বাঁয়ে রেখে গেলাম সুন্দর পাহাড়ী পরিবেশে গড়ে তোলা চিড়িয়াখানা। এরপর এলাম জাতীয় সড়ক। পার হলাম সেটাও। ক্রমাগত থামা আর যাত্রী তোলা—এইভাবে শহর ছেড়ে শহরতলীতে। অবশেষে বাস এসে থামলো একটি পাহাড়ের পাদদেশে। এলাম বশিষ্ঠ আশ্রম। গৌহাটি থেকে ১২ কি. মি.। সময় লাগলো প্রায় একঘণ্টা।

বশিষ্ঠ আশ্রমের বাস স্ট্যাণ্ড—পাহাড়ী পরিবেশে, পাহাড়ে ঘেরা। চা জলখাবারের দোকান আছে কয়েকটা। এখানকার পরিবেশটা দেখে মনে পড়ে গেল নেপালের দক্ষিণ-কালী মন্দিরের কথা। অবিকল পরিবেশ এই আশ্রম এবং চার পাশের। একটুখানি এগোতেই বশিষ্ঠদেবের প্রাচীন মন্দির। ছোট্ট তোরণদ্বার পেরিয়ে এলাম নাট-মন্দিরে। আরও একটু এগোতেই মূল-মন্দির। প্রবেশ-দ্বারের ডানপাশেই রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ।

ঢুকলাম বশিষ্ঠ দেবের মন্দিরে। বিদ্যুতের আলো নেই। জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলাম গর্ভমন্দিরে। আবছা আলোয় দেখলাম, কোন বিগ্রহ নেই এখানে। ডানপাশে চৌবাচ্চার মতো একটা। তার মধ্যে রয়েছে দুটি মাঝারী আকারের শিলা। কিংবদন্তী আছে, এই ক্ষেত্রটি ছিল মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের তপোবন। একদা শিলার এই আসনটিতে বসেই তিনি তপস্যা করেছেন।

বশিষ্ঠদেবের এই আসনটি কারও দ্বারা স্থাপিত নয়। এটি মন্দিরের পিছন থেকে নেমে আসা পাহাড়ের পাদদেশেরই একটি অংশ—যার উপরে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত এবং ভিতরে শিলার আসনটি বর্তমান। একেবারে সাদামাটা মন্দির। শিল্পের বিন্দুমাত্র স্পর্শও পড়েনি এই মন্দিরে।

বশিষ্ঠ আশ্রম। সত্যিই আশ্রমের পরিবেশ। সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা—তিনটি পাহাড়ী ঝরণা মিলিত হয়েছে এখানে। এক হয়ে বয়ে চলেছে মন্দিরের একেবারে

পাশ দিয়ে। নাম হয়েছে এর বশিষ্ঠ নদী। অনেকে বলেন—বশিষ্ঠ গঙ্গা। জল বেশী নয়—ছোট্ট ঝরণা। এর পিছনেই বিশাল পাহাড়। ঘন জঙ্গলে ভরা। এই পাহাড় থেকেই নেমে এসেছে ঝরণা। বশিষ্ঠ মন্দিরের পিছনে বাঁক নিয়ে—মন্দির চত্বরকে স্পর্শ করে বয়ে চলেছে তর তর করে।
প্রাচীন এই আশ্রমের পাশেই আছে আরও একটি মন্দির। এটি নব নির্মিত—মার্বেল পাথরের। সুদৃশ্য এই মন্দিরের ভিতর রয়েছে বড় একটি পাথরের চাঁই—পাহাড়েরই অংশ। তার উপর খোদাই করা আছে গণেশ, শিব আর দুর্গার মূর্তি।
বশিষ্ঠ নদীর ওপারে আছে দু-চার ঘর লোকবসতি—পাহাড়ের গায়ে। নদী পারাপারের জন্য লোহার ঝুলন্ত পুল আছে একটা। তবে কাউকেই দেখলাম না তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে। হাঁটু জল। তেমন স্রোতও নেই। তাই হেঁটেই পার হয় সকলে। বর্ষায় জল বাড়লে তখন হয়তো পুল ব্যবহার করে।
ঘন জঙ্গল ভরা পাহাড়ী পরিবেশে প্রাচীন আশ্রম, ছোট্ট পাহাড়ী ঝরণা আর কোলাহলমুক্ত পরিবেশ—চোখে না দেখলে বোঝা যায় না এর সৌন্দর্য। আপনা থেকেই মন স্থির হয়ে আসে।
কালিকা-পুরাণের কথা—ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠদেব। একদা রাজর্ষি নিমি-র অভিশাপে তিনি দেহ-হীন হন। বশিষ্ঠদেবও অভিশাপ দেন নিমিকে। ফলে দেহ-হীন হন তিনিও। অনন্যোপায় বশিষ্ঠদেব শরণাপন্ন হলেন ব্রহ্মার। জানতে চাইলেন—দেহ-হীন অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি এলেন এই নির্জন সন্ধ্যাচল পর্বতে। শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। বশিষ্ঠের তপস্যায় প্রসন্ন হলেন বিষ্ণু। বর দিলেন—দেহ-হীন অবস্থা থেকে মুক্ত হবেন মহামুনি।
এরপর বশিষ্ঠদেবের তপঃ প্রভাবে গঙ্গাকে আনলেন তিন ধারায়—সন্ধ্যা, ললিতা এবং কান্তা। এই তিনটি ধারা মিলিত হয়ে নাম হলো বশিষ্ঠ গঙ্গা। এরই সঙ্গমস্থলে বশিষ্ঠদেব প্রতিদিন স্নান, তিন সন্ধ্যা আর জল পান করে ফিরে পেলেন তাঁর পূর্ব-শরীর।
গৌহাটি কিংবা কামাখ্যায় গেলে অন্তত প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে তোলা চিড়িয়াখানা আর বশিষ্ঠ আশ্রম ঘুরে আসলে সার্থক হবে চোখ—মুগ্ধ হবে মন।

সাধুসঙ্গ—তন্ত্র, তান্ত্রিক এবং ভাঁওতাবাজী

এই সাধুবাবা বয়েসে বৃদ্ধ। তবে দেহের সাধন-সুলভ উজ্জ্বলতা এতটুকুও কমেনি। বাঁধুনিও তেমন। অনেক বয়স্কা রমণীর মতো। বেশ কয়েকটি সন্তানের মা। অথচ দেহের বাঁধন আঁটসাঁট। মনে হয় যেন বয়েস তেমন কিছুই হয়নি। পুরুষের চোখে টান ধরে। পলক ফেলতে দেয় না। সাধুবাবার চেহারা দেখে অবশ্য আমার তাই-ই মনে হলো। মাথায় জটা। তবে সারা মাথা ভর্ত্তি নয়। মাত্র

কয়েকটা জটা। নেমে এসেছে কাঁধ আর পিঠ বেয়ে। ক্যাতরানো সাপের মতো। হাত দেড়েকের উপর হবে না। মুখখানা বেশ। গালে দাড়ি আছে—লম্বা। কাঁচায় পাকায় বেশ মানিয়েছে। গলায় ছোট রুদ্রাক্ষের একটা মালা। মালা আরও আছে একটা—স্ফটিকের। রূপ সজ্জার আড়ম্বর বলতে এইটুকুই। কপালে তিলক বা ফোঁটা-টোটা কিছু নেই। গায়ের রঙ ময়লা। ময়লা গেরুয়া বসনটাও —যেটা পরনে আছে। পাশে একটা পান পাত্র—নারকেল কিংবা পাকা লাউ-এর খোলা দিয়ে তৈরী। প্রয়োজনে ভিক্ষের চালও রাখা যায়। দেখলাম, শিঙেও আছে একটা। বাঁ-পাশে রাখা ঝুলিটার উপর।

একটু কাছাকাছি গিয়েই লক্ষ্য করেছি এ-সব। সাধুবাবা বসে আছেন বশিষ্ঠ গঙ্গার পাড়ে—একটা বড় পাথর খণ্ডের উপর। ঝরণা বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। এই গঙ্গায় স্থানীয় বাচ্চা ছেলে মেয়েরা স্নান করছে—ঝাপাঝাপি করে। সাধুবাবা তাই দেখছেন—হাসছেন খুশীতে। আরও একটু কাছাকাছি হলাম। এবার আমার চোখে চোখ পড়লো সাধুবাবার। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বললেন,

—বোস্ বাবা—বোস্ বোস্।

মনে মনে যা ভেবেছিলাম—দেখলাম ঠিকই হলো। কথাতেই বুঝলাম বাঙালী। পাথর-খণ্ডটা বেশ বড়। সাধুবাবার সামনেও অনেকটা জায়গা ছিল। বসলাম সামনেই। তাতে কথা বলতে সুবিধা হয়। সাধুবাবার চোখ দুটো বাচ্চাদের উপরেই রয়েছে। মিনিট খানেক পর বললাম,

—বাবা, আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। যার উত্তর বই পড়ে পাওয়া যায় না। সাধু-সন্ন্যাসীদের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন-বোধ থেকেই পাওয়া সম্ভব। এটাই আমার ধারণা। আরও একটা ধারণা আছে—সাধু-সন্ন্যাসীরা কেউই নিজের থেকে নতুন কথা কিছু বলেন না। এঁরা প্রাচীন ভারতের ঋষিবাক্যের ধারক ও বাহক—গুরু পরম্পরায়। যদি অনুমতি দেন তো প্রাণ খুলে কথা বলি।

কথাটা শুনে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখ দুটো এখনও ওই জলক্রীড়ারত শিশুদের উপরেই আছে। এবার আমার দিকে তাকিয়ে 'বাবা' বলেই সম্বোধন করে বললেন,

—দেখ্ বাবা, লেখাপড়া আমি কিছুই করিনি। জ্ঞানেরও বড় অভাব। বিদ্যের দৌড় কেলাস্ টু পর্যন্ত। মায়ের কৃপাতেই পথ চলি। তোর প্রশ্নের উত্তর কি আমি দিতে পারবো ?

এই কথাটুকুতেই বুঝে গেলাম সাধুবাবা মাতৃসাধক। অনুরোধের সুরেই বললাম,

—পারলে দেবেন—না পারলে দেবেন না।

এবার আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন,

—তুই কি করিস্ ?

অকপটেই বললাম,
—এখন কলেজে পড়ি। থাকি কলকাতায়। এক বন্ধুই আমাকে তার খরচা দিয়ে এনেছে কামাখ্যা দর্শনে।
দেখলাম, চোখে মুখে একটা খুশীর ভাব ফুটে উঠলো সাধুবাবার। জিজ্ঞাসা করলাম,
—আপনার কামাখ্যা দর্শন হয়ে গেছে ?
হাসি মুখেই বললেন,
—হ্যাঁ বাবা, কামাখ্যায় ছিলাম দিন পনেরো। গতকাল এসেছি এখানে। এই জায়গাটা বেশ ভালো। আজ থাকবো এখানে। কাল রওনা দেবো বৃন্দাবনের পথে।
এবার বললাম,
—বাবা, এ-পথে যখন আছেন—তখন নিশ্চয়ই হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে আপনার ?
সঙ্গে সঙ্গেই বললেন বেশ দৃঢ়কণ্ঠে,
—বিশ্বাস মানে—ষোল-আনাই বিশ্বাস করি।
এতটুকু দেরী না করেই জিজ্ঞাসা করলাম,
—গৃহীদের কল্যাণের জন্য অনেক কথাই বলা আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। যেমন, তাবিজ, কবচ, মাদুলী, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি। অনেকে এ-সব বিশ্বাস করে ধারণ করেন —অনেকে শান্তি স্বস্ত্যয়নও করেন সার্বিক কল্যাণ কামনায়। কিন্তু তাতে কোন ফল হওয়ার কথা শুনি না। যারা এ-সব ধারণ বা কর্ম করেছেন—তাদের মুখ থেকেই আমার শোনা। এ-বিষয়ে আমার নিজেরও বিশ্বাস আছে। আবার লোকের কথাও অবিশ্বাস করতে পারি না। শুনলে নিজের মনেই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ভাবি—তাহলে তন্ত্রের এ-সব কথা কি সব মিথ্যে ?
এতক্ষণ বসেছিলেন একটু নুয়ে। কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলেন সাধুবাবা। কণ্ঠে এবার ফুটে উঠলো দৃঢ়তার সুর। বললেন,
—তন্ত্রের মাধ্যমে সিদ্ধ হয় না—এমন কোন অসাধ্য কাজই নেই। তন্ত্র হলো— 'প্রাক্টিক্যাল সায়েন্স'। যখনই এর কোথাও—কোনও ব্যতিক্রম দেখবি—তখনই বুঝবি, সেখানে ভাঁওতা বা গোলমাল আছে কিছু।
এইটুকু বলেই সাধুবাবা থুতনিটা রাখলেন হাঁটুর উপরে। বসে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। ভাব দেখে মনে হলো, যেন ভাবছেন—ভাবছেন বেশ গভীরভাবেই। তর সইতে না পেরে বললাম,
—বাবা, বিষয়টা যদি একটু খোলাখুলি বলেন—তাহলে বুঝতে সুবিধা হয়।
বলেই মনে মনে ভাবলাম, এই সাধুবাবার কাছ থেকে জানা যাবে অনেক কথা। মিনিট দশেক কেটে গেল নিঃশব্দে। একটা বিড়ি দিতে আপত্তি করলেন না। জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলাম সাধুবাবার দাঁত দিয়ে চেপে ধরা বিড়িটাতে। ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা টান দিয়ে বললেন,

—বাবা, ভারতীয় তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র নয়। অনেকের মতে, বেদেরই রূপান্তর-মাত্র। তবে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রকে। একটিতে নির্ধারিত হয়েছে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য বিস্তৃত ক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্তির সহজ উপায়। অপরটিতে বর্ণিত হয়েছে জাগতিক অভ্যুদয়, ঐহিক সুখসমৃদ্ধি, শান্তি ও নিরাপত্তালাভের উপায়। তবে এ-গুলো সব ষট্-কর্মের অন্তর্গত। যেমন, স্মৃতিশাস্ত্রে—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহকে বলে ষট্-কর্ম। তন্ত্রে আবার—মারণ, উচাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ, বিদ্বেষণ এবং শান্তি—ছ'টি কর্মকেই ষট্-কর্ম বলে।

এই পর্যন্ত বলেই দুটো টান দিলেন বিড়িতে। তারপর ফেলে দিলেন। কোন কথা বললাম না। সাধুবাবা বললেন,

—প্রাণহানিকর ক্রিয়াদিকে তন্ত্রে মারণ বলে। এই ক্রিয়া দ্বারা বাণমারা, শত্রু নিধন থেকে শুরু করে যে কোন পশুপাখী, মানুষ ও ফলন্ত গাছকে প্রাণে মেরে দেয়া যায়। তখনকার দিনে বিখ্যাত তান্ত্রিক ছিলেন অভিনব গুপ্ত। পাণ্ডিত্যে হেরে গেলেন আচার্য শংকরের কাছে। মারণ আভিচারিক ক্রিয়াদির প্রয়োগ করলেন আচার্যের উপর। দেখা দিল ভগন্দর রোগ। অমানুষিক কষ্ট পেলেন আচার্য। পরে শিষ্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নরসিংহ মতান্তরে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রয়োগে আভিচারিক ক্রিয়াদি খণ্ডন হলো। রক্ষা পেলেন আচার্য শংকর।

কোন কথা বলে ছেদ টানলাম না সাধুবাবার কথায়। তিনি বললেন,

—স্বস্থান হতে উচ্ছেদ করার ক্রিয়াদিকে বলে উচাটন। তন্ত্রের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তিকে সব সময় পাগলের মতো ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় রাখা যায়। কোথাও এক মুহূর্ত স্থির থাকা সম্ভব হয় না—যার উপর এই ক্রিয়াদি প্রয়োগ করা হয়।

স্তম্ভন হলো প্রবৃত্তিরোধক। মানুষের প্রবৃত্তিরোধক ক্রিয়া। এর মাধ্যমে যে কোন শক্তিমান নারী-পুরুষের সমস্ত কর্মশক্তিকে নষ্ট করে জড়-বিশেষে পরিণত করা সম্ভব। এই পর্যন্ত বলার পর সাধুবাবাকে বললাম,

—এ-সব কথা জানতে চাইছি না বাবা। জানতে চাইছি—

আমার কথায় বাধা দিয়ে বললেন,

—অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন ? আমাকে বলতে দে—তোর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবি। পরের কথা পরেই ভালো। বাড়ীতে আগে মাছ দিয়ে ভাত খাস্—না চচ্চড়ি দিয়ে ?

এ-কথায় একটু লজ্জিত হয়ে চুপ করে গেলাম। সাধুবাবাও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন,

বশীকরণ—তন্ত্রের এই ক্রিয়া দ্বারা অতিসহজেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করা যায় অব্যর্থভাবে। যেমন, মনের মতো প্রেমিক বা প্রেমিকাকে বশীভূত করে প্রণয় সাধন, শত্রু বা উপরওয়ালাকে বশীভূত করে কার্যসিদ্ধি,

অবাধ্য স্বামী বা স্ত্রীকে বশীভূত করে নিজের মনের মতো করে পরিচালিত করা ইত্যাদি।

সাধুবাবার এ-কথায় বললাম,

—বাবা, এ-সব কথা তো ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু প্রমাণ তো কিছু দেখি না।

একটু বিস্ময়ের সুরেই বললেন,

—কেন, তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি উডরফ্ সাহেবের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস্। তাঁর কথাই বলি শোন্। একদিন এক মেমকে দেখার পর মনে মনে ভালোবেসে ফেললেন সাহেব। প্রেম বলে কথা! তাই ধৈর্য ধরতে পারলেন না তিনি। একদিন অকপটে জানালেন তাঁর মনের কথা। বেঁকে বসলেন মেমসাহেব। এক কথায়—না। প্রেম টেম পছন্দ করেন না তিনি। নিরাশ হলেন বিচারপতি। আইনের কোন ধারায় প্রেমকে ধরতে পারলেন না তিনি।

কথায় একটু ছেদ টেনে বললাম,

—কিছু মনে করবেন না বাবা। একটু আগেই আপনি বলেছেন—বিদ্যের দৌড় আপনার ক্লাস 'টু' পর্যন্ত। এ-সব কথা আপনি জানলেন কি করে?

হাসি ফুটে উঠলো মুখে। বললেন,

—লেখাপড়া না শিখলে—ইস্কুলে না গেলে কি এ-সব কথা জানা যায় না! লেখাপড়া জেনেও তো অনেকে অনেক কিছুই জানে না। ঠিক কি না বল্?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই তিনি আবার শুরু করলেন,

—বিচারপতি উডরফ্ একদিন শুনলেন, প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কথা। তিনি নাকি অসাধ্য সাধন করেন। আর সবুর সইলো না। পাঠালেন তদানীন্তন রেজিস্ট্রারকে—শিবচন্দ্রের কাছে। রেজিস্ট্রার জানালেন সাহেবের মনের কথা। হাসতে হাসতে বললেন শিবচন্দ্র—এটা তো সামান্য ব্যাপার। এ আর বেশী কথা কি! তবে শুনে আসুন, সাহেব একটা সিঁদুরের টিপ্ পরতে রাজী আছেন কি না?

একটু থেমে সাধুবাবা বললেন,

—সাহেব বিচারপতি উডরফ্ রাজী—এক কথায়। শিবচন্দ্র বশীকরণ মন্ত্রে সিঁদুর পড়া দিলেন সাহেবকে। যথা নিয়মে টিপ্ পড়লেন কপালে। গেলেন প্রেমিকা মেমের কাছে। সম্মোহিতের মতো মেম তাকিয়ে রইলেন সাহেবের মুখের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন সব ওলট্-পালট হয়ে গেল। পরিবর্তন ঘটে গেল মনের। এবার আর 'নো' নয়। বশীভূত হলেন মেমসাহেব। আশা পূর্ণ হলো উডরফের। পরবর্তী সময়ে আন্তরিক প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটলো বিবাহে। তন্ত্রের এই অত্যাশ্চর্য মহিমায় আকৃষ্ট হলেন সাহেব। তন্ত্রমতে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করলেন শিবচন্দ্রের কাছে। তারপর দীর্ঘদিন ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে বহু লুপ্ত তন্ত্রের উদ্ধার করে গুরুদক্ষিণা দিলেন সাহেব বিচারপতি উডরফ্।

বৃদ্ধ সাধুবাবাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করেছি। অথচ এখন কোথা থেকে যে কোথায় যাচ্ছেন তিনি—বুঝতে পারছি না। একটানা কথা বলে একটু বিশ্রাম নিলেন। একটা বিড়ি এগিয়ে দিলাম। কোন আপত্তি করলেন না। দেশলাই দিলাম। বারুদে ঘষা মারতেই ফস্। জ্বলে উঠে নিভে গেল কাঠিটা। এ-দেশে এক খোঁচাতে কোন কাজই হবার নয়। আর একটা কাঠি জেবলে ধরালেন। বেশ মৌজ করে টান দিয়ে বললেন,

—ষট্-কর্মের মধ্যে বিদ্বেষণ হলো—প্রণয়ী বা অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্কের মধ্যে দ্বেষ-জনক ক্রিয়া। স্বামী-স্ত্রী বা প্রেম-প্রীতির সম্পর্কে অশান্তি বা বিচ্ছেদ এবং যে কোন হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কে নিখুঁতভাবে ফাটল ধরিয়ে দেয়া যায় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

একটু থেমে শেষ টান দিলেন বিড়িতে। তারপর পাথরে আগুনটা ঘষে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে বললেন,

—তন্ত্রে ষট্-কর্মের শেষ কর্মটি হলো—শান্তি। অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য, সাপ বিছের বিষহরণ, সুখপ্রসব, মৃত বৎস্যা দোষ শান্তি, আপদুদ্ধার, রাজরোষ, গ্রহদোষ—এমন অসংখ্য দুর্ভোগ নিবারিত হয়। এই কর্মের দ্বারা মানুষের অশেষ কল্যাণ করা সম্ভব।

আমি শ্রোতা। সাধুবাবা বক্তা। বলে চলেছেন তিনি

—এতক্ষণ তোকে যে-সব কথাগুলো বললাম—তন্ত্রে এই কর্মগুলিকে বলে আভি-চারিক ক্রিয়া। বেদে কর্ম ও জ্ঞান-কাণ্ড নামে দুটি কাণ্ড আছে। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সাধনা জ্ঞান-কাণ্ডের আর আভিচারিক ক্রিয়াদি কর্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত। তন্ত্রে জাগতিক সমৃদ্ধিলাভের জন্য অনেক উপদেবতার সাধনের কথাও বলা আছে। তবে এ-সাধনার আধ্যাত্মিক পরমার্থ লাভ হয় না। একে বলে উপবিদ্যা। এই উপবিদ্যার সাধনা—মূল ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সাধনা থেকে অনেক সহজসাধ্য। অল্পদিনের মধ্যেই এর সিদ্ধিলাভ হয়। উপবিদ্যায় সিদ্ধ সাধক অতি অদ্ভুতভাবে ইন্দ্রজালের মতো চমকপ্রদ প্রত্যক্ষ-ফল তাঁর শরণাপন্ন অর্থীকে অল্পকালের মধ্যেই দিতে পারেন অনায়াসে।

লেখাপড়া জানেন না সাধুবাবা। অথচ কথাবার্তা শুনে তা মনেই হচ্ছে না। অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোন প্রশ্নই এখন আর করছি না। কথায় ছেদ টানলে বিরক্ত হতে পারেন—এই ভেবে। এবার তিনি চোখ বুজে বললেন,

—অলৌকিক ক্ষমতা লাভের জন্য তন্ত্রে শব-সাধন, পাদুকা-সাধন, কর্ণপিশাচীসাধন, মধুমতী সাধন ইত্যাদি অনেক সাধনের কথাই আছে—তা-ছাড়াও আছে ভূত প্রেত পিশাচ সাধনও।

এবার একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম.

—কর্ণপিশাচী সাধনটা কি ?

চোখ খুলে তাকালেন আমার মুখের দিকে। একবার দেখে নিলেন চারপাশটা।

তারপর বললেন,

—কর্ণপিশাচী হলো উপদেবতা। দেবতার স্তরে নয় এরা। তবে তাদের মতো ধারণ করে অনেক শক্তি। অপদেবতা নয়। ভূত প্রেত পিশাচকেই বলে অপদেবতা। এই দেবীর সাধনায় আপেক্ষিক সর্বজ্ঞতা লাভ হয়। অপরের মনে কি চিন্তার উদয় হয়েছে কিংবা প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেবী অন্যের অগোচরে সাধকের কানে কানে জানিয়ে দেন। যেমন ধর্, প্রশ্নকর্তার কি নাম, কোথা থেকে আসছে, কি উদ্দেশ্য, কি প্রশ্ন নিয়ে, কবে কি হবে, কি করলে ভালো হবে—এই সব আর কি।

সাধুবাবা একটু নড়ে চড়ে বসলেন। এতক্ষণ বসে ছিলেন একইভাবে। এবার কণ্ঠস্বর দৃঢ় হয়ে উঠলো। বলিষ্ঠতার সুরেই বললেন,

—তন্ত্রের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দেখেছি জীবনে বহুবার—বহু সাধু সঙ্গে। এতে আমার যে ধারণা দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়েছে, তাতে এ-টুকু বুঝেছি—তন্ত্রের মন্ত্র এবং তার নির্ভুল প্রয়োগে মানুষের অনেক রকম ক্ষতি করাটা যত সহজ—উপকার করা সব-ক্ষেত্রে তত সহজ নয়। যেমন ধর্—মারণ, উচাটন, বশীকরণ, বিদ্বেষণ, বগলামুখী, বগলাপ্রত্যঙ্গিরা, শ্মশানকালীর কবচ ইত্যাদির সাহায্যে শত্রুর উপর ভয়ংকরভাবে প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। অশেষ নির্যাতনের মাধ্যমে রোগগ্রস্থ করে যেমন পাঠানো যায় মৃত্যুর হিম অন্ধকারে—তেমনই বাবা, শান্তি স্বস্ত্যয়নের দ্বারা দুর্বার বিপত্তি, গ্রহবৈগুণ্য, রাজরোষ, দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকেও রক্ষা করা যায় অনায়াসে।

এবার একটু নীচু স্বরেই বললেন সাধুবাবা,

—তবে একটা কথা আছে। কোন তন্ত্র-সাধক বা তান্ত্রিক যদি প্রলোভনে বশীভূত হয়ে অথবা অকারণে অন্যের অনিষ্ঠ করতে থাকেন—তবে তাঁর সাধনলব্ধ শক্তি অতি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সাধককে ভগবান কখনও ক্ষমা করেন না। নিঃস্বার্থ-ভাবে লোক-কল্যাণে শক্তি প্রয়োগ করলে তন্ত্রার্জিত শক্তি কখনও নষ্ট হয় না।

এ-কথায় প্রশ্ন এলো মনে। জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, বর্তমান সমাজে তান্ত্রিক যারা—তাদের সম্পর্কে…

আমার কথাটাকে হাতের ইসারায় বন্ধ করতে বলে তিনি বললেন,

—বর্তমানে ধর্মকে ভাঁড়িয়ে এক-শ্রেণীর ভ্রষ্ট তান্ত্রিক আর বৈরাগীদের অর্থোপার্জনের সোজা পথ হয়েছে এই তন্ত্র। কারণ তন্ত্রের লৌকিক-অলৌকিক, সত্যমিথ্যা কিংবদন্তী—দেশের অধিকাংশ নারী-পুরুষের মনের মধ্যে বদ্ধমূল। ফলে তান্ত্রিকদের মনে করে অসীম শক্তিমান। ভয়ে ও ভক্তিতে পড়ে এদের খপ্পরে। তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যেটুকু বুঝি—জোয়ান বয়সের বউ আর পয়সা ধরে রাখা যতটা কঠিন—ঠিক ততটাই কঠিন তান্ত্রিক হওয়া।

বাবা, খরিদ্দারের অভাব নেই—অভাব হয় না কোন কালেই। কারণ বিভিন্ন সমস্যার কষাঘাতে আজকের মানুষ জর্জরিত—বিভ্রান্ত—বিপন্ন। সংসারের নানা অভাব অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে ছুটে যায় এদের কাছে। কারণ এরা নাকি স্বর্গের 'টপ্‌বেস্ট' সুন্দরী মেনকা রম্ভা থেকে শুরু করে এক তুড়িতে ইন্দ্রের

সমস্ত রাজস্ব—কুবের-এর পৈতৃক ধন পাইয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে।
সাধুবাবার কথায় হেসে ফেললাম। তিনি থামলেন না। বললেন,
—একটু খোঁজ করলেই দেখতে পাবি—অধিকাংশ গৃহীদেরই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ান আর ফ্যামিলি জ্যোতিষীর মতো বাঁধা আছে ফ্যামিলি তান্ত্রিক। ছেলের ডাইরিয়া থেকে শুরু করে প্রমোশন আটকানো পর্যন্ত—কোন কিছু হলেই শরণাপন্ন হয় তান্ত্রিকবাবার।
মন দিয়েই শুনছি কথাগুলো। এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ সাধুবাবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন,
—বাবা, সমাজে এখন একশ্রেণীর ভগবান পাওয়া আধা মহাপুরুষের মহামারী লেগেছে। এদের অনেকেই বিক্রমাদিত্যের মতো তাল বেতাল সিদ্ধ হয়ে শুক্র-তারল্যের কবচ—মহাশ্মশানে ত্র্যয়স্পর্শীয় অমানিশায় বামাক্ষেপার স্টাইলে বসে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা সরস্বতী কবচের মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে বোর্ড বা ইউনিভারসিটি নামক এক রমণীয় খোঁয়াড়ের খাতা হারানো সত্ত্বেও পরীক্ষার বৈতরণী পার—মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের মাধ্যমে মৃত্যুর হাত থেকে অব্যর্থ রক্ষা করে বিভীষণের অমরত্ব দান—রাস্তার অভুক্ত, অর্ধভুক্ত ভিখারীদের অলক্ষ্মীত্ব দূর করে সম্পদলাভের জন্য ধনদা বা মহালক্ষ্মী কবচ—ইলেকশান, প্রেমপ্রীতি, কর্মলাভ থেকে শুরু করে সর্ব কাজে বিজয় লাভের জন্য সর্ববিজয় কবচ—নিরুদ্দিষ্টকে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনা—বিচারপতির মতিভ্রমের কারণ ঘটিয়ে হত্যাকারীর জয়লাভের জন্য বগলামুখী কবচ—ভাড়াটে উচ্ছেদ আইনকে তন্ত্রের অমোঘ ক্রিয়া দ্বারা রোধ করে ভাড়াটে উচ্ছেদ—বাপ মায়ের অবাধ্য বাঁদর সন্তানকে বাধ্য করা—পনেরো বছরের মেয়ে থেকে পঁচাত্তর বছরের বুড়িকে আকর্ষণের জন্য বশীকরণ কবচ—কানা খোঁড়া কুঁজো থেকে বিধবা কুমারীর বিবাহ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রজাপতি কবচ—ফুল বা রুমাল পড়া কিংবা সিঁদুরের টিপের সাহায্যে প্রণয়-সাধন শুরু করে লিঙ্গ-শিথিলতার জন্য কবচ দিয়ে তন্ত্রকার্য করছে·কিছু কামাখ্যা ফেরৎ অবতারেরা।
উত্তেজিত কণ্ঠে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন সাধুবাবা। মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর বললেন,
—এত কথার পর তুই হয়তো প্রশ্ন করবি—তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদিতে তাহলে কি প্রকৃতই কোন কাজ হয় না—নাকি সব ভাঁওতা? যদি হয় তবে কেমন করে—না হলে কেন হচ্ছে না—তাই তো?
মাথাটা নেড়েও মুখে বললাম,
—হ্যাঁ বাবা, প্রথমে এই প্রশ্নই তো আপনাকে করেছিলাম। একমাত্র প্রশ্ন তো আমার এটাই।
আনন্দিত হয়ে উঠলেন সাধুবাবা। প্রসন্নতায় ভরে উঠলো মুখখানা। একবার দেখে নিলেন বশিষ্ঠ-গঙ্গার বয়ে যাওয়া ছোট ছোট ঢেউগুলো। তারপর বললেন,

—এ-কথা একেবারে সত্য জানবি—তন্ত্রের একটা বর্ণও মিথ্যা নয়—হবে না—হতে পারে না। মানুষ যা চায়—পার্থিব সব কিছু থেকে পরম ব্রহ্মপদ পর্যন্ত—সমস্ত কিছুই দিতে পারে তন্ত্র। একাধারে তন্ত্র যেমন বস্তুতান্ত্রিক—তেমনই তুরীয় ভূমিলাভের সহায়কও। তবে এখানে একটা কথা আছে বাবা। নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াবান সাধক ছাড়া তান্ত্রিক ক্রিয়াদিতে অন্য কারও অধিকার নেই—তন্ত্রের মন্ত্র প্রয়োগে বিশেষ কোন ফলই হবে না। নিয়মে তৈরী হলে—পরে সুন্দর ফল আসবে হাতে।

জানতে চাইলাম,

—নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াবান সাধক কে এবং কাকে বলে?

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন,

—প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণ, জপ, ইষ্ট বা গুরুর পূজার মাধ্যমে নিত্যকর্ম এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি হলো দেবপর্ব তিথিসহ অন্যান্য তিথিতে করণীয় কার্য—যেমন, পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডদান সত্ত্বেও যিনি প্রতি-বছর নিয়মিতভাবে পূর্ব পুরুষদের শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়াদি শাস্ত্র-সম্মতভাবে নিষ্পন্ন করেন—তিনিই নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াবান সাধক। একমাত্র তাঁরই রয়েছে তন্ত্রোক্ত কর্মে অধিকার। সেখানে সাধকদের জাতধর্মের কোন ব্যাপার নেই। এ-রকম কোন ব্যক্তি তন্ত্রের মাধ্যমে কোন কাজ বা কবচ প্রস্তুত করলে—তা জীবন্ত এবং ধারণমাত্র ফলদায়ক হয়ে ওঠে।

এই সব কথোপকথন চলছে। এমন সময় এলেন দু-জন ভদ্রলোক। বসলেন আমাদেরই সামনে। প্রণামটুকুও করলেন না। আমি আর সাধুবাবা একবার চোখাচোখি করলাম। কথা বন্ধ হলো। ওদের সঙ্গেও কোন কথা বললাম না। সাধুবাবাও কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সোজাসুজি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

—বাবা, আমার বিশ্বাস—এইসব ক্রিয়াগুলো যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করে না প্রায় কেউই। ফলে যারা তাবিজ কবচ মাদুলী যন্ত্রম্ বা গৃহীদের কল্যাণের জন্য যে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কাজ করেন—তা ফলদায়ক হয়ে ওঠে না। তাছাড়া কবচ প্রস্তুত বা তন্ত্রের যে কোন কর্মেই চাই মন্ত্রশুদ্ধি এবং শুদ্ধমন্ত্রের সঠিক প্রক্রিয়ায় নিয়মমাফিক প্রয়োগ। তা না হলে কোন তাবিজ কবচ বা তন্ত্রকার্যই ফলপ্রসূ হবে না—কিছুতেই।

ভদ্রলোক দু-জনের একজন সিগারেট বের করে ধরালেন? সাধুবাবাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না—তিনি ধূমপান করেন কিনা? এমত অবস্থায় একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে দিলাম সাধুবাবার হতে। কয়েকটা মেজাজী টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন,

—তন্ত্রশাস্ত্রে সমস্ত মন্ত্রই লেখা আছে। কিন্তু অনেক সিদ্ধমন্ত্রই সম্পূর্ণ লেখা নেই। কারণ ওই মন্ত্রগুলি অত্যন্ত গোপনীয়। এটা তন্ত্রেরই কথা—মায়ের উপপতি থাকলে

সন্তান যেমন তা সযত্নে গোপন করে—ঠিক তেমনই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুপ্তি প্রয়োজন। সেইজন্যেই লেখা নেই। বই দেখে মন্ত্র প্রয়োগ করলে কিছুই হয় না। তন্ত্রের ক্রিয়াগুলো যথাযথ অনুষ্ঠিত না হলে কোন মন্ত্রই ফলপ্রসূ হয় না—হবেও না কখনও।

এই পর্যন্ত কথাগুলো শুনে ভদ্রলোক দু-জন উঠে দাঁড়ালেন। যেতে যেতে একজন আর একজনকে বললেন, 'যত্ত শালা দু'নম্বরী কথাবার্তা।' এরা বাঙালী বলেই মনে হলো। সাধুবাবা আর আমি মুখ চাওয়া চাইয়ি করে হাসলাম। কেউই কোন মন্তব্য করলাম না। তিনি আবার শুরু করলেন,

—বাবা, তন্ত্রের প্রক্রিয়া যত সহজ এবং মন্ত্রগুলো যত সরলই হোক না কেন—উপযুক্ত গুরু ব্যতিরেকে তন্ত্রের কোন কাজই আশুফলদায়ক হয় না। কেন জানিস্—শুদ্ধমন্ত্র ও তার সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ-প্রণালী সকলের জানা নেই। এটা সব সময়েই চলে আসছে বংশ অথবা সাধু-সন্নাসী কিংবা গুরু-পরম্পরা—মুখে মুখে। বইতে এ-সব পাওয়া যায় না।

এবার বললেন উদাহরণ দিয়ে,

—যেমন ধর্, মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের কথা। তন্ত্রে আছে—ওঁ জুং সঃ। এটা মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ প্রস্তুতের পূজার মন্ত্র। এই মন্ত্রের পর আরও একটা শব্দ যোগে হয় জপের মন্ত্র। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে জপের মন্ত্রের কোন উল্লেখই নেই। কদাচিৎ কেউ পূর্ব পুরুষ সূত্রে অথবা সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা গুরুকৃপায় মন্ত্রটি জানেন। অথচ দেখ্, জনকল্যাণার্থে নিযুক্ত তন্ত্র ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ স্থানলাভ করেছে। আমার বিশ্বাস, যে দেশে শতকরা দু-একজনও জপের মন্ত্রটি জানেন কিনা সন্দেহ যেখানে—সেখানে ঢালাও এই কবচ তৈরী হচ্ছে কেমন করে?

সাধুবাবা না থেমেই বলে চললেন,

—এখানেই শেষ নয় বাবা। যেকোন শক্তিশালী কবচ প্রস্তুত করতে হলে বাধ্যতামূলক মূল-মন্ত্রের জপ করতে হবে এক লক্ষবার। তবে ফলদায়ী কবচ সম্ভব। যেখানে মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের জপের মন্ত্রই অধিকাংশের জানা নেই—সেখানে লক্ষবার জপের প্রশ্নই তো অবান্তর।

কোন প্রশ্ন করার সুযোগই দিচ্ছেন না সাধুবাবা। তবে আমার ভিতরে জমে থাকা প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাচ্ছি। ভাবিইনি কখনও—এমনভাবে সাধুবাবাকে পেয়ে যাবো। অমায়িক সাধুবাবা। কোন বিরক্ত করলাম না কথার ছেদ টেনে। না থেমেই তিনি বললেন,

—তা-ছাড়া বাবা, প্রতিটি তন্ত্রকার্য বা কবচ প্রস্তুতই শ্রমসাধ্য, ব্যয় ও সময়-সাপেক্ষ। যেমন ধর্, নিয়মকানুন বিধিসহ প্রতিদিন কয়েক-ঘণ্টা জপহোমাদি এবং লক্ষবার জপের কিছু কিছু করে কবচের পুরশ্চরণ করতে কমপক্ষে সময় লাগে ২/৩ মাস। সুতরাং একটু ভাবলেই বুঝতে পারবি—আজকে যারা তন্ত্রের মাধ্যমে তাবিজ কবচ শান্তি-স্বস্তয়ন ইত্যাদি করেন—তাতে প্রকৃত কোন কাজ হওয়া উচিত কি না?

অথচ দেখ্, আজকাল কথায় কথায় পঞ্চ 'ম'-কারে সব সিদ্ধ হবে লম্বা চওড়া ফতোয়া দিয়ে, দাম্পত্য কলহে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক মিলন—মনমতো পাত্র বা পাত্রীকে বশীকরণ—নিরুদ্দিষ্টকে ফিরিয়ে আনা—বন্ধ্যার সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা দান থেকে শুরু করে ভাড়াটে উচ্ছেদ করে এক 'নাইট'-এ বাড়ীওয়ালাকে ঘর পাইয়ে দিচ্ছে ছুঃ করে।

এইটুকু বলেই সোজা হয়ে বসলেন। বাঁপাশে ঝোলার উপরে রাখা শিঙেটার উপর হাতটা রেখে—কেমন যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধ সাধুবাবা ঝড়ের বেগে বলে চললেন,

—আমি শুধু ভেবে মরি—সর্ববিজয় কবচ জানা সত্ত্বেও সব কিছু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য) জয় করতে পারছে না কেন এরা—ধনদা বা মহালক্ষ্মী কবচ জেনে নিজেরা ধনবান না হয়ে অন্যকে বড়লোক করতে চাইছে কেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে—দাম্পত্য কলহে যারা মিলন ঘটাতে চায়, তাদের সংসারে অশান্তি কেন—সরস্বতী কবচ জেনেও এরা ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত হয় না কেন—হয় কেন এদের অনেকের ছেলে অশিক্ষিত, মূর্খ, চিট্—মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ জানা সত্ত্বেও এরা অকাল মৃত্যু রোধ করতে পারছে না কেন?

হাঁ করে কথা শুনছি। তাকিয়ে আছি মুখের দিকে। উত্তেজিত কণ্ঠেই সাধুবাবা বললেন,

—পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসার যার যোগ্যতা হয়েছে—হারানো বিশ্বাসকে তন্ত্রের মাধ্যমে যারা ফিরিয়ে আনতে চায়—দৈবশক্তি যার করায়ত্ব—জ্ঞাননেত্রে যিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান ঘটনাবলী টেলিভিশানের মতো দেখেন—যিনি তাল-বেতাল ও পিশাচসিদ্ধ—যিনি অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত—তারা তুচ্ছ স্বপ্নদোষ আর লিঙ্গ-শিথিলতার কবচ করতে যান কেন? হিমালয় ছেড়ে এদের তো লোকালয়েই থাকা উচিত নয়—কবচ বেচার জন্য। রোগ সারানোর জন্য পাড়ার হারান কবিরাজ থেকে শুরু করে হাসপাতালে তাবড় তাবড় বিলাত ফেরৎ ডাক্তার আছেন—এঁদের এ-ব্যাপারে এতো মাথা-ব্যথা কেন?

এবার মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন। সুরটা অনেক নেমে এলো সাধুবাবার। উত্তেজনাও কমে গেল। শান্তভাব এলো কথায়। আনন্দের ভাব নিয়েই বললেন,

—একটা কথা জানবি বাবা, সংসারে শুধুমাত্র পারমার্থিক চিন্তা নিয়ে কেউই টিকে থাকতে পারে না। আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্যের প্রয়োজন আছে সংসারে। তাই বলে কোন মানুষের পক্ষেই রোগ, শোক, দুঃখকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তন্ত্রবিধির সঠিক প্রয়োগে সবই পেতে পারেন প্রার্থিগণ। তন্ত্রের মহিমা অতি অপূর্ব। তথাকথিত অনধিকারী তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে কেউ যদি প্রতারিত হয়ে তন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা আস্থা হারায়—তাতে ভারতীয় তন্ত্রের কিছু যায় আসে না। তন্ত্র চিরন্তন-শাশ্বত-সনাতন সত্য। এর মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই। অথচ

তন্ত্রের নামে চলছে অর্থের শোষণ। অসহায় মানুষগুলো মরছে শিয়াল কুকুরের মতো। অর্থের শ্রাদ্ধ করে—নষ্ট করছে পবিত্র নির্মল মানসিকতা—ভরিয়ে তুলছে হতাশা—হচ্ছে শুধু বিভ্রান্ত।
এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু হাঁপ ছাড়লেন। কেটে গেল মিনিট পাঁচেক। আমার মুখের দিকে তাকাতেই বললাম,
—বাবা, তাহলে মানুষ এর থেকে বাঁচবে কি করে? আপনি তো বলেই খালাস হয়ে গেলেন।
হাসিমুখেই বললেন সাধুবাবা,
—আমি তো আগেই বলে গেছি—তন্ত্রের নামে কি চলছে—কি হয়? বাঁচার একটাই পথ—ও-সব পথে না যাওয়া—ও-ব্যাপারে মাথা না ঘামানো। তাতে কষ্ট থাকলেও—অনেক বেশী ভালো থাকবি। ওই সব করতে গেলে—পয়সাও যাবে—শান্তিও যাবে।
এবার বললাম,
—বাবা, তন্ত্র আর তান্ত্রিক—এ-দুটো কথার প্রকৃত অর্থ কি?
সাধুবাবা বললেন,
—খুব সংক্ষেপেই বলি। তনুর (দেহ) ত্রাণার্থে (পার্থিব বন্ধনমুক্তি) যা যা করা প্রয়োজন—তা করার নামই তন্ত্র। যিনি তনুর ত্রাণ করেন—তিনিই তান্ত্রিক। অর্থাৎ পার্থিব বন্ধনমুক্তকামী-মাত্রই তান্ত্রিক।
গর্ভধানাদি দশবিধ সংস্কার, শৌচাশৌচ বিচার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, সামাজিক ও পারিবারিক নিয়ম, লোক আবশ্যকীয় বিষয় এবং নরনারীর যৌন সংযমের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুস্থ সমাজ জীবনযাপন থেকে শুরু করে পারত্রিক মুমুক্ষু ব্যক্তির ব্রহ্মসাধন পর্যন্ত—সমস্ত নিয়মকানুনবিধি যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে—তার নামই তন্ত্রশাস্ত্র।
একটু থেমে আবার বললেন,
—আবার এইভাবেও বলা যায়, তন্ত্রশাস্ত্র প্রবক্তা ভগবান শংকর দেহবাদী। বিষ্ণু মনোবাদী আর ব্রহ্মা হলেন আত্মবাদী। শংকর দেহকে অস্বীকার করেননি। তন্ত্রে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন দেহকে। তাই সমাজে নরনারীর যৌনসংযম এবং মানসিকতার সহজ সরল ও স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণতা বজায় রেখে ঈশ্বরতত্ত্বে পৌঁছানোর জন্য বিধি-নিষেধের যে শাস্ত্র—তার নামই তন্ত্রশাস্ত্র।
কথায় বাধা দিলাম না। তিনি বলে চললেন,
—বাবা, সংসারে শিশ্নোদর-সর্বস্ব মানুষের মন ভোগমুখী। এ-কথা বুঝেছিলেন ভগবান শংকর। আরও বুঝেছিলেন, সাংসারিক সর্ববিধ ভোগ থেকে বিরত করিয়ে কাউকে অধ্যাত্মবাদে পরম পথের সন্ধান দিতে চাইলে তাতে জীবের মন সায় দেবে না। প্রাকৃতিক নিয়মেই রক্তমাংসের এই দেহ সার্বিক ভোগ না করে থাকতে পারে না। তাই তো তিনি মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন সহকারে অধ্যাত্ম-সাধনার

মাধ্যমে সংযমের সঙ্গে ভোগ করিয়ে মহত্তর দিব্যজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন তন্ত্রের মাধ্যমে।

বাবা, তন্ত্র হলো ভক্তি ও অনুভূতি-প্রধান যোগ ও উপাসনা শাস্ত্র। তন্ত্র সাধনায় চরম ভোগ সুখ থাকলেও অসংযমের কোন স্থান নেই। এক কথায় বলতে পারিস্, শুধু ভোগের জন্য ভোগ করা নয়—ভোগ-সাধন বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সাধন-সংমিশ্রণে ক্রমশ ক্রিয়ার অভ্যাসদ্বারা ভোগবাসনা নিবৃত্ত করার জন্যই তন্ত্র। তন্ত্রের সাধনক্ষেত্র বিশাল ব্যাপক ও বিস্তৃত। পঞ্চমুখে পঞ্চানন তন্ত্রে যা বলেছেন—তা আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভই তন্ত্রের মূল ও চরমতম লক্ষ্য।

প্রশ্ন করেছিলাম একটা—অথচ বিষয়টা বোঝাতে কত কথা বলতে হল সাধুবাবাকে। আনন্দে মনটা আমার ভরে উঠলো। হাসতে হাসতে আবার সেই আগের কথাটাই বললাম,

—বাবা, আপনি প্রথমে বলেছিলেন, 'কেলাস টু পর্যন্ত' আপনার বিদ্যের দৌড়। কিন্তু এতক্ষণ আপনার কথা শুনে তো তা মনেই হলো না। আপনি কি আপনার শিক্ষার কথাও গোপন করেছেন?

হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসিতে ফেটে পড়লেন সাধুবাবা। বললেন,

—না বাবা, সাধু আমি। তোর কাছে মিথ্যে বলে বা কথা গোপন করে কি লাভটা হবে বলতে পারিস্? এ-সব কথা জেনেছি আমি সাধুসঙ্গ করেই।

'সাধুসঙ্গ করে'—কথাটা শুনে অবাক হয়ে বললাম,

—আপনি নিজে সাধু। সাধু হয়ে আবার সাধুসঙ্গ কেমন?

খুব খুশী মনেই বললেন,

—'সাধু' মানেই তো আর এই নয় যে—সব জেনে বসে আছি। এই জীবনে—এই সাধন জীবনে অনেক সময় আসে মনের বিভ্রান্তি—হতাশা। সব সাধুই গুরুমুখে শুনে থাকেন বিভিন্ন শাস্ত্রের কথা—সাধনজীবনের গোপন কথা। সাধন-পথে কত বাধা আসে জানিস্! মনের কখন ওই অবস্থা এলে সাধুসঙ্গ করলে সাধু-মনের বিভ্রান্তি কাটে—কাটে হতাশা। সাধুসঙ্গের সময় নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। তাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানও বাড়ে। পুঁথি পড়ে বিদ্যালাভই কি সব? পুঁথি পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়—আর কিছু হয় না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি প্রেম শরণাগতি—এটা বাবা সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গ ছাড়া কিছুতেই আসবে না—হবারও নয়। সেই জন্যেই তো সাধু হলেও সাধুসঙ্গ করতে হয়।

ছোট্ট প্রশ্ন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন অনেক কথা বলে। কোন বিরক্তিই নেই সাধুবাবার। অথচ সংসারে—বাপ-মায়ের কেউ পড়াতে বসেছে শিশুকে। বসা থেকে ওঠা পর্যন্ত—দাঁত খিঁচুনি আর বিরক্তির অন্ত নেই। একবারও ভাবে না—শিশুকালে নিজের মাথাটা কেমন ছিল! এ-দিকে বেলাও বাড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম,

—আপনি কি ব্রহ্মচারী—না বিয়ে-থা করেছিলেন?

স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন,

—না বাবা, ও-পথে পা বাড়াইনি।

এবার প্রশ্নের পা বাড়িয়ে দিলাম সাধুবাবার ব্যক্তিগত জীবন-প্রশ্নে,

—বাড়ী কোথায় ছিল আপনার—গৃহত্যাগই বা করলেন কেন ?

এ-কথায় একটু অস্বস্তিবোধ করলেন সাধুবাবা। মুখ দেখেই তা মনে হলো। অস্বস্তিভরা মুখেই বললেন,

—বাড়ী ছিল আমার রাজসাহীতে। আমার ফেলে আসা জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিস্‌নে।

হাতদুটো সাধুবাবার পায়ে রেখে—একান্ত অনুরোধের সুরেই বললাম,

—বাবা, অযাচিতভাবে কত কথা বললেন। আপনার অনুগ্রহের কথা ভুলবো না কখনও। দয়া করে যদি কিছু বলেন—কৌতূহলটা মিটে যায়।

পা থেকে হাতদুটো আমার সরিয়ে দিলেন। বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন সাধুবাবা। উদাসীনতায় ভরে গেল মুখখানা। কেমন যেন হয়ে গেল। মনেই হলো—তিনি যেন সেই গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে গেছেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,

—মায়ের যে কি ইচ্ছা—তা কারও বোঝার সাধ্য নেই। আমার ঘর ছাড়ার পিছনে আছে এক অদ্ভুত কাহিনী। শুনলে মনে হবে গল্প-কথা। কিছুতেই তোর বিশ্বাস হবে না। তবুও বলছি—তুই অনুরোধ করছিস্‌ বলে।

তখন আমার বয়েস বছর আঠারো। বাবার সঙ্গেই ব্যবসা দেখাশোনা করি। স্বাচ্ছন্দ্যেই আমাদের সংসার চলে। আমার বিয়ের দিনও মোটামুটি ঠিক হলো। মাসখানেক বাকি। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম—চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়। চন্দ্রনাথ মন্দিরের পাশে বসে আছে এক জটাজুট সন্ন্যাসী। সেখানে গেছি আমি। সন্ন্যাসী দীক্ষা দিলেন আমাকে। মনের এক অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। ভুলে গেলাম মা বাবা ভাইবোন আর সংসারের কথা। আর ফিরে এলাম না। দেখলাম এ-টুকুই। ঘুম ভেঙে গেল। কাউকে কিছু বললাম না। প্রতিদিন যেমন কাজকর্ম করি—তেমনই করলাম।

অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম সাধুবাবার কথা। তিনি বলতে লাগলেন,

—সাধু হবো—এমন কথা ভাবিনি কখনও। ভগবানে বিশ্বাস—তোর যেমন আছে—আমারও তেমন ছিল। তবে প্রগাঢ় কিছু নয়। সাধারণ সংসারীদের যতটুকু থাকে—ততটুকুই। পরদিন আবার ঠিক ওই একই স্বপ্ন দেখলাম। একই জায়গায়—একই সাধুর কাছে। স্বপ্নের বিষয়-বস্তু আর ছবির তফাৎ হলো না এতটুকু। মনটা কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে ভরে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। স্বপ্নের কথাটা বললাম সবাইকে। কিন্তু জায়গার কথাটা বললাম না কাউকে। কোন কারণে নয়—এমনিই বললাম না। সকলেই বললো—ও-সব কিছু না। পেট গরম থেকেই হয়েছে। এরপর কাউকে কিছু আর বললাম না। দ্বিতীয় দিনও কাটলো আমার—প্রতিদিন যেমন কাটে। তবে অস্বস্তি নিয়েই।

নিজেই বুঝে উঠতে পারলাম না—কেন এমন হচ্ছে। অজানা একটা উদ্বেগ সৃষ্টি হলো মনে। অদ্ভুত ব্যাপার—তৃতীয় দিন আবার ওই একই স্বপ্ন দেখলাম আমি। তবে এবার আর কাউকে কিছুই বললাম না। সারাদিন কাজকর্ম করলেও স্বপ্নের বিষয়টা সমানে ঘুরপাক খেতে লাগলো মাথার মধ্যে। তারপর চারদিনের দিন মনটা আমার কেমন যেন হয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভাবলাম—দেখি তো, ব্যাপারটা সত্যি কিনা? ব্যস, কাউকে কিছু বললাম না। বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে—সামান্য কিছু পথ খরচা নিয়ে।

মন দিয়ে শুনছি সাধুবাবার গৃহত্যাগের কাহিনী। তিনি বলতে লাগলেন,

—যথা সময়ে পেঁছে গেলাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। স্বপ্নে যা দেখেছিলাম—গিয়ে দেখলাম ঠিক সেই রকম। মন্দিরের পাশেই চাতাল। সেখানে বসে আছেন এক জটাধারী সন্ন্যাসী। দেহ যেন জ্যোতির্ময়। পরনে কালো একটা আলখেল্লা। ঝাড়া হাত পা। সঙ্গে ঝোলাটা পর্যন্ত নেই। দারুণ সুন্দর দেখতে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি যেন। বিস্মিত হয়ে গেলাম স্বপ্নের কথা ভেবে। দাঁড়িয়ে রইলাম স্থিরভাবে। কণ্ঠস্বর রোধ হয়ে এলো। নড়বার শক্তিও রইলো না।

সাধুবাবা বিস্মিত হয়েছিলেন জীবনের কোন এক সময়—এখন বিস্মিত হলাম আমি। ভাবলাম, এটা বিজ্ঞানের যুগ। কত অগ্রগতি বিজ্ঞানের। এ-যুগে এ-সব কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে! কেমন করে এটা সম্ভব? এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে? অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,

—তারপর কি করলেন আপনি?

আমার মনের কথাটা ধরতে পেরেই হয়তো সাধুবাবা বললেন,

—মায়ের দয়াতে সবই সম্ভব। যে কোন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে—কারও বিশ্বাসের অপেক্ষা না রেখেই।

সাধুবাবার এ-কথাটা একেবারে চুপসে দিলো আমাকে। তিনি পূর্ব-কথার রেশ ধরেই বললেন,

—সন্ন্যাসী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসলেন। কোন কথা বললেন না। সম্বিৎ ফিরে এলো আমার। প্রণাম করে বসলাম। স্বপ্নের কথা বলতে যেতেই নিষেধ করলেন ইসারায়। অন্তর্যামী। তারপর যথানিয়মে দীক্ষা হলো। তিন রাত্রি রয়ে গেলাম চন্দ্রনাথের আশ্রয়ে। কেমন যেন পরিবর্তনও হয়ে গেল মনের। কি করে যে কি হলো—কিছুই বুঝতে পারলাম না। আর ফিরেও গেলাম না বাড়ীতে।

তারপর ওখান থেকে গুরুজী আমাকে সোজা নিয়ে গেলেন জ্বালামুখীতে। সেখানে ছিলাম মাসখানেক। এরপর একে একে চলতে থাকলো বিভিন্ন তীর্থ-পরিক্রমা। চললো কয়েক বছর ধরে। প্রায় সব তীর্থদর্শনই হলো গুরুজীর সঙ্গে। এইভাবে কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। তীর্থ-পরিক্রমা করতে করতে একদিন গেলাম রামেশ্বরে। গুরুজী বললেন,—'এবার তুই একলা চলবি। এখান

থেকে আমি চলে যাবো উত্তরাখণ্ডে। আর কোনদিন দেখা হবে না। আমার আশীর্বাদ রইলো তোর উপরে।' ওখানে দু-দিন থাকবার পর গুরুজী চলে গেলেন। আমার শুরু হলো একলা চলা—তাঁর কৃপা নিয়ে।

জানতে চাইলাম,

—এই জীবনে আসার পর বাড়ীর কথা মনে পড়েনি—মন খারাপ হয়নি কখনও ?

একেবারে স্বাভাবিকভাবেই বললেন,

—না রে, বাবা-মায়ের কথা একবারও মনে পড়েনি—মন খারাপও হয়নি কখনও। কেন হয়নি বলতো ?

উল্টে প্রশ্ন করায় একটু অস্বস্তি হলো আমার। কেন সাধুবাবার মন খারাপ হয়নি—এ-প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো কি করে! তাই প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম,

—এতক্ষণ আপনার কথা শুনে মনে হলো—আপনি তন্ত্রসাধক। আমার ধারণা কি ভুল ?

হাসিতে ভরে গেল সাধুবাবার মুখখানা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,

—না বাবা, আমি সাধক-টাধক নই। ও-সব অনেক বড় কথা। আমি মায়ের ভিখিরি ছেলে। তোর ভাবে তুই ভাবলি। তাতে কি আমি তাই হলাম। মাকে ডাকি—মায়ের কৃপাতেই চলি—এই পর্যন্ত।

এবার প্রশ্ন করলাম,

—দেহ যখন আছে, তখন রোগ ব্যাধি আসবেই। আপনার কখনও বড় কোন রোগ হয়নি ? হলে কি করতেন—সেবা করতো কে ?

আনন্দিত মনেই বললেন সাধুবাবা,

—জলে ভেজা, রোদে পোড়া অযত্নের এ-দেহটা মায়ের কাছেই সঁপে দিয়েছি বাবা—এ-দেহ তাঁরই। তাই ঘর ছাড়ার পর ওষুধের মুখ দেখিনি কখনও।

আমার ভাগ্যটাই ভালো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছি—উত্তরের জন্যে বেগ পেতে হচ্ছে না। সাধারণভাবে অনেক সাধুর কাছেই হয় না এটা। এবার বললাম,

—বাবা, এখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসেছেন আপনি। আপনার মনে এমন কোন আশা, ক্ষোভ বা দুঃখ কি কিছু আছে—যা মনকে পীড়িত করে অথচ কাউকেই বলতে পারেন না।

এ-কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবার মুখখানা কেমন যেন মলিন হয়ে উঠলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চোখ দুটো ভরে উঠলো জলে। বললেন,

—হ্যাঁ বাবা, দুঃখ আমার একটা আছে। তবে সে দুঃখের কথা তুই বুঝবি না।

বলেই চুপ করে রইলেন। কেটে গেল কয়েক মিনিট। কোন কথা বলছেন না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম,

—বাবা, আপনি সাধু—আপনার ভিতরেও দুঃখ! কি এমন দুঃখ—যা আমি বুঝবো না! দয়া করে বলবেন ?

একটু ধরা গলায় বললেন,

—বাবা, মৃত্যুর পর এই দেহটাকে কেউ যদি সমাধি দিয়ে দিতো—তা-হলে আমার কোন দুঃখই থাকতো না। কিন্তু জানি না। এ-দেহটা পুড়বে—না, সমাধি হবে।

কথাটা বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এমন কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কৌতূহলী হয়ে বললাম,

—আপনি তো হিন্দু। মৃত্যুর পর দেহ পুড়িয়ে দেয়াই তো নিয়ম। পুড়িয়ে দিলে আপনার দুঃখের কি আছে ?

সাধুবাবার কণ্ঠস্বর এবার প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো। মলিন মুখে করুণ সুরেই বললেন,

—তুই বুঝবি না বাবা—তুই বুঝবি না। আমার দুঃখটা কোথায়—তুই বুঝবি না।

একান্ত অনুরোধের সুরেই বললাম,

—কি এমন কথা যে বুঝবো না ? বলুন না বাবা।

মুখের কোন পরিবর্তন হলো না সাধুবাবার। ওই একই ভাব-এ বললেন,

—সেই আঠারো বছর বয়েসে বেরিয়েছি ঘর ছেড়ে। দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় নব্বইটা বছর। আজ পর্যন্ত ভগবানের নাম ছাড়া আর কিছু করিনি বাবা। এ-দেহের হাড়গুলো—প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত নামে নামে অনুরণিত হয়ে আছে। ভগবানের নামে তো দেহটা পুড়েই আছে—আবার নতুন করে পোড়ালে দেহের মধ্যে নামের ছাপগুলোই পুড়বে। আমি চাই না বাবা—আমি চাই না, আমার এই নাম-রূপ দেহটাকে কেউ পুড়িয়ে ফেলুক। সমাধি দিলে আর কোন দুঃখই থাকবে না আমার।

সাধুবাবার কথাটা শুনে নিজেরই কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে থাকলো। ভাবলাম, কি অদ্ভুত—কি বিচিত্র মানুষের মন—চিন্তা-ভাবনা। তবুও বললাম,

—আপনি তো সাধু। মৃত্যুর পর এ-দেহের কি হবে না হবে—তা নিয়ে বৃথা মানসিক কষ্ট পান কেন ? ছেড়ে দিন না তাঁর উপরে—যিনি দিয়েছেন আপনার এ-দেহ।

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সাধুবাবা বললেন,

—কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস্ বাবা। কিন্তু মন তো এ-কথা মানে না।

সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেললাম,

—একটু আগেই তো আপনি বললেন—'এ-দেহ মায়ের কাছেই সঁপে দিয়েছি—এ-দেহ তাঁরই দেহ'। অথচ এখন তো মনে হচ্ছে, অসম্ভব মোহ রয়েছে আপনার নিজের দেহটার উপর।

কথাটা শেষ হতে না হতেই সাধুবাবা বললেন,

—না না বাবা, এ-দেহের উপর কোন মোহ নেই আমার। আসলে কি জানিস্—ইষ্ট নামটা গেঁথে গেছে দেহের মধ্যে। মায়ের নাম আগুনে পুড়বে—এই চিন্তাটাই মাঝে মধ্যে বড় কষ্ট দেয় মনকে। মোহ আমার কোন কিছুতেই ছিল না—আজও

নেই। মৃত্যুর পর দেহটাকে কেউ সমাধি দেবে—এমনটা আগে জানতে পারলে—মনের কষ্টটা হতো না। নিছক দেহের জন্য কষ্ট নয়—কষ্ট আমার এই নাম-রূপ দেহের জন্যে।

এবার উঠতে হবে আমাকে। তাই প্রণামটা সেরে নিলাম। আশীর্বাদ করলেন মাথায় হাত দিয়ে। শেষ প্রশ্ন করলাম,

—বাবা, ঘর ছেড়েছিলেন যখন—তখন ছিলেন উদ্দেশ্যহীন। কোথা থেকে—কি ভাবে কেটে গেল এতগুলো বছর। গুরুমন্ত্র সাধনের উদ্দেশ্যই হলো—তাঁকে লাভ করা। মাতৃসাধক আপনি। মায়ের দর্শন কি আপনি সত্যিই পেয়েছেন?

এ-কথায় খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলেন সাধুবাবা। বসলেন সোজা হয়ে। আবেগে জড়িয়ে এলো কণ্ঠস্বর—অথচ ফুটে উঠলো দৃঢ়তার সুর। বললেন,

—জানিস্ বাবা, মায়ের যে কত দয়া, কত করুণা—তা তোকে বলে বোঝাতে পারবো না। একেবারে সত্য বলছি—মা কথা বলে—কানে শোনা যায়। মনে কষ্টের সৃষ্টি হলে—মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পরিষ্কার অনুভব করা যায়। তবে তোর মতো এইভাবে বসে কথা বলা যায় না। আর স্বরূপ দর্শনের কথা বলছিস্? ওটা কি এবং কেমন—তা তোকে কোনভাবেই বলে বোঝাতে পারবো না। এ-পথে না এলে—এ-পথের সত্যতা সম্পর্কে একটা কথাও তোর বিশ্বাস হবে না—শুনলে কেউ বিশ্বাসও করবে না।

কামাখ্যা দেখা হয়েছে। এবার দু-বন্ধু বাস ধরলাম স্টেশনের কাছ থেকে। যাবো শিলং। সরকারী বাস যায়—বেসরকারীও। বাসে আপার ক্লাস আর লোয়ার ক্লাস আছে। ভাড়াও দু-রকম। সামনের দিকে সিট্ নিলে ভাড়া একটু বেশী। কষ্টও একটু কম। পিছনে বসলে—ভাড়া একটু কম। কষ্ট একটু বেশী। বসলাম সামনের দিকটায়। কষ্ট একটু কম হবে বলে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাস যায়—গৌহাটি থেকে শিলং। যায় ট্যাক্সীও। তবে বেশ ভাড়া পড়বে।

বাস ছাড়লো। চললো শহর থেকে শহরতলীতে। তারপর ধরলো পাহাড়ী পথ। পাহাড়ে ওঠার পর কিছুটা গিয়েই বাস থেমে গেল। এখানে রয়েছে ছোট্ট একটা গণেশ মন্দির। শিলং-এ যাওয়া আসার পথে সমস্ত যানবাহনই দাঁড়ায় এই মন্দিরের সামনে। পুজো দেয় ড্রাইভার কিংবা অন্য কেউ। উদ্দেশ্য—পাহাড়ী পথে যেন কোন বিপদ না হয়। একটু থামার পর আবার বাস ছাড়লো—চললো বাঁধা গতিতে।

গৌহাটি থেকে শিলং—প্রশস্ত পাহাড়ী পথ। উঁচু নীচু—চড়াই উৎরাই। আঁকা-বাঁকা পথ—আর সব পাহাড়ী পথ যেমন হয়—ঠিক তেমনই। পথের একদিকে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। অপরদিকে গভীর খাদ। কোন পার্থক্য নেই এ-পথে। এ-পথের পাহাড় সেজে আছে সবুজে। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে পাহাড়ী ঝরণা। শিলং-এর পথে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বাস থামলো। এলাম ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ নঙ্পু। এটা শিলং গৌহাটি মাঝামাঝি জায়গায়। এখানে বিশ্রাম দেয়া হয় গাড়ীকে। বিশ্রাম নেয় যাত্রীরাও। ছোট ছোট দোকান আর হোটেল আছে বেশ কিছু। তার মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি ফলের দোকান। সবই সাজানো, সুন্দর। মেয়েরাই অধিকাংশ দোকানের বিক্রেতা। প্রায় প্রত্যেকেই সুন্দরী যেমন—গায়ের রঙও তেমন ফেটে পড়ছে। এরা খাসী সম্প্রদায়ের মেয়ে। এখানে মেয়েরাই গৃহস্বামী। পরিচালনা করে সংসার—করে হাটবাজার, সব কিছু। পুরুষের ভূমিকা একেবারে মেয়েদের মতো। খাসী জাতি এখনও মাতৃতান্ত্রিক সেইজন্যই তো মেয়েরা পায় মায়ের সম্পত্তি।

প্রায় আধঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার বাস ছাড়লো। চললো আগের মতো সেই পাহাড়ী পথ ধরে। অজস্র ফার পাইনের জঙ্গল ফেলে বাস ক্রমশ চড়াই উৎরাই করতে করতে উঠতে লাগল উপরে। এই ভাবেই এলাম শিলং। উচ্চতা প্রায় ৫০০০ ফুট। গৌহাটি থেকে ১০৩ কি. মি.। খাসিয়া পর্বতের কোলে আকাশচুম্বী চূড়ার উপরেই ছোট্ট শহর শিলং। মেঘালয়ের রাজধানী। সময় লাগলো প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টা। শীতপ্রধান অঞ্চল। মনোরম এর জলবায়ু—স্বাস্থ্যকরও বটে।

ছোট্ট পার্বত্য নগরী শিলং। উঠলাম ছোট্ট একটা হোটেলে। বড় হোটেলে বড় বেশী খরচা—তাই। অসংখ্য হোটেল আছে এখানে। ভ্রমণকারীদের থাকার কোন অসুবিধে নেই।

সারা শিলং-এর চারদিকেই ছড়িয়ে আছে অজস্র পাইন গাছ। অন্যান্য গাছও আছে

তবে সংখ্যায় কম। পাইন গাছেই সাজানো শহর। মাঝে মাঝেই রয়েছে নানা বাহারী ফুলের গাছ—পথের দু-ধারে। কাঠের বাড়ী—কাচের জানলা দেয়া। এ-গুলোও এক আলাদা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে শহর শিলং-এর। পরিচ্ছন্নতায় শিলং অনেক গৃহকর্মনিপুণা গৃহবধূকেও যেন হার মানিয়ে দেয়।

এককালে সাহেবদের অত্যন্ত প্রিয় শহর ছিল এই শিলং। ইংরেজরা দীর্ঘকাল গ্রীষ্মকালীন আবাস করেছিল এই শহরকে। এখানে তারা আসতেন ছুটি কাটাতে। ওয়েলস্-এর মিশনারীরা আসতেন—স্থানীয় ভাষা শিখতেন। সেইজন্যে তারা এখানে স্থাপন করেছিলেন শিলং ইণ্টারন্যাশনাল মিশন। মিশনারীদের হেড কোয়ার্টার—ইংরেজ আমলে। এখন ইংরেজও নেই—সে গুরুত্বও নেই।

একেবারেই ছোট্ট শহর শিলং। তাই ট্যাক্সীতে করে ঘুরলে একদিনেই প্রায় সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নেয়া যায়। কারণ দেখার জায়গাগুলি একটি থেকে অপরটির দূরত্ব মোটেই বেশী নয়।

শিলং-এর সর্বোচ্চ উচ্চতায়—শিলং পিক। ৬৫৪০ ফুট। শহর থেকে ১৫৪০ ফুট উপরে। যাওয়া যায় পায়ে হেঁটে—ট্যাক্সীতেও। ট্যাক্সীতেই এলাম শিলং পিক-এ। দূরত্ব ৯ কি. মি.। স্থানীয় মানুষদের ধারণা, শিলং পিক-এ অবস্থান করছেন তাঁদের আরাধ্য দেবতা'সাইলং। তাঁরই নামানুসারে শহরের নাম হয়েছে শিলং। এই পিক থেকে সমগ্র শিলংকে দেখায় ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মতো। দূরে—বহু দূরে দেখা যায় সারি সারি পর্বতমালা। কোথাও একেবারে পরিষ্কার, কোথাও বা আবছা কুয়াশায় ভরা পর্বত শিখর। এ এক অপূর্ব নয়নাভিরাম দৃশ্য। ঐতিহাসিক কোন গুরুত্ব নেই শিলং-এর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এর একমাত্র সম্পদ। তাই তো টেনে আনে পর্যটকদের—আনবেও। এক সময় শিলং পিকের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন বিদেশীরা—তুলনা করেছিলেন স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে। সেইজন্যেই তো ইংরেজরা এর নাম দিয়েছিলেন—প্রাচ্যের স্কটল্যাণ্ড। শিলং—এ এমনই এক পাহাড়ী শহর—যেখানে শীতকালে বরফ জমে না অথচ অসহনীয় ঠাণ্ডা নয়, আবার গ্রীষ্মে গা জ্বালানো উত্তাপ নয়। সুন্দর আবহাওয়া এই শহর শিলং-এর।

শিলং শহরে—পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখে নেয়া যায় রেসকোর্স, রামকৃষ্ণ মিশনের একটি মন্দির, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, রাজভবন, সেক্রেটারিয়েট, রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং শিলং-এর গর্ব ১৮ টি গর্তের শিলং গলফ্ কোর্স।

এই পাহাড়ী শহরের কেন্দ্রে পুলিশ বাজার, ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ড থেকে একেবারে কাছেই রয়েছে একটি ছোট্ট লেক—ওয়ার্ড লেক। হাঁটা পথে মিনিট তিনেকের পথ। এটি কৃত্রিম। এর মধ্যে রয়েছে একটি ছোট্ট দ্বীপ। পারাপারের জন্য কাঠের পুল রয়েছে একটা। রাজভবনের কাছে ছোট্ট এই লেক-এ আছে সুন্দর বোটিং-এর ব্যবস্থা। লেকের গায়েই রয়েছে পার্বত্য ফুল আর নানাগাছের বোটানিক্যাল গার্ডেন। এ-সব ব্যবস্থা পর্যটকদের সময় বিনোদনের জন্য।

পাহাড়ী পথ। কখনও সামান্য চড়াই আবার কখনও উৎরাই। পথের দু-পাশে সাজানো দোকান। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে তারা—যারা প্রথম আসে শিলং-এ।

চলার কষ্ট তো একটা আছেই—যারা সমতলের মানুষ—তাদের কাছে। হাতে সময় কম থাকলে ট্যাক্সীই ভালো। তবে পায়ে হেঁটে ঘোরার মজাই আলাদা।

সুন্দর সাজানো বাজার—শিলং-এর বড় বাজার। প্রায় প্রতিটা দোকানেই সাজানো রয়েছে হরেক রকম মনোরম হাতের কাজের সৌখিন জিনিষ। সবই বাঁশের তৈরী। ঘর সাজানোর জিনিষই বেশী। এ-গুলো সব পাহাড়ী কুটির শিল্প। সুন্দরী খাসী মেয়েরা নিজে সেজেছে—সাজিয়ে বসে আছে দোকান। মেয়েরাই এখানকার বিক্রেতা।

খাসিয়া পর্বতের এই শিলংকে ঘিরে রয়েছে বেশ কয়েকটি জলপ্রপাত। শহর থেকে ২ কি. মি. দূরে—ক্রিনোলাইন জলপ্রপাত। গাছে ঘেরা এই প্রপাতের নীচে রয়েছে সুইমিংপুল। গোনার্স জলপ্রপাত ৬ কি.মি. দূরে। একটু পাহাড়ী জঙ্গল পার হয়ে ৫ কি.মি. দূরে বিডন, বিশপ নামে আরও দুটি জলপ্রপাত। গোনার্সের জলধারা এসে মিশেছে বিশপ জলপ্রপাতের সঙ্গে। এই দুটি জলপ্রপাত এক হয়ে সৃষ্টি করেছে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী—উমিয়ম। এ-সবই দেখলাম ট্যাক্সীতে ঘুরে ঘুরে। এগুলি ছাড়াও রেসকোর্সের পাশে রয়েছে সতী ফলস্। ঘুরতে বেরিয়ে পায়ে হেঁটেই দেখে নেয়া যায় অনায়াসে—দেখে নিলাম আমিও। আর আকর্ষণীয় জলপ্রপাতগুলির মধ্যে আছে ৬ কি. মি. দূরে স্প্রেড ঈগল জলপ্রপাত। শহর থেকে ৫ কি. মি. দূরে সুইট ফলস্ এবং ৬ কি. মি. দূরত্বে আছে গানার ফলস্। এগুলি দেখতে হলে ট্যাক্সী ছাড়া গতি নেই। ঝটপট দেখাও হয়—ঘোরাও হয়।

শিলংকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই ছোট্ট পার্বত্য শহর আর এর সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ। তাঁরই স্মৃতি বুকে ধরে বছরের পর বছর ঝরে পড়ছে স্প্রেড ঈগলের জলধারা। কারণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই নামকরণ করেন এই জলপ্রপাতের। আর আছে এলিফ্যাণ্ট ফলস্। তবে এটি শহর শিলং থেকে একটু বাইরে। যেতে হবে ১১ কি. মি. দূরে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথেই পড়ে এই জলপ্রপাত। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি—৫৬ কি. মি.।

শিলং-এ রয়েছে জাপানী ঢঙে সাজানো একটি চিড়িয়াখানা। তেমন আকর্ষণীয় না হলেও ঘুরে দেখে নেয়া যায়। পাইন গাছে ঘেরা রয়েছে চিড়িয়াখানাটি। লেডি হায়দরী পার্ক আর মেঘালয় স্টেট মিউজিয়ামটিও শহরের অন্যতম আকর্ষণ। এই সংগ্রহশালায় হস্তশিল্পের নানা ধরনের কাজ, অলংকার, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, পুরনো দিনের মুদ্রা এবং পার্বত্য প্রদেশের নানা ধরনের পোশাক-আশাক।

সারা শিলং-এর দর্শনীয় স্থানগুলির অধিকাংশই দেখলাম ট্যাক্সীতে করে। পায়ে হাঁটার জায়গাগুলি পায়ে হেঁটেই। হৈ-হৈ করে ঘুরলাম শিলং। এখানকার মনোরম জলপ্রপাতগুলিই প্রধান আকর্ষণ। দেখতে দেখতে দুটো দিন কেটে গেল শিলং-এ। একই পথে আবার বাসে করে ফিরে এলাম গৌহাটিতে—ট্রেন পথে কলকাতা। যেখান থেকে যাত্রা শুরু—শেষ হলো সেখানেই।

গ্রন্থঋণ

পিতৃ ও মাতৃঋণ, ঋষি এবং দেবঋণ—কোন মূল্যেই শোধ করা যায় না। কিন্তু গ্রন্থ এবং লেখকের কাছেও আমরা প্রত্যেকেই ঋণী—যে ঋণ অপরিশোধ্য। অথচ ভুলে যাই সে কথা। এই গ্রন্থ রচনায় যে সব গ্রন্থের ঋণের বোঝা রইলো আমার মনে—

* ভারতের সাধক—শঙ্করনাথ রায়।
* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—বৃন্দাবন দাস বিরচিত।
* বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)—রাজশেখর বসু।
* কামাখ্যা তীর্থ—শ্রীধরণীকান্ত শর্মা।
* উৎকল তীর্থে—শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী।
* শ্রীশ্রী জগন্নাথক্ষেত্র মাহাত্ম্য কথা—কৈলান পুস্তকালয়।
* কোণার্কের কাহিনী / সূর্য মন্দির কোণার্ক—শ্রীবলরাম মিশ্র, মঞ্জরী গুপ্তা।
* পুরী তীর্থ / কোণারকের ধূসর দেউল—শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।
* কোণার্ক / উড়িষ্যার পুরাকীর্তি—শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যয়।
* কোণার্ক—শ্রীবলরাম মিশ্র, শ্রীপরিতোষ মুখোপাধ্যায়।
* শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের নবকলেবর—বিদ্যাভবন, পুরী।
* পুরীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু।
* শ্রী ভুবনেশ্বরক্ষেত্র—৺শ্রী হরিগোপাল দাস।
* ভুবনেশ্বর—শ্রীবলরাম মিশ্র, শ্রীতপন সেন।
* শ্রী জগন্নাথ পুরী—শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির পরিচালনা কমিটি।